চারিদিকে যুদ্ধ

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্য সংস্থা ★ ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৯

মুদ্রণে
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা-৬

চৈত্র মাস যায় যায়। আব ক'দিন পরেই নতুন বছর পড়ে যাবে।

উত্তরের বিশাল মাঠখানা এখন একেবারে ফাঁকা। দেড়-দু মাস আগেও রবিফসলে চারিদিক ভরে ছিল। তখন যেদিকেই চোখ ফেরানো যেত—শুধু মুগ, মুসুর, কাউন, সর্ষে আর তিল। তিলের হলুদ ফুলগুলো যেন মাঠের অলঙ্কার—সেগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরানো যেত না।

কিন্তু শীতের শেষে যেই দক্ষিণ দিক থেকে ফাল্গুনের হাওয়া দিতে শুরু করল, সব ফসল গিয়ে উঠল চাষীদের ঘরে। এখন এক দানা শস্য কোথাও পড়ে নেই। শীতের পর থেকেই লাবণ্য খুইয়ে মাঠটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার গায়ে সব-হারানোর সাজ।

এখন দুপুর।

নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিল হাসেম। উত্তরের এত বড় চকটায় সে ছাড়া আর কেউ নেই।

চকটার একধারে খাল। খালের পাড় ধরে মুত্রা আর নলখাগড়ার বন, কিছু কিছু বেত ঝোপও চোখে পড়ে। চকের আরেক ধারে পীচ-ঢালা বড় সড়ক। জেলা বোর্ডের এই রাস্তাটা দু বছর আগেও ছিল কাঁচা আর নিচু, বর্ষা নামতে না নামতেই দু হাত জলের তলায় ডুবে যেত। আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত ডুবেই থাকত। তখন যাতায়াতের কী কষ্ট!

এই তো সেদিন দলে দলে সরকারি লোক এসে দিন-রাত খেটে রাস্তাটা উঁচু করে পীচ ঢেলে বাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তাতে চারপাশের বিশ তিরিশটা গ্রাম বেঁচে গেছে। গেল দু বর্ষা এদিককার মানুষের আর কষ্ট নেই।

সড়কটা মাঠের গা ঘেঁষে পুব-পশ্চিমে আড়াআড়ি চলে গেছে। পুব দিকে মাইল তিনেক গেলে গিরিগঞ্জের বড় বন্দর। আর পশ্চিমে গেলে গ্রামের পর গ্রাম। প্রথমেই যে গ্রামটা পড়ে তার নাম নহরপুর, তারপর একে একে তাজহাটি, রসুনিয়া, ইনামগঞ্জ, রসুলপুর, মাইনকার চর, চিতলমারি, ইত্যাদি।

এখন, এই দুপুরবেলা সূর্যটা আকাশের মাঝখানে আটকে আছে। চৈত্রের সূর্য গনগনে, তীব্র; কিন্তু রোদের তাত তেমন করে গায়ে লাগে না। কেননা প্রচুর উল্টোপাল্টা হাওয়া বইছে আজ। ধুলোর অগুনতি ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছে।

আকাশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। উজ্জ্বল নীল

প্রকাণ্ড একখানা আয়না কেউ যেন মাথার ওপর টাঙিয়ে রেখেছে।

হাসেম কখনও আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল, আবার একটু পরেই হয়তো মাঠে নেমে যাচ্ছিল।

তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখ লম্বাটে, নাকটা খাড়া কপাল থেকে নেমে এসেছে। চোখ দুটো বড় সরল আর নিষ্পাপ। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, জগতের কোনো কিছুকে সে অবিশ্বাস করতে শেখে নি। রং একসময় টকটকে ছিল, রোদে পুড়ে জলে ভিজে এখন তামাটে। গা থেকে খই উড়ছে। হাত পা ফাটা ফাটা। এক মাথা রুক্ষ চুল জটপাকানো, তেল আর চিরুনির সঙ্গে কোনোকালেই ওগুলোর সম্পর্ক নেই।

এই মুহূর্তে হাসেমের পরনে সবুজ লুঙ্গি আর আধছেঁড়া ময়লা নিমা (ফতুয়ার মতো জামা)।

হাসেমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য আজন্ম তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই সব যুদ্ধের স্থায়ী ছাপ তার সারা গায়ে মাখা রয়েছে।

উত্তরের এই চকে যখন তখন চলে আসে হাসেম। মাঠটার সঙ্গে তার নাঁচা-ম া জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সব পরের কথা।

আজ সে এখানে এসেছিল শাক-পাতার খোঁজে। ঘরে কয়েক দানা চাল ছাড়া আনাজপাতি কিছু নেই। ধর্মজাল নিয়ে খালে নামলে দু-একটা নলা কি বেলে মাছটাছ সে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু সকাল থেকে তাকে এমন আলস্যে ধরেছিল যে হাত-পা নাড়তে ইচ্ছা করছিল না। গোঁসাইদের পুবের ঘরের দাওয়ায় দুই হাঁটুর মাঝখানে থুতনি ডুবিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসেই থেকেছে। ভুবন গোঁসাইর মা, যাকে সে ঠাকুরমা বলে, মাঝে মাঝেই তাড়া দিয়েছে, 'কি রে হাসমা, আইজ তমস্ত দিন (সারা দিন) বইসা বইসাই কাটাইয়া দিবি? হাতে পায়ে রস নাইমা যাইব যে।' হাসেম হেসেছে, 'আইজ আর কিছু করতে ইচ্ছা করে না ঠাকুরমা। মনে লয় খালি বইসা থাকি।' ভুবন গোঁসাইর মাও হেসেছে, 'বুঝছি, তরে আইলসামিতে (আলসেমি) পাইছে, তয় বইসাই থাক। আমার লগে তর চাউল নিমু?' মাসের ভেতর বিশ দিনই ভুবন গোঁসাইর মা তার ভাত রেঁধে দেয়। হাসেম তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'আইজ থাউক ঠাকুরমা, আইজ তো বাড়িতেই আছি। নিজেরটা নিজে রাইন্ধা লমু নে (নেব'খন)।' তারপর রাঁধতে গিয়ে দ্যাখে চাল ছাড়া আর কিছু নেই। দু-একটা মাছ সে ধরে নিতে পারত। কিন্তু মাছ ধরলেই কাট রে, কোট রে, ধোও রে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। অথচ শুধু ভাত তো আর গলা দিয়ে নামানো যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত হাসেম চলে এসেছে উত্তরের চকে। এক মুঠো শাক তুলে এনে ভেজে-ভুজে নেবে।

আলের ধারে ঘাসের সঙ্গে প্রচুর জলসেঁচি শাক হয়ে আছে। একটু দূরে খালের

পাড়ে আছে হেলেঞ্চা আর গীমা শাক।

মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছিল শালিক, চড়াই, বথারি, বুনো টিয়া। উড়তে উড়তে পাখিরা হঠাৎ হঠাৎ ফাঁকা মাঠে নেমে আসছিল, ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁকে দেখছিল কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য এক দানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

অস্পষ্টভাবে পাখি দেখতে দেখতে হাসেম একবার ভাবল, জলসেঁচি শাক নিয়ে যাবে। তারপরেই ঠিক করল জলসেঁচি না, হেলেঞ্চাই ভাল। জলসেঁচিতে কেমন যেন একটা বুনো বুনো গন্ধ।

হেলেঞ্চা তুলবার জন্য খালের দিকে ঘুরতে যাবে, সেই সময় শব্দটা কানে এল হাসেমের।

প্রথমটা মনে হল ঝড়ের শব্দ। কিন্তু চৈত্রমাসের এই দুপুরে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, কোথাও এক ছিটে মেঘ নেই, বাতাসের ভাবগতিকেও এমন না যে ঝড় উঠতে পারে।

চমকে একবার সামনে তাকাল হাসেম, একবার পেছনে। তারপর দূরে পাঁচ-পালা সড়কটার দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের ধুকপুক বন্ধ হয়ে গেল।

সড়কটা ধরে পূব দিকে সোজা খানিকটা গেলে একটা উঁচু বাঁধানো পুল। সেই পুল পেরিয়ে বারো চোদ্দটা কালচে সবুজ রংয়ের ট্রাক এদিকেই আসছে। দেখেই হাসেম চিনতে পারল, ওগুলো খান সেনাদের গাড়ি।

গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে 'গয়নার নৌকো'য় এক দুপুরের পথ গেলে আমতলি— বেশ বড়সড় এক শহর। সেখানে মিলিটারিদের বিরাট ছাউনি আছে। তিন বছর আগে একবার আমতলিতে গিয়েছিল হাসেম; ওখানেই খান সেনাদের কালচে সবুজ রংয়ের নানা গাড়ি দেখে এসেছিল। সেই থেকে মিলিটারি ট্রাক দেখলেই সে চিনতে পারে।

গাড়িগুলো পুলের ওপর দিয়ে যখন আসছিল, গুম গুম আওয়াজ হচ্ছিল। আচমকা শব্দটা শুনে হাসেমের মনে হয়েছিল—ঝড়।

পুল পেরিয়ে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাকগুলো এখন এদিকেই ছুটে আসছে।

চোখের তারা স্থির করে তাকিয়েই ছিল হাসেম। সে না পারছিল এগুতে, না পিছিয়ে যেতে। তার পা দুটো পেরেক ঠুকে কেউ যেন মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। কী করবে হাসেম ভেবে উঠতে পারছিল না। আসলে ভাবনার শক্তিটাই তার অসাড় হয়ে গেছে।

ট্রাকগুলো যখন আরো কাছে এসে পড়ল, সেই সময় হাসেমের রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানির মতো খুব দ্রুত কী খেলে গেল। সে শুনেছে, আজকাল খান সেনারা যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই দোজখ নেমে আসছে। গ্রামের পর গ্রাম ওরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মানুষ দেখলেই গুলি করছে, কাঁচা বয়েসের যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে। আর করছে লুটপাট। সোনাদানা টাকাপয়সা থেকে থালা-ঘটিবাটি যা চোখে পড়ছে গাড়ি বোঝাই করে তুলে নিচ্ছে।

গিরিগঞ্জ বন্দরের গা ঘেঁষে যে নদীটা, তার নাম ধলেশ্বরী। হাসেম শুনেছে, নদীর ওপারে একটা গ্রামও নাকি আর মাথা তুলে নেই, খানের বাচ্চারা পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কত লোক ওরা মেরেছে, কেউ বলতে পারে না। ওখানে রাস্তায় রাস্তায় মরা মানুষের পাহাড়। হাজার হাজার শকুন আর শিয়াল দিন-রাত মানুষের মাংস খেয়ে যাচ্ছে। যে দু-চারজন কোনোরকমে বাঁচতে পেরেছিল, দেশ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

খবর পাওয়া যাচ্ছিল, খান সেনারা খ্যাপা কুত্তার মতো চারিদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যখন যে গ্রামে খুশি ঢুকে পড়ছে। আজ তারা ধলেশ্বরীর এ পারে গিরিগঞ্জ বন্দরের নিচের দিকটায় চলে এসেছে।

হায় আল্লা, কী হবে তাদের? পর পর ওই গ্রামগুলো—নহরপুর, রসুনিয়া, নবীগঞ্জ, মাইনকার চর—কি আর আস্ত থাকবে?

শিক্ষিত ভদ্র মানুষের মতো গুছিয়ে-টুছিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভাবতে শেখে নি হাসেম। এই মুহূর্তে এলোমেলোভাবে তার যা যা মনে হচ্ছিল, সেগুলো সাজিয়ে নিলে এই রকম দাঁড়ায়।

এই সব গ্রাম কি একদিনে গড়ে উঠেছে? দুনিয়ার এক কোণে এক এক টুকরো ভূখণ্ড ঘিরে কতকাল ধরে মানুষ কত মায়ায় ঘর-বাড়ি, সংসার, জনপদ সৃষ্টি করেছে। বংশানুক্রমে আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে রেখে যাচ্ছে একটি অক্লান্ত জীবনের স্রোত। দেশভাগের পর ক'টা বছর কিছু গোলমাল অবশ্য হয়েছে। বহু মানুষ সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কলকাতা না আসাম কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। দুঃস্বপ্নের মতো সেই বছর ক'টা বাদ দিলে এদিকের মানুষ বড় শান্তিতে আছে। রয়ানি গান, গাজীর গীত, নীলপুজো আর বাস্তুপুজোর ঢাকের বাদ্য, মাঘমণ্ডলের ব্রত, ঈদের দিনের দাওয়াত, বড় নদীতে বাইচ খেলা, সবই আবহমান কালের নিয়মে চলে আসছে। এ সব গ্রাম বড় লাবণ্য দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু দোজখের পোকারা আজ এখানে হানা দিয়েছে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই কত যত্নে সাজানো ওই সব গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, যুগ-যুগান্ত ধরে জীবনের যে স্রোত বয়ে আসছে তা যাবে স্তব্ধ হয়ে।

হঠাৎ তাদের নহরপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধানী মহাজন মোতালেফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের ছোট ছেলে শফিকুলের কথা মনে পড়ে গেল হাসমের।

বিশ বাইশ বছরের তাজা জোয়ান ছেলে শফিকুল। কী তার গায়ের বন্ন, কী বা চোখ-মুখ! সব সময় ছেলেটা যেন টগবগ করে ফুটছে। অথচ মুখে হাসিটা ছাড়া কথা নেই।

ঢাকার কলেজে সে এম-এ, বি-এ পড়ে। টাকা-পয়সাওলা বড় ঘরের ছেলে, কত লেখাপড়া জানে। তবু এক ফোঁটা দেমাক নেই। ছুটিছাটায় ঢাকা

থেকে নহরপুর এলে এ বাড়ি যায়, ও বাড়ি যায়। ডেকে ডেকে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলে। এমন যে হাসেম, যার বাড়ি নেই, ঘর নেই, জমি নেই, জেরাত নেই, খোদাতাল্লাহ্‌র দুনিয়ায় সব চাইতে গরিব—তার সঙ্গেও দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করে।

সেই শফিকুল ক' দিন আগে রাত্তিরবেলা হঠাৎ ঢাকা থেকে নহরপুরে চলে এসেছিল। এসেই সারা গ্রামের মানুষকে তাদের বাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সবার সঙ্গে হাসেমও গিয়েছিল সেখানে।

গ্রামের লোকেরা অবাক, এভাবে তো কখনও ডাকে না শফিকুল!

চিরদিনের হাসি-খুশি জীবন্ত ছেলেটাকে সেদিন চেনা যাচ্ছিল না। ভিড়ের ভেতর থেকে পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেম দেখেছে, শফিকুলের চোখ দুটো লাল টকটকে, চুল উষ্ক-খুষ্ক, গাল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে, মুখময় কয়েক দিনের দাড়ি, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

এর আগে শীতকালে একবার ঢাকা থেকে নহরপুরে এসেছিল শফিকুল। তখনও কী সুন্দর চেহারা তার! কী চমৎকার স্বাস্থ্য! ক' দিনের মধ্যে কী এমন হল যাতে তার শরীর এত ভেঙে পড়েছে!

শফিকুল সম্বন্ধে হাসেমের মনে এক ধরনের বিস্ময় আছে। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম মেশানো। তার কারণ শফিকুল ঢাকার শহরে থেকে পড়ে। কোনোদিন ঢাকায় যায় নি হাসেম। তার দৌড় বড় জোড় ধলেশ্বরীর ওপরে আমতলি পর্যন্ত, তা-ও মোটে একবারই সেখানে গেছে সে। যেতে হলে 'গয়নার নৌকায় উঠতে' হবে। একেক বার যাতায়াতের খরচা লেগে যাবে চার আনা চার আনা আট আনা। অত পয়সা কোথায় পাবে সে? বার বার আমতলি যাবার সৌখিনতা তার অন্তত মানায় না। পুবে গিরিগঞ্জের বন্দর, পশ্চিমে নহরপুরের বড় হাট, উত্তরে বিলের রাজা রসুলপুর, মাইনকার চর আর দক্ষিণে ধলেশ্বরীর বাঁক—জীবনের চল্লিশটা বছর এর মধ্যেই কেটে গেছে তার।

হাসেম শুনেছে, ঢাকা জবর শহর। সে যে কত বড়, তার ধারণায় আসে না। সেখানে নাকি কাতারে কাতারে বাড়ি। সে সব বাড়ি কি ছ্যাঁচা বাঁশ আর ছিটে বেড়ার? দস্তুরমতো পাকা দালান। একশো হাত দুশো হাত করে একেকটা উঁচু। সেগুলোর মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। শুধু কি কাতারে কাতারে বাড়িই, গাড়িও কাতারে কাতারে। পিঁপড়ের জাঙালের মতো গাড়ি। তার ওপর আছে মানুষ। ওই যে কথায় বলে মানুষের মাথা মানুষে খায়, এ হচ্ছে তাই। পাকিস্তান হবার পর ঢাকার শহরে মানুষ যাচ্ছেই, যাচ্ছেই। তাদের এই ঢাকা জেলা, ফরিদপুর জেলা, বরিশাল-খুলনা-যশোর জেলা, আরো দূরে চাটগাঁ-নোয়াখালি-ময়মনসিং জেলার মানুষ তো আছেই। দুনিয়ার নানা রাজ্য থেকেও নাকি মানুষ

এসেছে। এমন কি ধলা ফকফইকা সাহেব-মেমরাও যে কত এসেছে! হাসেমের বড় ইচ্ছা, একবার গিয়ে ঢাকার শহরটা দেখে আসে। কিন্তু সে সাধটা এখনও মেটে নি।

তার সেই স্বপ্নের শহরে থাকে শফিকুল। তাদের নহরপুরের শুধু কেন, আশে-পাশের দশ-বিশটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র শফিকুলই ঢাকায় থেকে পড়ে। সে যখন ছুটিতে আসে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে হাসেম। ঢাকা থেকে কি রহস্য সারা গায়ে মেখে এনেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা দেখতে চেষ্টা করে।

সেদিন রাত্রিবেলা সবাইকে ডেকে শফিকুল বলেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। খান সেনারা হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে মেরেছে, কামানের গোলায় মহল্লার পর মহল্লা উড়িয়ে দিয়েছে। মুজিবর রহমান সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েদের ইজ্জত বলতে আর কিছু নেই। সারা ঢাকা শহর যেন এক বিশাল কবরখানা। দিনের বেলাতেও সেখানে শিয়াল ঘুরছে, লাখ লাখ শকুন উড়ছে মাথার ওপর। মরা মানুষ পচে পচে ঢাকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি ঢাকায়, শহরের চার পাশের গ্রামগুলোতেও নরক নামিয়ে এনেছে খান সেনারা।

শফিকুল বলে যাচ্ছিল, 'খানের বাচ্চারা যে কোন সময় যে কোন জায়গায় হানা দিতে পারে। কাজেই হুঁশিয়ার। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সেই স্বাধীনতা জান দিয়ে হলেও রক্ষা করতে হবে। ঘরে ঘরে অস্ত্র বানাও, লড়াইয়ের জন্য তৈরি হও। আর সবাই নজর রাখবে জানোয়ারের বাচ্চারা কোন পথ দিয়ে আসছে। দেখতে পেলেই গ্রামে এসে খবর দেবে।'

শফিকুলের কথা কিছুটা বুঝেছে হাসেম, বেশির ভাগটাই দুর্বোধ্য থেকে গেছে। দেশের খবর সে বিশেষ রাখে না। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য জলে-স্থলে তাকে নিয়ত এত যুদ্ধ করতে হয় যে, তারপর আর কোনোদিকে তাকাবার সময় থাকে না।

তবে ঢাকায় যে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে, গোলাগুলি চলেছে, অনেক মানুষ মরেছে—আবছাভাবে এসব খবর আগেই কানে এসেছিল হাসেমের। গিরিগঞ্জের বন্দর, রসুলপুরের গঞ্জ কিংবা ইনামগঞ্জের হাট—যেখানেই সে গেছে শুধু ঢাকার কথা।

দুনিয়ার খবর তেমন একটা না রাখলেও মুজিবর সাহেবের নাম সে শুনেছে। আর শুনেছে হক সাহেব, জিন্না সাহেব এবং ভাসানি সাহেবের নাম। তবে মুজিবর রহমান ছাড়া আর কাউকে চোখে দ্যাখে নি। মুজিবর সাহেবকেও সে দেখেছে মাত্র একবার। মাস কয়েক আগে এদিকে ভোট হয়ে গেছে। তারও কিছু দিন আগে মুজিবর সাহেব গিরিগঞ্জের বন্দরে এসে 'মিটিন' করেছিলেন। আশেপাশের গ্রামগুলোতে একটা মানুষও ঘরে ছিল না, সব ছুটেছিল গিরিগঞ্জে। মৃধা বাড়ীর রমজান, নিকারী পাড়ার গয়জদ্দিন, আনিসুর, তাদের আর বারুইবাড়ির নিবারণের সঙ্গে হাসেমও গিয়েছিল। কি মানুষ, কি মানুষ! বন্দরের ডান পাশে নদীর ধার ঘেঁষে অত বড় মাঠটায় একটা কুটো ফেলবার জায়গা ছিল না। পশ্চিম

পাকিস্তান, অবিচার, বাংলা দেশের দাবি—এই রকম কত কথা বলে গিয়েছিলেন শেখ সাহেব। তা একটা বর্ণও বোঝে নি হাসেম। হাঁ করে বড় বড় চোখ মেলে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

সেই শেখ সাহেবকে নাকি খানের বাচ্চারা ধরে নিয়ে গেছে।

যাই হোক, শফিকুল বলার পর একটা সুপারি গাছ আর বাঁশ ঝাড়ও আস্ত রইল না, সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেল। আরো দেখা গেল নহরপুর, রসুলপুর, মাইনকার চারিইনামগঞ্জ—চারিদিকের গ্রামগুলোর যত জোয়ান ছেলে-মেয়ে, সব লাঠিখেলা ছোরাখেলা শিখছে। নহরপুর গ্রামে মতিউর সাহেব, মোতালেফ হোসেন চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম আর কামরুল হাসান সাহেবদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে। ওঁদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো বটেই, ওঁদের বন্দুক নিয়ে গ্রামের অন্য ছেলে-মেয়েরাও গুলি চালানো শিখেছে। আর কি আশ্চর্য, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যিনি বন্দুক চালানো শিখিয়েছেন তিনি আর কেউ নয় স্বয়ং গিরিগঞ্জ থানার বড় দারোগা আলতাফ আলি সাহেব।

হাসেম দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। যত দেখেছে ততই অবাক হয়েছে। আর কি এক অজানা অদ্ভুত ভয়ে বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপেছে। তার কেন যেন মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটবে, ভয়ঙ্কর কিছু—সাংঘাতিক কিছু।...

মিলিটারির ট্রাকগুলো এতক্ষণে অনেক কাছে এসে গেছে। গাঁ গাঁ আওয়াজে চমকে উঠল হাসেম।

শফিকুল বলেছিল, খানের বাচ্চাদের গাড়ি দেখলেই যেন গ্রামে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু হাসেম নহরপুর যাবে কিভাবে? ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে গেলে নির্ঘাত সে খানদের চোখে পড়ে যাবে। ওদের হাতে গুলি আছে, বন্দুক আছে। একবার যদি তাকে দেখে ফেলে তারপর যে কি হবে, ভাবতেও সাহস হল না হাসেমের।

তা ছাড়া ওরা যাচ্ছে গাড়িতে। হাসেম নহরপুর যাবার আগেই ওরা সেখানে পৌঁছে যাবে।

ট্রাকগুলো যখন আরও কাছাকাছি এসে যায়, হাসেম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এই মুহূর্তে না পালালে নিশ্চয়ই সে খানেদের চোখে পড়ে যাবে। আচমকা অলৌকিক শক্তির মতো কিছু একটা ধাক্কা মারতে মারতে খালের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হাসেম দেখল চৈত্র মাসের মজা খালের ওপর দিয়ে সে মুত্রা বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

এই ঘন জংগলের ভেতর থেকে খানের বাচ্চারা এ জন্মে তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। তবু হাসেমের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল যেন। হাত-পায়ের জোড় আলগা আলগা হয়ে আসছিল। শিরদাঁড়াটা আর শক্ত নেই, নরম হয়ে বেঁকে-চুরে যাচ্ছে। তবু শরীরের সবটুকু শক্তি হাঁটুতে জড়ো করে দাঁড়িয়েই থাকল সে, মুত্রার মসৃণ কালো কালো ডাঁটাগুলো ফাঁক করে বড় সড়কটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হায় খোদাতাল্লাহ, এবার যে কী হবে!

হাসেম আর ভাবতে পারছিল না। চৈত্র মাসের উজ্জ্বল রোদ তার চোখের সামনে যেন দ্রুত নিভে যেতে লাগল। আর তারই মধ্যে সে দেখতে পেল, মিলিটারিদের গাড়িগুলো ধোঁয়া উড়িয়ে পশ্চিম দিকের ঘন গাছ-গাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওরা নহরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল।

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েই থাকল হাসেম।

মুত্রা বনে এই চৈত্র মাসেই ফুল এসে গেছে। কুচকুচে কালো মসৃণ সতেজ গাছগুলোর মাথায় সাদা সাদা ফুলগুলোতে অল্প অল্প মিষ্টি গন্ধ। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি আর প্রজাপতি সেগুলোর ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। পেছন দিকে জঙ্গল যেখানে খুব ঘন সেখান থেকে ঝিঁঝিদের কান্না উঠে আসছিল। ঝিল্লিস্বর একটানা অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ থেমে যায়, তারপর আবার নতুন করে শুরু হয়। কোথায় যেন ডাহুক ডাকছিল। পেট টেনে টেনে সর সর করে সোনালী গোসাপেরা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, আর আছে নানা রকমের পোকা-মাকড়, পতঙ্গ। তারা হাসেমের গায়ে উড়ে উড়ে পড়ছিল।

কিন্তু কাছের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না হাসেম, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। মুত্রা বনের ফাঁক দিয়ে চোখ টান করে সে দূর নহরপুর গ্রামটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

গাছপালার আড়াল খুব ঘন বলে এই মুত্রাবন থেকে গ্রামটাকে দেখা যায় না। শুধু শোভান আলিদের উঁচু ভিতের ওপর বড় বড় সাতাশের বন্দের ঘরগুলোই যা চোখে পড়ে। এই বছরই অঘ্রান মাসে ধান ওঠার পর নতুন ঢেউটিন দিয়ে ঘরগুলো ছেয়ে নিয়েছে শোভান আলিরা। এখন, এই চৈত্রের দুপুরে নতুন টিনের চালগুলো থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

কতক্ষণ আর, একটু পরেই নহরপুরের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসতে লাগল —বুম, বুম, বুম—

গুলি চলছে তো চলছেই। সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের চিৎকার চৈত্রের বাতাসে ভেসে আসতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সমস্ত নহরপুর গ্রামটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। দুপুরবেলার ধারালো রোদে আগুন দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায় খানের বাচ্চারা গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

অসহায় ভীত মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

এ দিকে মুত্রাবনে ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, ডাহুক আর কোড়া পাখিরা এখন একেবারেই চুপ। মৌমাছি আর প্রজাপতিগুলো উধাও। পোকা-মাকড়েরা ওড়াউড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। পেট টেনে টেনে গোসাপেরা এখন আর চলছে না। এমন কি উত্তরের চকে টুকরো টুকরো রঙিন কাগজের মতো নানারঙের যে পাখিগুলো

উড়ছিল তাদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা কিছু একটা টের পেয়েছে—নিদারুণ, ভয়ঙ্কর কিছু।

বুকের ভেতর সেই যে নিশ্বাসটা আটকে গিয়েছিল সেটা আটকেই আছে। কিছুতেই আর তা বার করে দিতে পারছে না হাসেম। নিবিড় মুত্রাবনে ভয়ে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবতে চেষ্টা করল এই মুহূর্তে তাদের নহরপুর গ্রামটায় কী চলছে। কিন্তু তার কল্পনা খুব বেশিদূর এগুলো না। হাসেমের কল্পনাশক্তি ভারি দুর্বল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, হুঁশ নেই। কখন সূর্যটা আকাশের ঢালু গা বেয়ে বেয়ে পশ্চিমের উঁচু উঁচু চাপ-বাঁধা গাছপালার ওধারে নেমে গেল, কে জানে।

সেই দুপুরবেলা হাসেম যখন উত্তরের চকে জলসেঁচি কি হেলেঞ্চা শাক কুড়োতে এসেছিল সেই সময় রোদ ছিল গলা কাঁসার মতো। সূর্য ডুবে যাবার পর যে মরা মরা মলিন আলোটুকু এখন গাছপালার মাথায় আটকে আছে তার রং যেন বাসি হলুদ। চৈত্র মাসের শেষ বেলাটা খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

সকালবেলা ভুবন গোঁসাইর মা বুড়ি স্বর্ণময়ী তাকে এক ডালা মুড়ি, দুটো নারকেল ছাপা আর সাত-আটটা তিলের নাড়ু খেতে দিয়েছিল। ওই মুড়ি-টুড়ি ক'টা ছাড়া সমস্ত দিন পেটে আর কিছুই পড়েনি। চানও হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী এতক্ষণে তার পেট জ্বলে যাবার কথা। কিন্তু দুপুরে খানের বাচ্চারা নহরপুরে ঢুকবার পর খিদে-টিদের কথা আর মনে নেই হাসেমের। শরীরের সবরকম অনুভূতিই তার অসাড় হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছিল, গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

গুলির শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে আগের মতো অত বেশি আর একটানা নয়। থেমে থেমে—কিছুক্ষণ পর পর। গাছপালার ওপর দিয়ে গল গল করে যে ধোঁয়া উঠছিল এখন আর তা দেখা যাচ্ছে না। তবে খানেরা হানা দেবার পর একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে হাসেমের। নহরপুরের দিক থেকে যত রাজ্যের কুকুর আর শিয়াল আর হাজার হাজার পাখি বেরিয়ে এসে উত্তরের চকের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়েছিল।

দিনের আলো আরো ঝাপসা হয়ে এলে হাসেম দেখতে পেল মিলিটারি ট্রাকগুলো নহরপুরের বন গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওরা যত কাছে এগিয়ে আসছিল, গাঁ গাঁ শব্দের সঙ্গে তীক্ষ্ম বুক ফাটানো মেয়ে-গলার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, 'বাচাও—বাচাও—বাচাও'

মুত্রাবনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠল হাসেম। তার চোখে পড়ল গাড়ি বোঝাই করে লুঠের মাল আর যুবতী বয়সের অনেকগুলো মেয়েকে ইবলিশেরা নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সবাইকেই চিনতে পারল হাসেম। শফিকুলের বোন নাজিমা,

শোভান আলির দুই মেয়ে কামরণ আর জুলেখা, বারুই বাড়ির পাখি, আলো আর কাজল. মতিউর রহমান সাহেবের দুই ভাতিজি। তা ছাড়া রসুলপুর, ইনামগঞ্জ, মাইনকার চর, মালিকান্দার অনেকগুলো মেয়ে আছে। চারপাশের বিশ পঁচিশটা গ্রামে যত মানুষ তাদের সবাইকে শুধুই চেনেই না হাসেম, নামও জানে।

জেলা বোর্ডের এই লম্বা সড়কটা গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে নহরপুরের ভেতর দিয়ে সোজা মাইনকার চর পর্যন্ত চলে গেছে। মেয়েগুলোকে দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে খানের বাচ্চারা মাইনকার চর পর্যন্ত গিয়েছিল। 'হায় আল্লা, কী হইব এই মাইয়াগুলির, কী হইব!' নিজের মনে মনেই ফিস ফিস করল হাসেম, 'কে অগো বাচাইব ?'

গ্রামের মেয়ে, চেনা মেয়ে। কেউ তাকে চাচা ডাকে, কেউ ভাই, কেউ মামু। নাকমুখ দিয়ে হলকা ছুটতে লাগল হাসেমের। একবার তার ইচ্ছা হল মিলিটারি ট্রাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামের মেয়েদের ছিনিয়ে আনে। আর তখনই চোখে পড়ল, খানের বাচ্চাদের হাতে বন্দুক এবং আরো সাংঘাতিক চেহারার সব অস্ত্র।

মাথার ভেতর হঠাৎ চরকির মতো কী ঘুরে গেল হাসেমের। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সারা দিন পেটে ভাত পড়ে নি, চান হয়নি। তার ওপর ঠাটা পড়া রোদে সারা দুপুর চোখ টান করে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। ভয়ে ক্লান্তিতে আতঙ্কে দুর্বল শরীর নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল হাসেম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মুত্রাবন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে ট্রাকের শব্দ এবং মেয়েদের চিৎকার হাসেমের কানে দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

দুই

মুত্রাবনে কতক্ষণ পড়ে ছিল, হাসেমের মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল, সন্ধে হয়ে গেছে।

আবার চারিদিকে ঝিঁঝিঁদের ডাক শুরু হয়েছে। থেকে থেকে ঝোপের গভীর থেকে ডাহুক ডাকছিল। আর জ্বলছিল জোনাকি। মুত্রাবনে, পাশের শর এবং নলখাগড়ার ঝোপে, খাল পাড়ের হেলেঞ্চার দামে লাখ লাখ আলোর পোকা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

চৈত্রের শেষ বলে সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার নেমে যায়নি। দিনের আলোর একটুখানি আভা এখনও আলতোভাবে চারিদিকে লেগে আছে।

প্রথমটা হাসেম মনে করতে পারল না, এই মুত্রাবনে সে কেমন করে এল। তারপরেই দ্রুত সব কথা মনে পড়ে গেল।

জেলা বোর্ডের সড়কে এখন আর মিলিটারি ট্রাকগুলো দেখা যাচ্ছে না। কখন দূরের উঁচু পুল পেরিয়ে সেগুলো গিরিগঞ্জ বন্দরের দিকে চলে গেছে।

আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ল হাসেম, মুত্রার জঙ্গল ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর কচুরিপানায় ঠাসা মজা খাল পার হয়ে এসে উঠল উত্তরের চকে।

নহবপুরে হাসেমের কেউ নেই। না বাপ, না মা, না একটা ভাই। আত্মীয়-স্বজন বলতেও কেউ না। খোদাতাল্লাহ্‌র এতবড় দুনিয়ায় সে একা, একেবারে একা।

নিজের কেউ না থাক, নহরপুরের সঙ্গে তার হাজার নাড়ির যোগ। ওখানে জন্মেছে সে, জীবনের চল্লিশটা বছর ওখানেই কেটে গেল। ওই নিকারিরা, মুরারা কামাররা, বারুইরা, যুগিরা—রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ওরাই তার আপনজন তা ছাড়া আছে ভুবন গোঁসাইর মা বুড়ি স্বর্ণময়ী। তার সঙ্গেই হাসেমের সম্পর্কটা ক'বছর ধরে সব চাইতে গভীর।

এ পারে বুড়ির কেউ নেই। দেশখানা দুই টুকরা হবার ক'বছর পর ভুবন গোঁসাই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সীমান্তের ওপারে সেই কতদূরে কইলকাতার শহরে চলে গিয়েছিল। বুড়ি কিন্তু যায় নি, দেশের বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। কত বায়ট গেছে, কত রক্তারক্তি, কত হাঙ্গামা আর উত্তেজনা—বুড়িকে কিন্তু এক চুল নড়ানো যায়নি। দেশের বাড়িঘর, জমি-জমা, কলাকড় পাহারা দেয় বুড়ি।

ভুবন গোঁসাইদের জমিজমা ক একটুখানি ছিল। তিন কানি জমির ওপর বাড়ি, দুতিনটে বড় বড় দীঘির মতো পুকুর, বাগ বাগিচা, নব্বই কানি দোফসলা জমি। অবশ্য অতখানি জমিজমা এখন আর নেই। হিন্দুস্থানে যাবার আগে ভুবন গোঁসাই কিছু বেচেছে। তারপর একেকটা বায়ট হয়েছে—শোভান আলিরা, ইসমাইল ভুঁইঞারা খানিকটা খানিকটা করে জমি কেড়ে নিয়েছে। এখন পাঁচ সাত কানির বেশি নাবাল খেত ছাড়া আর কিছুই নেই। ওতেই বুড়ির কোনোরকমে চলে যায়। অবশ্য বাড়ি আর পুকুরগুলো আছে।

আগে আগে যখন জমিজমা বেশি ছিল, ধানপাট বেচে হুণ্ডি করে বুড়ি কলকাতা টাকা পাঠাত। মাঝে মধ্যে ভুবন গোঁসাইও দেশে আসত। তবে সেবার হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার পর আর আসে নি ভুবন গোঁসাই। আজকাল চিঠি পত্তরেই মার খোঁজখবর রাখে। অনেক সময় হাসেম অবাক হয়ে ভেবেছে, মা হল এক দেশের মানুষ, ছেলে আরেক দেশের। এ জন্মে মায়ে-পোলায় আর কি দেখা হইব ?

অত বড় বাড়িতে খান পাঁচেক বড় বড় পাঁচিশের বন্দের ঘর ভুবন গোঁসাইদের। সেখানে একা একা বুড়ি কি করে থাকে ? এখান থেকে যাবার আগে হাসেমকে ডেকে একটা ঘর দিয়ে গেছে ভুবন গোঁসাই। তাতে দু'জনেরই সুবিধে হয়েছে। ভুবন গোঁসাইর মা একটা সঙ্গী পেয়ে বেঁচেছে। মানুষই হচ্ছে বল ভরসা, হাসেমকে পেয়ে বুড়ির সাহস বেড়েছে। হাসেমেরও লাভ কম হয়নি, জন্মে থেকে এর ওর বাড়ির

খোলা বারান্দায় রাত কাটিয়ে জীবনের তেত্রিশ চৌত্রিশটা বছর পার করে দিয়েছে সে। বর্ষায় আর শীতে কী কষ্টই না গেছে! বৃষ্টি পড়লেই চারপাশ খোলা বারান্দা ভেসে যেত. শীতে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া এসে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত জমিয়ে দিত। ভুবন গোঁসাই ডেকে ঘর দেবার পর জীবনে এই প্রথম সে টিনের চাল-ওলা একখানা আস্ত ঘরের নিচে আশ্রয় পেয়েছে। শীতে বা বর্ষায় এখন আর কষ্ট নেই।

ভুবন গোঁসাইর বাড়িতেই থাকে হাসেম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তার নিজস্ব। নিজেরটা নিজেরই ফুটিয়ে নেবার কথা। কিন্তু ভুবন গোঁসাইর মা ক'দিন আর তাকে চুলা ধরাতে দেয়! নিজের সঙ্গে হাসেমেরও চাল ফুটিয়ে নেয় বুড়ি।

হায় রে, হায়! খানের বাচ্চারা তো ঢুকেছিল নহরপুরে। ভুবন গোঁসাইর মা কি বেঁচে আছে এখনও? কী হাল হয়েছে শফিকুলদের? শোভান আলি, হাসমত মিঞা, কামরুল হাসান, মতিউর হোসেন চৌধুরী—খান সেনারা এদেরও কি বাঁচিয়ে রেখেছে? কী অবস্থা হয়েছে নিকারিদের, মৃধাদের, বারুইদের. কামারদের, কুমোরদের? ওদের বাড়িগুলো তো পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা. একবার আগুন লাগিয়ে দিলে ফাত ফাত করে পাড়াকে পাড়া ছাই হয়ে যাবে।

উত্তরের নাবাল চক থেকে জেলা বোর্ডের বাঁধানো সড়কে উঠে এল হাসেম। তারপর নিশি পাওয়া মানুষের মতো নহরপুরের দিকে ছুটতে লাগল।

গ্রামের ভেতর পা দিয়েই শিউরে উঠল হাসেম। শোভান আলিদের বাড়িটা প্রথমেই পড়ে। বাড়িটার আর কিছুই নেই। ইবলিশেরা পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। পোড়া শালকাঠের খুঁটি আর টিনের চাল ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। উঠোনের একধারে সারি সারি ধানের ডোল ছিল; জানোয়ারেরা সেগুলোও পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধান পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

হায় রে হায়. ধান বলে কথা! দুই মুঠা ভাতের জন্য সারাটা জীবন কী না করেছে হাসেম! আর সেই ধান কত কষ্টের আর সাধের ফসল. ইবলিশেরা পুড়িয়ে দিয়ে গেল!

এখনও আগুন সবটা নেভে নি, বাড়িময় জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কাঁথা-বালিশ-তোষক-বাক্স-প্যাটিবার স্তূপ।

বাড়িটা এই মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। থেকে থেকে পেছনের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝি ডাকছে।

আচমকা অদ্ভুত এক ভয় হাসেমকে পেয়ে বসল। গলা ফাটিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল ছোভান সাব—ছোভান সাব। 'চেঁচাল বটে. কিন্তু গলার ভেতর থেকে খুব সরু, দুর্বল একটা শব্দ বেরিয়ে এল মাত্র।

কেউ উত্তর দিল না।

হাসেম আবার ডাকল, 'ছোভান সাব—আপনারা কই গ্যালেন হগলে—' এবার গলাটা আরেকটু চড়াল।

এবারও সাড়া নেই।

চেঁচাতে চেঁচাতে গলা যখন চিরে এল, সেই সময় শোভান আলিদের দেখতে পেল হাসেম। হায় আল্লা, এর চাইতে যদি না দেখত! শোভান আলি তার তিন ছেলে, এক মেয়ে, শোভান আলির দুই বিবি আর ওদের বাড়ির তিনটে কামলা—কেউ প্রাণে বেঁচে নেই। উত্তরের ঘর পুবের ঘর, দক্ষিণের ঘর আর উঠোনের পশ্চিম কোণায় ওরা পড়ে আছে, রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে।

এক পাল শিয়াল বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। ওরা কিভাবে টের পেয়ে গেছে, কে জানে। নেহাত হাসেমকে দেখে থমকে আছে. সে চলে গেলেই শোভান আলিদের শরীরগুলোর কী হাল হবে, ভাবতেই সিউরে উঠল হাসেম।

সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। এই নিঝুম সন্ধ্যায় যখন মরা মানুষের মাংসের লোভে শিয়ালের চোখ জ্বলছে, চারপাশ থেকে কী যেন একটা উঠে এসে হাসেমের দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। সে অনুভব করছিল, জিভটা ভেতর থেকে কেউ টানছে, কণ্ঠার হাড় জোরে জোরে ওঠানামা করছিল। বুকের ভেতরটা কাঁপছিল বাঁশপাতার মতো।

হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল হাসেম। মনে হল, তার পেছন পেছন কারা যেন তাড়া করে আসছে। শোভান আলিদের বাড়ি থেকে খানিকটা গেলেই মৃধা পাড়া। সেখানেও একটা বাড়ি আস্ত নেই, খানের বাচ্চারা জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু পোড়া পোড়া খুঁটিগুলো আকাশের দিকে কোনো-রকমে মাথা খাড়া করে আছে।

দূরে ঘন জঙ্গলের তলা থেকে রুপার থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় হাসেম দেখতে পেল, অগুনতি মরা মানুষ চারি-দিকে ছড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, তমিজদ্দি—তমিজদ্দি, রাজেক—উসমাইনা—'

পর পর অনেকগুলো নাম বলে গেল সে কিন্তু কোনোদিক থেকে সাড়া নেই! তার গলার স্বর চৈত্রমাসের উল্টাপাল্টা বাতাসে ভাসতে ভাসতে উত্তরের চকের দিকে মিলিয়ে গেল।

এ কোথায় এল হাসেম? এই কি তার আজন্মের চেনা নহরপুর? মরা মানুষের এই রাজ্যে সে ছাড়া আর কি কোন জীবন্ত তাজা মানুষ নেই? তার মনে হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ এই মৃধাপাড়ায় থাকলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।

খানিক আগের সেই আতঙ্কটা হাসেমকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল নিকারিপাড়ায়। এখানেও সেই একই দৃশ্য। চারিদিকে মরা মানুষ। জোয়ান পুরুষরা তো আছেই। বাচ্চা-কাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি, মাইয়া মানুষ—শয়তানের ছাওয়া কাউকে বাদ দেয় নি। হাসেম চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ বাইচা (বেঁচে) আছ গো? হালিম-গাজিউদ্দি-

মুন্তাইজা, পরানে বাইচা থাকলে হুমের (সাড়া) দাও—'

কোনো উত্তর নেই।

গলায় বল তুলে হাসেম আবার চেঁচাল, 'কেউ বাইচা আছ? তোমাগো কিরা, হুমের (সাড়া) দ্যাও' তার ভীষণ ভয় করছিল। এই মুহূর্তে একটা জ্যান্ত মানুষ চাই হাসেমের যে কথা বলে সঙ্গ দিয়ে সাহস দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। জীবন্ত মানুষের মুখ না দেখলে সে আর বেশিক্ষণ মাথা খাড়া রাখতে পারবে না।

হঠাৎ চাঁদের আলোয় হাসেমের চোখে পড়ল নিকারিপাড়ার পেছন দিকে নলখাগড়ার বন থেকে কে যেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে আসছে।

হাসেম চমকে উঠল। মনে প্রাণে যদিও সে জীবন্ত মানুষ দেখতে চাইছিল তবু গ্রামজোড়া এই কবরখানায় কেউ যে বেঁচে আছে, এটা সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

ফোঁপানিটা কাছাকাছি এলে হাসেম চিনতে পারল—জহিরদ্দির বউ কুলসম। সে আগেই জানত, বউটা ন'দশ মাসের গাভীন। তার চেহারা দেখেও তাই মনে হয়।

চেনা মানুষ পেয়ে ফোঁপানির জায়গায় ডাক ছেড়ে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল বউটা, 'অয় রে, অয় রে, আমার কী সব্বনাশ হইল রে—'

সর্বনাশটা কী হতে পারে, হাসেম বুঝতে পেরেছে। তবু নিজের অজান্তেই সে ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?'

প্রথমটা কিছুই বলতে পারল না কুলসম। কাঁদতে কাঁদতে হিক্কার মতো আওয়াজ বেরুতে লাগল তার গলা থেকে। তারপর ভাঙা ভাঙা জড়ানো স্বরে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম দুপুর বেলা পাটকাঠি আর শুকনো পাতা জ্বালিয়ে কুলসম ভাত রাঁধছিল। তার সোয়ামী জহির উঠানের এক পাশে বড় জাম্বুরা গাছটার তলায় বসে তামাক খাচ্ছিল। আর তাদের তিন তিনটা পোলামাইয়া খিদের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান করছিল। সেই সময় এল জল্লাদেরা। খানের বাচ্চাদের দেখেই ভয়ে কুলসম এক দৌড়ে পেছনের নলখাগড়া ঝোপে গিয়ে ঢুকেছিল। জহির কিংবা ছেলে-মেয়ে তিনটে সে সুযোগ পায়নি। নলখাগড়া ঝোপে শ্বাস বন্ধ করে কুলসম দেখেছিল, খানেরা গুলি করে জহিরকে মারল, বাচ্চাগুলোকে মারল, তাদের নাড়ার ছাউনিদেওয়া পাটকাঠির ঘর জ্বালিয়ে দিল। শুধু যে ওদের ঘরই, সারা নিকারিপাড়াটাই ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। মাইয়া পুরুষ কাউকে আর কিছুই রাখে নি, সবাইকে শেষ করে দিয়ে গেছে। শুধু কুলসমের মতো দু চারজন, যারা জঙ্গল-টঙ্গলে পালাতে পেরেছিল, বেঁচে গেছে।

কথা শেষ করে দু হাতে কপাল আর বুক চাপড়ে আবার দারুণ কান্না শুরু করল কুলসম, 'অয় রে, কী পাষাণ পরাণ আমার, চোখের সুমখে (সামনে) সোয়ামীরে মারল, পোলা-মাইয়ারে মারল, আমি চাইয়া চাইয়া দেখলাম। অয় রে খোদা, আমি ক্যান বাইচা আছি?

কী বলবে, ভেবে পেল না হাসেম। এইটুকুই সে বলতে পারল, 'কাইন্দো না, কাইন্দো না জহিরের জরু—'

কুলসমের কান্না তাতে থামল না, দশ বিশগুণ বেড়ে গেল, 'অহন (এখন) আমি কী করি রে, কী করি? এই পরাণ রাইখা আর কী হইব? কোন্ কামে লাগব?'

এই গ্রামেরই মেয়ে কুলসম, এই গ্রামেরই বউ হয়েছে। জহিরের দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন হ'ত সে। ছেলেবেলা থেকেই হাসেমকে চেনে কুলসম। সে বলতে লাগল, 'হাসমা ভাই, আমারে মাইরা ফালাও, মাইরা ফালাও। আমি আর সইতে পারি না।'

হাসেম এবারও শুধু বলতে পারল, 'কাইন্দো না, কাইন্দো না।'

কুলসম আর কিছু বলল না। কাঁদতেই লাগল, কাঁদতেই লাগল।

এই মৃত্যুপুরীতে এতক্ষণে একটা জীবন্ত মানুষ দেখল হাসেম। সত্যিই কি কুলসম জীবন্ত? কথা বললে, হাত-পা নাড়লেই কি একটা মানুষ বেঁচে থাকে? সে বলল, 'যা হওনের হেয়া তো হইয়াই গ্যাছে, এইখানে খাড়হয়া থামকা আর কী হইব। লও যাই—'

শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কুলসম। তারপর বলল, 'কই যামু? কী করুম?'

'দ্যাখ গেরামের আর কেউ বাইচা আছে নি হ (নাকি)। তাগো লগে পরামর্শ করি। হগলে (সবাই) যা কয়, হেই করণ যাইব।'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'অগো এমনে ফালাইয়া আমি যাইতে পারুম না—' স্বামী আর সন্তানদের মৃতদেহগুলো দেখিয়ে কুলসম বলতে লাগল, 'আমি বাইচা থাকতে অগো শিয়ালে শকুনে ছিড়া খাইব!'

'কী করতে চাও?'

'যদি গোরও দ্যাওন যাইত—'

একটু ভেবে হাসেম বলল, 'হেয়া তো ঠিকই, ঘরে কুদাল (কোদাল) আছে?'

কুলসম মাথা নাড়ল, 'আছে।'

'লইয়া আসো—'

কোদাল এলে কুলসমদের বাড়ির উঠানে ক্ষিপ্র হাতে প্রকাণ্ড এক গর্ত খুঁড়ে ফেলল হাসেম। তার ভেতর জহির আর তার তিন ছেলেমেয়েকে শুইয়ে যখন মাটি চাপা দিচ্ছে তখন আর পারল না কুলসম। এতক্ষণ কাঁদছিলই, এবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দৌড়ে গিয়ে পেছনের খাল থেকে জল এনে কুলসমের চোখেমুখে ঝাপসা দিতে দিতে অনেকক্ষণের চেষ্টায় জ্ঞান ফিরল। উঠে বসে দুই হাঁটুর মাঝখানে থুতনি গুঁজে

ফাঁকা চোখে বোবার মতো তাকিয়ে থাকল সে। এখন আর কাঁদছে না কুলসম, কোনো কথাও বলছে না। মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নাকি জহীরের জরুর ?

কুলসমের দিকে তাকিয়ে থাকাব সময় এখন নয়। তাড়াতাড়ি জহিরদের মাটি চাপা দিয়ে কুলসমকে নিয়ে হাসেম নিকারিপাড়া থেকে বেরিয়ে এল।

এখান থেকে ডান দিকে গেলে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের উঁচু রাস্তা। বাঁ দিকে মাটির পথ। নহরপুরের নানা পাড়ার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকে-বেঁকে পথটা দক্ষিণের চকে গিয়ে নেমেছে।

পথটার দু'ধারে ঝোপঝাড়, ছোট ছোট খাল, কোথাও চাপ-বাঁধা গাছপালা, কোথাও খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

এই সন্ধ্যাবেলাতেই চারিদিকে নিষুতি নেমে এসেছে। অন্য দিন এই সময় ঘরে ঘরে কুপি কি হেরিকেন জ্বলে ওঠে। নিকারিপাড়ায় মৃধাপাড়ায় গাজির গীত কি গুনাইবিবির গানের আসর বসে যায়। যুগিপাড়া থেকে তাঁতের খটখটানি কি কুমোরপাড়া থেকে ঝাঁক ঝাঁক পইতনা চালাবার আওয়াজ ভেসে আসে। আজ আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। নহরপুর গ্রামে জীবনের সব লক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনো দিন যে এখানে মানুষ বাস করেছিল, সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একেকটা সংসাব সাজিয়ে নিয়েছিল, তা যেন ভাবাই যায় না।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। তার মধ্য দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। যেতে যেতে মাঝে মাঝে হাসেম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'কেউ বাইচা আছ গো, কেউ বাইচা আছ ?' হাসেম যেন এক অলৌকিক বার্তাবাহক। এই মৃত্যু আর হত্যার রাজ্যে সে জীবনের ঘোষণা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নিকারিপাড়া পেছনে ফেলে দক্ষিণে বাঁক ঘুরতেই পিটক্ষীরা আর সোনালের জঙ্গল থেকে জন তিনেক উঠে এল। চাঁদের আলোয় ওদের দেখেই চেনা গেল— গহরাদ্দি, আনিস আর বায়তুল্লা। গহরাদ্দি আর আনিস নিকারিপাড়ার, বায়তুল্লা মৃধাপাড়ার। ওদের চোখ লাল টকটকে, যেন রক্ত জমাট বেঁধে আছে। খাপচা খাপচা চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। তিনজনকেই উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল।

হাসেমকে দেখে ওরা তিনজনেই একসঙ্গে কেঁদে উঠল, তমস্ত দিন তুই আছিলি কই রে হাসমা ?'

কোথায় ছিল, হাসেম বলল।

তিনজন ভাঙা, উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বলতে লাগল, 'হায় রে হায়, আমাগো হগল শ্যাষ। বাড়িঘর, পোলা-মাইয়া, হগল (সবই)। হায় রে হায়, কী করুম অহন ?' হেই দুফার থনে জঙ্গলে বইসা বইসা মানুষ মারণ দেখলাম, আগুন ধরাইতে দেখলাম, যুবতী মাইয়াগো ধইরা লইয়া যাইতে দেখলাম। হায় রে হায়, কী হইব ? কী হইব ?'

প্রথম দিকে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল হাসেম। এখন মনে মনে খানিকটা সাহস ফিরিয়ে এনেছে সে। বলল, 'আগে খোজ লইয়া দেখি আর কেউ বাইচা আছে নিহি। আহো (এসো)—'

ওদেরও সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল হাসেম।

নিকারিপাড়ার পর বারুইপাড়া, তারপর কুমোরপাড়া, কুমোরপাড়ার পর যুগী পাড়া। যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেখানেই হাসেম হাঁকছে, 'কেউ বাইচা আছ?'

তিন পাড়ার পাশের বন আর বাঁশঝোপ থেকে মোট পাঁচজন উঠে এল। ওরা কুমোরপাড়ার বিনোদ, হাচাই আর বেঙ্গা। বাকি দুজন যুগীপাড়ার রসময় আর নিবারণ। ওদেরও সর্বস্ব গেছে।

যুগীপাড়ার পর প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ। তার এক পাশে বড় মসজিদ। আরেক পাশে শফিকুলদের বাড়ি।

মাঠ পেরিয়ে শফিকুলদের বাড়ির সীমানায় আসতেই সেই একই দৃশ্য, খানের বাচ্চারা ওদের বাড়িটা ভেঙেচুরে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে রক্তের নদীর মধ্যে পড়ে আছে শফিকুল, তার বাজান মোতালেফ হোসেন চৌধুরী, তার নানী, দুই ভাই, মা এবং এক আপা। শফিকুলের বোন নাজমাকে অবশ্য দেখা গেল না।

হাসেমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মুত্রা বনের ভেতর দাঁড়িয়ে সন্ধের আগে সে দেখছিল খানসেনারা নাজমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হায় রে হায়, শফিকুলদের গোটা পরিবারটাই শেষ হয়ে গেল!

চাঁদের আলোয় হাসেম দেখতে পেল, শফিকুলের বুক গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। তার হাতে একটা দোনলা বন্দুক। খুব সম্ভব ইবলিশের ছাওদের বাধা দিতে বেরিয়েছিল সে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হাসেম। তারপর কুলসমদের নিয়ে মৃত দেহগুলোর পাশ দিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

শফিকুলদের বাড়ির পেছন দিকে কামারপাড়া, তারপর নাপিতপাড়া, গণকপাড়া।

নহরপুর গ্রামটা ঘুরে জনকুড়ি জীবন্ত মানুষ সংগ্রহ করে হাসেম যখন দক্ষিণের চক পেরিয়েছে সেই সময় ভুবন গোসাইর মা'র কথা মনে পড়ে গেল। হায় রে হায়, সারা গ্রাম যখন শেষ তখন বুড়ি কি আর বেঁচে আছে?

ভুবন গোঁসাইর মা'র সঙ্গে এক বাড়িতে দশ-বারো বছর আছে হাসেম। আজকাল সমস্ত দিনের বেশির ভাগ সময়টা তার সঙ্গেই কেটে যায়। অথচ সারা গ্রাম ঘুরবার পর কিনা বুড়ির কথা মনে পড়ল!

হাসেম হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

নহরপুরের আর সব বাড়ির যা দশা হয়েছে, ভুবন গোঁসাইর বাড়ির হাল তার চাইতে আলাদা হবে কেন? উত্তরের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর, দক্ষিণের ঘর,

বলতে আর কিছু নেই। গোটা বাড়িখানা টিন এবং পোড়া কাঠের স্তূপ হয়ে আছে।

হাসেম একবার এদিকে যায় একবার ওদিকে। বুড়ি কি এই বাড়ির সঙ্গেই পুড়ে ছাই হল? পাগলের মতো টিনের স্তূপ টানাটানি করতে করতে হাসেম শিথিল কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'ঠাউরমা—ঠাউরমা (ঠাকুরমা)—'

হাসেমের সঙ্গে আনিস-গহরদ্দি-নিবারণরাও ডাকাডাকি শুরু করে দিল এবং হাতে হাতে সরিয়ে দেখতে লাগল তার তলায় বুড়ি মরে পড়ে আছে কিনা।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর খানিক দূরে একটা মজা পুকুরের তলা থেকে একটা ক্ষীণ দুর্বল স্বর ভেসে এল, 'হাসমা নিহি? কই তুই—কই?'

শুনেই চিনতে পারা গেল—ভুবন গোঁসাইর মা। টিন-টিন ছেড়ে খাড়া উঠে দাঁড়াল হাসেম। তার শিরায় শিরায় অস্বাভাবিক বেগে রক্ত ছুটতে লাগল। জোরে জোরে বুক ভরে বারকতক শ্বাস টেনে সে পুকুরটার দিকে দৌড়ে গেল। পাড় থেকে চিৎকার করে বলল, 'এই যে আমি —এই যে আমি--

পুকুরটা বড় বড় কচুরিপানায় ঠেসে আছে। তার মধ্যে থেকে ভুবন গোঁসাইর মা উঠে এল। বুক পর্যন্ত তার জল-কাদায় মাখা। বোঝা যাচ্ছে, খান-সেনাদের দেখে সে কচুবিবনে গিয়ে ঢুকেছিল।

বুড়িকে নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না হাসেম। পলক হীন তাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনে বাইচা আছেন ঠাউরমা, অহনও বাইচা আছেন।'

'আছি রে আছি—'ভুবন গোঁসাইর মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'পোড়াকপাইল। তুই আছিলি কই? আমি তো ভাবলাম ওই খান নিব্বইংশারা তরে শ্যাষ করছে। তরাসে আমার বুক কাঁপতে আছিল।'

হাসেম বলল, 'আমি উত্তরের চকের উই কিনারে মোতরাবনে ঢুইকা আছিলাম। আহেন (আসুন)—'

'তুই যে বাইচা ফিরা আবি (আসবি) ভাবি নাই।'

হাসেম উত্তর দিল না, ভুবন গোঁসাইর মাকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বুড়ি কাঁদছিলই। জড়ানো জড়ানো ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'যম আইছিল, যম। হা ঈশ্বর, অগো শরীলগুলাই মাইনষের। এমন কইরা কেউ যে খুন করতে পারে, ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতে পারে, না দ্যাখলে বিশ্বাস যাইতাম না।'

বাড়ি এসে ঘরগুলোর অবস্থা দেখে ভুবন গোঁসাইর মা'র কান্না বিশগুণ হয়ে উঠল, 'অয় রে, অয় রে, ডাকইতরা কী কইরা গ্যাছে রে!'

কুলসমরা উঠোনের একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, ভুবন গোঁসাইর মাকে কাঁদতে দেখে তারাও বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্নাটা একটু কমে এলে নিকারিপাড়ার গহরদ্দি বলল, 'বাড়ি গ্যাছে ঘর গ্যাছে।

অহন কী করন ?'

আরো দু-চারজন এক সঙ্গে বলে উঠল, কী করন ? কও কী করন ?'

প্রথমটা কেউ কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পর যুগীপাড়ার সুবল বলল, 'এহানে আর থাকন যাইব না। বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিছে। চাউল-ডাইল-ধান-কলই—হেইর লগে পুড়ছে। এহানে থাকলে খামু কী ? থাকুম কই ?'

হঠাৎ ফোঁপাতে ফোঁপাতে মৃধাপাড়ার বায়তুল্লা বলল, 'না গ্যালে যেই কয়জনও বাইচা আছি তাগোও বাচতে হইব না।'

সবাই চমকে উঠল, 'ক্যান ?'

'বড় সড়কের কিনারে ব্যাত ঝোপড়ার (বেত ঝোপের) ভিতরে আমি পলাইয়া আছিলাম। খানের বাচ্ছারা বিকালবেলা যহন ফিরা যায় কওয়া-কওয়ি করতে আছিল, কাইল আবার আইব। আইজ মাইনকার চর তরি (পর্যন্ত) গেছিল। কাইল দক্ষিণ দিকের গেরামগুলানে যাইব। হায় রে হায়, কাইল মালিকান্দা, তাজহাট, ইনামগঞ্জ, নবীগঞ্জের অবস্থা যে কী হইব !' একটু থেমে আবার বলল, 'যাইব তো এই সড়ক ধইরা ইবলিশেরা, যদি আমাগো দ্যাখে আর কি পরাণে বাচুম !'

বুদ্ধশ্বাসে সবাই বলল, 'তয় (তা হলে) ?'

হাসেম বলল, 'বাচতে হইলে আইজই এহান থনে পলাইতে হইব।'

'কই যাওন যায় ?'

একটু ভেবে বায়তুল্লা বলল, 'গোবিগঞ্জের দিকে যাওন যাইব না। খানের বাচ্চারা ওই দিকে আছে।'

হাসেম বলল, 'ঠিক কইছ। আমরা যামু উল্টা দিকে। যেহানে গেলে বাচতে পারি তেমনু একখান জাগা (জায়গা) বিচারাইয়া (খুঁজে) বাইর করতেই হইব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিবারণ শ্বাস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'কিন্তুক—'

'কী ?'

'পলানের (পালাবার) কথা তো কইতে আছ। কিন্তুক পোলা-মাইয়া-বউ-ভাই বইন মইরা পইড়া রইল। তাগো কী হইব ?'

এতক্ষণ যে যার প্রাণ বাঁচাবার কথা ভাবছিল। মৃত প্রিয়জনের কথা মনে করিয়ে দিতে আবার নতুন করে কান্নার রোল উঠল। কেউ কেউ উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, 'যামু না, যামু না, যা হওনের হউক। ধনেগো ফালাইয়া পরাণ থাকতে যাইতে পারুম না।'

হাসেম বলল, 'পাগলামি কইরো না তুমরা। যারা গ্যাছে হে'রা (তারা) আর ফিরা আইব না। পরাণখান যহন আছে বাচনের কথা ভাবো।'

ভুবন গোঁসাইর মা বল্ল, 'হ, এই একখান কথা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

আনিস বলল, 'তয় এক কাম করি—'

'কী?'

'যারা মরছে তাগো লাস কবর দিয়া যাই, হিন্দুগোটা পোড়াইয়া লও।'

রসময় বলল, 'পোড়ানের কি গোর দ্যাওনের সোমায় (সময়) নাই। ওই হগল করতে গ্যালে রাইত ভোর হইয়া যাইব। শুনছি, সকাল হইলেই খানের বাচ্চারা মানুষ মারতে বাইর হয়। পলাইতে হইলে রাইতের আন্ধারই ভাল।'

বায়তুল্লা বলল, 'ঠিকই কইছ।'

অন্য সবাই বলল, 'তুমরা যা ভাল বোঝো, কর—'

বলামাত্রই কিন্তু ওরা চলে যেতে পারল না। গহরালি-আনিস নিবারণ-রসময়-বিনোদ, সবাই যে যার বাড়ি গিয়ে শেষবারের মতো নিহত প্রিয়জনদের মুখগুলো দেখে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে এসে উঠল।

নহরপুর পাঁচশো লোকের গ্রাম। তার ভেতর মাত্র বাইশ জন জীবন্ত মানুষ চোদ্দ পুরুষের জন্মভূমি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। বাকি পৌনে পাঁচ শো বাচ্চা-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষের শব সারা গ্রামে ছড়িয়ে রইল। যেতে যেতে হাসেম ভাবতে লাগল, আজকালের মধ্যেই ওরা শিয়াল এবং শকুনের খাদ্য হয়ে যাবে।

জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে ওরা হাঁটছিল, হাঁটছিল, আর হাঁটছিল। এখন কেউ কথা বলছে না। মাঝে মাঝে শুধু বুকচাপা দমকা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এখন কত রাত, কে জানে। সড়কটার দু ধারে কচুরিপানায় বোঝাই খাল। তার পরে কোথাও বউন্যা ও হিজলবন, কোথাও শরের জঙ্গল। আবার কোনো জায়গা একেবারে ফাঁকা। তবে খালের ওপার থেকে মাইলের পর মাইল চক, চৈত্র মাসের এই শেষের দিকে চকগুলো ফসল শূন্য।

চাঁদটা এখন সোজা মাথার ওপরে। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ধুয়ে যাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ে, হিজল বনে লক্ষ লক্ষ জোনাকি উড়ছিল, ঝিঁঝি ডাকছিল। বউন্যা গাছের মাথা থেকে হুতোম প্যাঁচা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল।

বড় সড়কের দু ধারে চকের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম।

নহরপুরের সীমানা ছাড়িয়ে একসময় হাসেমরা তাজহাটি এসে পড়ল। সড়কের গায়েই গ্রামটা। জ্যোৎস্নাটুকু বাদ দিলে তাজহাটির কোনো বাড়িতেই আলো-টালো জ্বলছে না। মানুষের সাড়াশব্দ নেই। নহরপুরের মতো এ গ্রামও নিশ্চয়ই খানেদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাস্তা থেকে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে তাজহাটিতে ঢুকলে প্রথমে যে ক্যাঁচা বাঁশের ঘরখানা পড়ে সেটা ফরিদদের।

পাশাপাশি গ্রামের মানুষ, ফরিদের সঙ্গে কত কালের জানাশোনা। হাসেম চেঁচিয়ে ডাকল, 'ফরিদ ভাই—অ ফরিদ ভাই—'

উত্তর নেই।

ভাল করে তাকাতে হাসেমের চোখে পড়ল, ফরিদ ভূঁইয়াদের ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একবার সে ভাবল, সাঁকো পেরিয়ে ফরিদদের খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। পরক্ষণেই ঠিক করল যাবে না। কী হবে গিয়ে? ওখানে গেলে কী দেখা যাবে, সে জানে। পোড়া বাড়ির ছাই-এর গাদার পাশে নিশ্চয়ই ফরিদ ভূঁইয়া তার ছেলেমেয়ে-বউ নিয়ে মরে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখবার সাধ আর তার নেই।

বড় করে শ্বাস টেনে হাসেম আবার হাঁটতে লাগল, ওর সঙ্গে বাকি একুশ জনও চলছে।

খানিকটা যাবার পর পাশের ধঞ্চে বন থেকে চাপা ভীত সুরে কে বলে উঠল, 'ক্যাঠা (কে) যায়?'

হাসেমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবার হয়ে হাসেম বলল, 'আমরা নহবপুরের মানুষ।'

'কী নাম তুমার?'

'হাসমা—'

'আহি (আসছি), খাড়াও—'

ধঞ্চে বন থেকে শুধু একজন না, যে কথা বলছিল সে তো বটেই, তার সঙ্গে আরো চার পাঁচজন উঠে এল। সেই এক চেহারা তাদের—উদ্‌ভ্রান্ত, ভীত, বিপর্যস্ত।

চেনাজানা মানুষ। ওরা বলল, 'আমাগো গেরাম খ্যাক্কেবারে শ্যাষ। ভিতরে গ্যালে বুঝতা, দোজখ কারে কয়। আমাগো এই কয়জনেরে বাদ দিলে আর কেউ বাইচা নাই। খানেরা বেবাকরে (সকলকে) শ্যাষ কইরা দিছে। ধইঞ্চা খ্যাতে পালাইয়া আমরা পরাণ বাচাইছি' বলতে বলতে লোকগুলো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

হাসেম বলল, 'আমাগো গেরামও দোজখ। কাইন্দো না, কাইন্দো না (কেঁদো না, কেঁদো না)—'

কাঁদতে কাঁদতে লোকগুলো বলল, 'এই রাইতে তুমরা কই চলছ?'

হাসেমরা জানায়, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

তাজহাটির লোকগুলো বলল, 'তোমাগো লগে আমরাও যামু। পোলা মাইয়া গ্যাছে, বাড়িঘর পুড়ছে—এই জাহান্নামে থাইকা আর কী করুম!'

'গ্যালে চল—'

নহরপুরের বাইশ জনের সঙ্গে তাজহাটির পাঁচ ছ'জন যোগ হয়ে দলটা বড় সড়কের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

তাজহাটির পর রসুলপুর। তারপর একে একে নবীগঞ্জ, মালিকান্দা, রসুনিয়া, ইনামগঞ্জ।

সবগুলো গ্রামেরই এক অবস্থা। যে গ্রামের পাশ দিয়েই হাসেমরা যাচ্ছে, ঝোপজঙ্গল থেকে দু'জন চারজন করে জীবন্ত মানুষ উঠে এসে তাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

ভোর রাতের দিকে ওরা মাইনকার চরে পেঁছে গেল। আর তখনই ফুলবানুর কথা মনে পড়ে গেল হাসেমের। সে শুনেছে, খানেরা আজ এই মাইনকার চর পর্যন্ত এসেছিল। হায় রে হায়, তারপরেও কি ফুলবানু বেঁচে আছে?

ফুলবানুর কথা মনে পড়া উচিত ছিল অনেক আগেই। পড়ল কিনা তাদের ঘরের দুয়ারে এসে! সারা নহরপুর ঘুরবার পর ভুবন গোঁসাইর মা'র কথা মনে পড়ে ছিল তার। যাদের কথা আগে ভাবা উচিত ছিল, তাদের কথাই সে ভেবেছে সবার পরে।

মাইনকার চরের ঝোপঝাড় থেকেও আট দশজন উঠে এসেছিল। কেঁদে কেঁদে গোঙানির মতো শব্দ করে তারা নিজেদের দুঃখের কথা বলছিল। খানেরা কিভাবে তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, মানুষ মেরে, লুটপাট করে এবং যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গেছে—তার একঘেয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না হাসেম। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলল, 'ফজল মিয়ারে চিন (চেনো) তুমরা?'

'কুন ফজল?'

'ফজল গাজী—'

'চিনুম না ক্যান? এক গেরামের মানুষ—'

'তাগো খবর কী?'

'তমস্ত গেরাম শ্যাষ, অরা (ওরা) কি আর বাইচা আছে?'

'নিষ্যস (নিশ্চয়) কইরা কইতে পার অরা বাইচা নাই?'

'আমরা জঙ্গলে পলাইছিলাম। তয় (তবে) খানেগো ফজল গাজীর ঘরে ঢুকতে যাইতে দেখছি। গ্যাছে যহন, পরাণে কি আর বাচাইয়া রাখছে! অরা কি মনিষ্য! অয় রে অয় রে—একেকটা রাইক্ষস-'

এই শেষ রাতে চকের ওপর দিয়ে যখন ঠান্ডা হাওয়া ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে যখন গায়ে কাঁটা দেবার কথা, সেই সময় ঘামে শরীর ভিজে গেল হাসেমের। শির-দাঁড়ার মধ্য দিয়ে আগুনের মতো কী ওঠা নামা করতে লাগল।

হঠাৎ ওধার থেকে ভুবন গোঁসাইর মা ডাকল, 'হাসমা শোন্—'

হাসেম তার কাছে গেলে নিচু গলায় বুড়ী বলল, 'কারো কথা শুনিস না, মাইয়াটারে একবার দেইখা আয়। যদি পলাইয়া পুলাইয়া কুনোখানে গিয়া বাইচা

থাকে।' ভুবন গোঁসাইর মা ফুলবানুকে চেনে। তার কাছে কতদিন ফুলবানুর কথা বলেছে হাসেম। ফুলবানুকে নিয়ে যৌবনের সেই শুরু থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে সে। সে সব স্বপ্নের কথা বুড়ির অজানা নেই। আজ দশ বছর ধরে প্রাণের কথা বলবার এই একটাই তো মানুষ তার।

হাসেম বলল, 'তয় যাই ঠাউরমা—'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'আবার জিগায় (জিজ্ঞাস করে)! যাবি, নিযাস যাবি। আমি যামু তর লগে (সঙ্গে) ?'

'না, আপনে এইখানেই থাকেন। বুড়া মানুষ, রাইত কইরা আপনের গিয়া কাম নাই।'

বুড়িকে নিল না বটে, নিকারিপাড়ার গহরদ্দি কিন্তু হাসেমকে একা যেতে দিল না। সে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

জেলা বোর্ডের সড়ক থেকে নেমে একটুখানি গেলেই মাইনকার চর গ্রাম। পোড়া বাড়ি আর অগুণতি মৃতদেহের মধ্য দিয়ে হাসেমরা ফজল গাজীদের বাড়ির সীমানায় এসে পড়ল।

তৃতীয় বার তালাক হবার পর ফুলবানু তার বাপজানের ঘরে ফিরে এসেছে শুনে এই ক'দিন আগেই শুধু না, এখন তার বয়স হল দুই কুড়ি, সেই বিশ বাইশ বছর থেকে এদিকে যাওয়া আসা হাসেমের। চেনা না থাকলে সে বুঝতেই পারত না এটা ফজল গাজীদের বাড়ি।

নহবপুর থেকে মাইনকার চর পর্যন্ত সব ঘরবাড়ি যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন ফজলুদের বাড়িটার গায়ে আঁচ লাগবে না, এমন কথা ভাবাই যায় না। আর সব বাড়ির মতো এটাও ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে।

দূর থেকেই হাসেম ডাকতে লাগল, 'গাজী, ছাব—গাজী ছাব—' ত্রাসে তার গলার স্বর এবং বুকের ভেতরটা একসঙ্গে কাঁপতে লাগল।

সাড়া দেবার মতো ওখানে কেউ আছে বলে মনে হল না।

বাড়ির সীমানা থেকে ওরা উঠে ভেতরের দিকে চলল। সেই কোন সকালে ভুবন গোঁসাইর মা তাকে একডালা মুড়ি খেতে দিয়েছিল। তারপর এই শেষ রাত পর্যন্ত পেটে আর কিছুই পড়েনি। মৃত্যুর রাজ্য থেকে জীবন্ত ক'টি মানুষকে কুড়িয়ে নিয়ে চলতে চলতে খিদের কথা একবারও তার মনে পড়েনি।

কিন্তু এই মুহূর্তে ফুলবানুদের বাড়ির ভেতর যেতে যেতে হাত-পা টলতে লাগল হাসেমের, শরীরটা হঠাৎ এত কাহিল হয়ে পড়ল যে হাসেমের মনে হতে লাগল আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। হায় রে হায়, ভেতরে গিয়ে কী দেখবে সে ? ফুলবানু—সারা যৌবন যার কথা ভেবে ভেবে সে পার করে দিল—সে কি আর বেঁচে আছে ? খানেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়নি তো ? দুর্বল শরীরে হাসেম ভাবতে চেষ্টা করল, বিকেলবেলা মুত্রাঝোপে দাঁড়িয়ে সে মিলিটারি

ট্রাকগুলোকে গিরিগঞ্জে ফিরে যেতে দেখেছিল। খানেরা চারপাশের গ্রামের অনেক-গুলো যুবতী মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে ফুলবানু ছিল কি? হাসেম যদ্দুর ভাবতে পারল, ফুলবানুকে তখন সে দেখেনি। এই ভাবনাটা তাকে খানিকটা ভরসা দিল।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল ফজল গাজীর দুই ছেলে মরে পড়ে আছে। ফজল কিংবা তার মেয়ে ফুলবানুকে দেখা যাচ্ছে না। উথাল-পাথাল ঢেউয়ের মতো অদ্ভুত এক ভয় হাসেমের বুক ভেঙে দিতে লাগল। গলা চিরে চিরে সে ডাকতে লাগল, 'গাজী ছাব—গাজী ছাব— ফুলবানু-উ-উ-উ—' তার কণ্ঠস্বর চারপাশের গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূর চকের দিকে চলে গেল।

ঘাড়ের পাশ থেকে গহরদ্দি বলল, 'হ্যারা (তারা) নাই, থাকলে এহানেই মইরা পইড়া থাকত।'

শিথিল, বসা গলায় হাসেম জিজ্ঞেস করল, 'তুমার কী মনে হয়?'

আধবুড়ো অভিজ্ঞ গহরদ্দি কিছু না ভেবেই বলল, 'পলাইছে।'

'কুন দিকে যাইতে পারে?'

'হে ক্যামনে কমু? খানেগো দেইখা যেই দিকে পারছে গ্যাছে গা। হুদাহুদি (শুধু শুধু) এহানে থাইকা আর কী হইব? ল—যাই গা, অরা আবার সড়কে আমাগো লেইগা খাড়াইয়া রইছে।'

চলে যাবার কথায় হাসেমের মন সায় দিল না। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, 'আহো (এসো), এট্টু বিচরাইয়া (খুঁজে) দেখি—'

'বিচরাণের কী আছে, হ্যারা (তারা) নাই।'

'তভু দেখি একবার।'

এই শেষ রাত্তিরে চাঁদটা অনেকখানি ঢলে পড়েছে। তবু জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা এখনও মরে নি। গহরদ্দিকে নিয়ে সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজতে লাগল হাসেম।

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। পাছ-দুয়ারের ওধারে যেখানে পিটকিরার জঙ্গল নিবিড় হয়ে আছে সেখানে আসতেই দেখা গেল, ফজল গাজী আর ফুলবানু পড়ে আছে। ফজলের দিকে আর তাকানো যায় না। বন্দুকের মাথায় চকচকে ধারালো ফলার মতো কী যেন একটা থাকে, হাসেম তার নাম জানে না। খানেরা তাই দিয়ে খুঁচিয়ে বুড়ো মানুষটাকে মেরেছে। হাত-পা-মুখ-বুক, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। চোখদুটো খুবলে বার করে আনা হয়েছে। গলার কাছে এবং বুকে ডেলা ডেলা ওপড়ানো মাংস ঝুলে আছে।

ফুলবানুর সারা গা রক্তে মাখামাখি। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা, গাল এবং কপালে বড় বড় গর্ত। মনে হয়, কেউ কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল হাসেমের, মাথার

ভেতরটা দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ পাগলের মতো সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মইরা গ্যাছে গহর ভাই– ফুলবানু মইরা গ্যাছে—'

গহরদ্দি কিন্তু অত সহজে বিচলিত হল না। হাড়-পাকা পোড়া-খাওয়া মানুষ সে, জীবনে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ফুলবানুকে দেখছিল। ফুলবানুকে সে চেনে, যৌবনের আরম্ভ থেকে এই মেয়েটার জন্য হাসেম য অস্থির হয়ে আছে সে খবরও তার জানা। বয়সের অনেক তফাৎ থাকলেও এই নয়ে হাসেমের সঙ্গে ঠাট্টা-ঠিসারা করেছে প্রচুর। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গহরদ্দি, ফুলবানুর গায়ে হাত দিয়ে কী দেখল। তারপর চমকে উঠে বলল, 'শরীলে অহনও (এখনও) ওম (তাপ) আছে রে, মাইয়াগা বাইচা রইছে মনে লয়—'

হুড়মুড় করে যেন হাড়গোড় ভেঙে গহরদ্দির গা ঘেঁষে বসে পড়ল হাসেম। নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'হাচা (সত্য) কও বাইচা আছে!'

গহরদ্দি ততক্ষণে তার হাতটা ফুলবানুর নাকের কাছে নিয়ে এসেছে। বলল, এট্টু এট্টু শ্বাসও পড়ে—'

'শ্বাস পড়ে!'

'হ —তয়--'

'তয় কী?'

'জেয়ান নাই।' বলতে বলতে গহরদ্দি ফুলবানুর একখানা হাত তুলে নাড়ি টিপে ধরল, 'নাড়খানও (নাড়িটা) তিরতিরাইয়া রয়। চ্যাষ্টা করলে অহনও মাইয়াগারে বাচান যায় -'

'বাচান যায়!'

'মনে তো লয়।'

আচমকা চিৎকার করে উঠল হাসেম, 'তাইলে অরে বাচামু, নিশ্চয় বাচামু--'

গহরদ্দি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কিন্তুক এহানে ফালাইয়া রাখলে তো হইব না।'

'অরে লইয়া যামু গহর ভাই, বাচাইতে অরে হইবই।'

'নিবি ক্যামনে?'

চারদিক ভাল করে দেখে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, ফুলবানুর জ্ঞানশূন্য শরীরটা পাঁজাকোলে তুলে উঠে দাঁড়াল হাসেম। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে কাঁটা দিল। এতকাল দূর থেকেই ফুলবানুকে দেখেছে সে, কখনও-সখনও এক-আধটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু এই প্রথম তাকে ছুঁল হাসেম।

গহরদ্দি বলল, তর কি মাথাখান খারাপ হইয়া গেল হাসমা?'

'ক্যান?'

'কুলে (কোলে) কইরা ভরা বয়সের মাইয়া মাইনষেরে কদ্দুর লইয়া যাইতে পারবি?'

'দেখি কদ্দুর পারি।'

ফজল গাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। সমস্ত দিনের না-খাওয়া দুর্বল শরীরে অলৌকিক শক্তি যেন ভর করেছে হাসেমের।

পাশাপাশি যেতে যেতে গহরদ্দি বলতে লাগল, 'বাশ দিয়া একখান চালি বানাইয়া লইলে ভাল হইত, হ্যার (তার) উপর শোয়াইয়া কান্ধে কইরা লইয়া যাইতাম—'

হাসেম বলল, 'হ—'

'বাশ না হয় ছোপ (ঝোপ) থনে পামু। কিন্তুক দাঁড় কই, দা-ও কই?'

'হে একখানা কথা। লও (চল), যাইতে যাইতে যদি পাইয়া যাই।'

একসময় ওরা জেলাবোর্ডের সড়কে এসে পড়ল। পাঁচ সাতটা গ্রামের অবশিষ্ট জীবন্ত মানুষের দলটা এদিকেই তাকিয়ে ছিল।

উদ্বেগের গলায় ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'বাইচা আছে মাইয়াগা—বাইচা আছে?'

গহরদ্দি বলল, 'আছে। তয় জেয়ান নাই।'

এবার খুব ভাল করে ফুলবানুকে লক্ষ্য করল ভুবন গোঁসাইর মা। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'অয় রে অয়, জল্লাদেরা কী সর্বনাশ কইরা গ্যাছে রে মাইয়াগার! অয় রে অয়—'

বুড়ির দেখাদেখি অন্য সবাইও কেঁদে উঠল। ফুলবানুকে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ আগে তাদের ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার এবং গ্রামগুলোর কী দশা হয়েছে, সেইসব টাটকা রক্তাক্ত ভয়াবহ স্মৃতি আবার নতুন করে মনে পড়ে গেছে হয়তো।

কান্নার মধ্যেই ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

চাঁদটা গাছগাছালির তলায় আরো অনেকটা নেমে গেছে। খানিক আগেও জ্যোৎস্না ছিল উজ্জ্বল, গলানো রুপোর মতো। এখন সেটা ক্রমশ নিস্তেজ এবং হলুদবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

গহরদ্দি, আনিস কিংবা বিনোদ এধার ওধার থেকে বলল, 'না পারলে কইস হাসমা, মাইয়াগারে আমরাও কান্দে কইরা এট্টু এট্টু লইয়া যামু। হগলে মিলা নিলে তর একার অত কষ্ট হইব না।'

হাসেম বলল, 'আইচ্ছা কমু—'

ওরা চলেছে, চলেছে, চলেছে। খানের বাচ্চাদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে এত বড় আসমানের তলায় কোথায় নিরাপদ আশ্রয় আছে, তারা জানে না। কোথায় যাচ্ছে তার নির্দিষ্ট ধারণা নেই। তবু যেতে হচ্ছে।

দুধারে চকের পর চক, বউন্যা আর হিজেলের বন, হলুদবর্ণ চাঁদের আলো কিংবা খালবিল, ঝোপজঙ্গল, ঝিঁঝিদের অশান্ত বিলাপ, থেকে থেকে হুতুমের গম্ভীর

আওয়াজ, ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির ওড়াওড়ি -কিছুই দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারছিল হাসেম। ফজলবানুর অসাড় জ্ঞানশূন্য শরীরটা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। আর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

হায় রে হায়, কী জীবন ছিল তার!

সেই কোন ছোটকালে বাপ-মাকে খেয়ে বসেছে হাসেম, সে কি আজকের কথা! তখন তার বয়েস দশও পেরোয় নি।

সব কথা মনে পড়ে না। তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলো স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। আবছা আবছা এটুকু মনে পড়ে, তার বাপজান ছিল হেলে চাষা। জমি জিরাত বাড়িঘর তার কিছুই ছিল না। সম্পত্তি বলতে ছিল শুধু একজোড়া হাল। চাষের সময় কিংবা ধানকাটার মরসুমে নহরপুরের ধানী গৃহস্থেরা তাকে কাজে নিত। যে কাজে নিত সে-ই থাকবার জন্য একখানা ঘর টর দিত ওদের। তারপর কাজ ফুরোলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হ'ত।

কাজ আর ক'দিনের? ধান বুনতে দু'মাস কাটতে দু'মাস। এই চারটে মাস বাদ দিলে বাকি আটটা মাস বড় কষ্টে কাটত তাদের।

এই দেশে কত লোক কত রকম কাজ করে পেটের ভাত জোগাড় করে। কেউ আমলা খাটে, কেউ লোকের বাড়ি গিয়ে পাট 'জ গ' দেয়, খালবিল থেকে নদী থেকে মাছ ধরে হাটে-গঞ্জে বেচে আসে কেউ। কিন্তু হাসেমের বাপ রহিমুদ্দি চাষের কাজ ছাড়া আর কিছুই পারত না।

ধানের খন্দ বাদ দিলে সংসারের সব দায় গিয়ে পড়ত মা'র ওপর। মা তখন এর বাড়ি ধান ভেনে ওর বাড়ি মুড়ি ভেজে দিয়ে কখনও বা চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে তিনটে মানুষের পেট চালাত। যেদিন মা কিছু জোটাতে পারত না, সেদিন একেবারে নির্জলা উপোস। উপোস দিয়ে দিয়ে হাড় কালি হয়ে গেছে হাসেমের।

তারপর একদিন বাপ মরল, তার কিছুদিন বাদে এক সপ্তাহের ধুম জ্বরে মা-ও মরল।

যেমনই হোক একটা বাপ ছিল মাথার ওপর, একটা মা ছিল। তারা মরে যেতে একবার অথৈ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল হাসেম।

বাপ-মা তার জন্য কিছুই রেখে যায় নি। না একখানা ঘর, না এক টুকরা জমি না টাকা পয়সা সোনাদানা। একটা কানা-কড়িও সে পায় নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে খানতিনেক ছেঁড়া তেলচিটে কাঁথা, একটা খেজুর পাতার চাটাই, দু'খানা থালা। আর পেয়েছে অভাব, কষ্ট আর উপোসের উত্তরাধিকার।

হায় রে হায়, মা-বাপ মরবার পর কী দিন শুরু হল তার। দু'মুঠো ভাতের জন্য তখন কুকুরের বাচ্চার মতো নহরপুরে যত বাড়ি আছে, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে হাসেম। তিরিশ বছর আগে দেশের হাল কি আজকের মতো ছিল! সস্তাগণ্ডার দিন তখন, সবার না হলেও জমিজিরাতওলা গৃহস্থদের ঘরে প্রচুর খাদ্য। চাল-ডাল

মাছের তো কথাই নেই, সারা বছর ঘি-দুধের বান ডেকে থাকত তাদের সংসারে। একটা ছোট ছেলে সে প্রাচুর্যের কতটুকুই বা কমাতে পারে! হাসেম গেলে তাই কেউ আর না বলত না।

তা ছাড়া তার বাপ রহিমুদ্দি ছিল বড় ভালমানুষ আর সরল। কথা বড় একটা বলত না। মারো আর ধরো, গালাগাল দাও আর যাই করো, সে শুধু হাসত। আর যে যা বলত মুখ বুজে হাসিমুখে তা-ই করে দিত রহিমুদ্দি। এমন একটা মানুষ যখন মরল তখন স্বাভাবিক কারণেই তার ছেলেটার ওপর সবার করুণা এসে পড়ল। হাসেমকে দেখলেই সারা নহবপুর গ্রামটা বলাবলি করত, 'আহা রে, কী দুঃখু ছ্যামরার!'

সবার করুণা এবং সহানুভূতি গায়ে জড়িয়ে ক'টা বছর কেটে গেল। কিন্তু হাসেমের মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন একরোখা মানুষ ছিল। সে যত বড় হচ্ছিল ভেতরের সেই মানুষটা তাকে অস্থির করে তুলছিল, 'এমুনভাবে পরের বাড়িত্ চাইয়া খাইয়া আর কদ্দিন কাটাবি? জুয়ান (জোয়ান) মরদ হইছস, তর কি সরমও লাগে না হাসমা! এইর থনে মইরা যা।'

হাসেম ঠিক করে ফেলেছিল, আর না, এমন কুকুরছানার মতো দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবে না। ভাবামাত্র মতিউর হোসেন সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে ওদের ঝাড় থেকে দুটে মুলি বাঁশ কেটে এনেছিল। তাই দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল 'পলো' আর 'চাই'। উত্তরের চক-এর গা ঘেঁষে যে খালটা, 'চাই'গুলো সেখানে পেতে রেখে এসেছিল, 'পলো' নিয়ে নেমেছিল বিলে। তাছাড়া নিকারিপাড়া থেকে একখানা আধ ছেঁড়া 'ধর্মজাল'ও চেয়ে এনে সারিয়ে সুরিয়ে নিয়েছিল। সেটা নিয়ে সে যেত গিরিগঞ্জের কাছে বড় নদীটায়। দারুণ পরিশ্রমে জল থেকে যে রুপালী ফসল তুলে আনত, তাই নিয়ে চলে যেত ইনামগঞ্জের হাটে।

তবে মাছ ধরাটাই তার একমাত্র রোজগারের পথ ছিল না। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য হাজারটা উঞ্ছবৃত্তি করতে হ'ত। কখনও দেখা যেত কামলা খাটছে, কখনও 'গয়নার নৌকা'য় গুন টানছে, কখনও বা ইনামগঞ্জের বড় বড় আড়তগুলোতে চালের বস্তা বইছে। তবে চাষ-আবাদের কাজ সে ছাড়ে নি, বাপ রহিমুদ্দির মতো জমিজিরাতওলা গৃহস্থদের বাড়ি দু'মাস ধান বুনে আর দু'মাস ধান কেটে মোট চারটে মাস কাটিয়ে দিত। তখন রহিমুদ্দির মতোই যে বাড়িতে সে কাজ নিত সেখানেই থাকত। বাকি আটটা মাস তার থাকার ঠিকানা ছিল না, খাওয়ারও ঠিক থাকত না। তখন সারাদিন খালে-বিলে কি চকে-টকে ঘুরে সন্ধে বেলায় চলে যেত নিকারি কি মৃধাদের পাড়ায়। চাল-ডাল, আনাজপাতি কিংবা খানিকটা করে মাছ নিয়ে যেত সঙ্গে করে। ওদের রান্নাটান্না হয়ে গেলে সেই আখায় নিজেরটা ফুটিয়ে নিত তারপর ওখানেই কারো ঘরের দাওয়ায় রাত কাটিয়ে দিত।

নিকারি কি মৃধারা বড় গরীব। কারো হোগলার ঘর, কারো বা ক্যাচা বাঁশের

ঘরই যাদের এমন তাদের দাওয়া কেমন হতে পারে! তার তিনদিকই খোলা। সারা বছর যেমন তেমন, বর্ষা আর শীতটা ভারি কষ্টে কাটত হাসেমের।

সমস্ত বছর শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য জলে-স্থলে নিদারুণ যুদ্ধ তার। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এবং পৌষ মাঘ মাসে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তার চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল। হাত-পা হেজে বারো মাস আঙুলের ফাঁকে ঘা হয়ে থাকত। হায় রে, কী জীবন ছিল তার!

এই পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্য সব সময় তাকে এত লড়াই করতে হ'ত যে অন্য কোনোদিকে তাকাবার সময় ছিল না। তবে তার গলাখানা ভারি মিঠা। বাঁ হাতে একটা কান চেপে ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে গাজীর গীত, রয়ানি গান, গুণাই বিবির গানে গানে যখন সে টান দিত শ্রোতাদের বুকের ভেতর রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ভাঙতে থাকত। তার গান শুনবার জন্য দূর দূর হাটে কি গঞ্জে ডাক পড়ত। সব জায়গায় সে যেতে পারত না, কোথাও কোথাও যেত।

মনে আছে সেই যেবার বড় নদী খেপে উঠে গিরিগঞ্জের বন্দর ডুবিয়ে দিয়েছিল, এত বড় বান এ অঞ্চলের কেউ বাপের জন্মে দেখে নি—সেবার গুণাইবিবির গান গাইতে হাসেম গিয়েছিল মাইনকার চরে। আর তখনই সে প্রথম দেখল ফুলবানুকে।

কিন্তু ফুলবানুর কথা পরে। তার আগে আরো ক'টা বছর আছে।

জন্ম ইস্তক হাসেমের জীবনে একটাই রং, তার নাম কষ্ট। বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়েছিল নহরপুরে, শুধু নহরপুর কেন, গিরিগঞ্জ মালিকান্দা মাইনকার চর থেকে আরম্ভ করে সেই সুদূর ইনামগঞ্জ পর্যন্ত দাঙ্গা লেগে গেছে। রক্তে এখানকার মাটি লাল হয়ে উঠেছিল। সে সব কী দিন গেছে! ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল হাসেম।

তার কিছুদিন পর দেশখানা দু'টুকরা হয়ে গেল। তাদের এই টুকরাটার নাম হল পাকিস্তান।

যেদিন পাকিস্তান হল সেদিন এলাহী কাণ্ড। সেদিনই বড় মসজিদের সামনের মাঠটায় প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছিল। ফুলপাতা আর চাঁদতারা-মার্কা পতাকা দিয়ে সেটা সাজানোও হয়েছিল।

পাকিস্তান যেদিন হল সেদিন সারা সকাল সেই সামিয়ানার তলায় ইংরাজি বাজনা বেজেছে। বিকেলে বসেছিল 'মীটিন'। চারপাশের গ্রামগুলো ওখানে ভেঙে পড়েছিল। ঢাকা শহরের বড় বড় মিয়াসাহেবরা এসেছিলেন, মহকুমা আর জেলা শহর থেকে এসেছিলেন এস-ডি-ও এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তারপর সে কি বক্তৃতার ধুম! সাত গ্রামের মানুষের সামনে সবাই এক কথা বলেছিলেন, "এতকাল আমাগো উপুর মেলা অবিচার হইছে। হেই কারণে দ্যাশ ভাগ কইরা লওয়া হইল। অহন থনে আমরা সুখে থাকতে পারুম, শান্তিতে থাকতে পারুম। আমাগো সগল দুঃখু ঘুচব।"

আরো অনেক কথা বলেছিলেন বড় শহরের বড় মানুষরা। তার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি হাসেম। আবছাভাবে এইটুকুই তার মাথায় ঢুকেছিল, এই পাকিস্তান দেশটা তাদের ভালর জন্য তৈরি হল। তারপর সন্ধে হলে আতসবাজি পোড়াবার সে কি ধুম! মাঝরাত পর্যন্ত নহরপুরের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে ছিল।

দেশভাগের পর আট দশ মাসও কাটল না, বাবুইপাড়া, কুমোরপাড়া, যুগীপাড়া, বামুনপাড়া থেকে অনেক লোক কোথায় চলে গেল। একেকটা দিন যায়, আর গ্রাম ফাঁকা হতে থাকে। শুধু তাদের গ্রামই না, চারপাশের গ্রামেও ভাঙন লাগল। হাটগঞ্জে গিয়ে হাসেম শুনেছে শুধু তাদের এই অঞ্চলেই না, অনেক দূরে কোথায় ফরিদপুর জিলা, কোথাও নোয়াখালি, কোথায় যশোর খুলনা, চাটগাঁ—সব জায়গা থেকেই নাকি অনেক মানুষ চলে যাচ্ছে। সে শুনেছে ওরা সব যাচ্ছে কলকাতায়, আসামে, আগরতলায়। এইসব দেশ কতদূরে, দুনিয়ার কোন প্রান্তে—কে জানে।

শহরের মানুষরা এসে ভরসা দিয়ে গিয়েছিল, এবার থেকে তাদের সব দুঃখ ঘুচে সুদিন আসবে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর ক'বছর কেটে গেল, তবু কিছুই হল না, অন্তত হাসেমের। তার দিন আগেও যেমন কাটছিল—পরের জমিতে হাল দিয়ে, পরের খেতের ধান কেটে, নিকারির কি মৃধাপাড়ার খোলা বারান্দাগুলোতে শুয়ে, শীতে অসহায় দারুণ কষ্ট পেয়ে—তেমনই কাটতে লাগল।

সেজন্য বড় একটা আপসোস নেই হাসেমের, অভিযোগও না। পৃথিবীর কাছে তার দাবি সামান্য। সারা জীবন কষ্ট করে করে এমন হয়েছে যে চাওয়ার মাপটা তার খুব ছোট হয়ে গেছে।

হাসেমের চোখের সামনেই নহরপুরের বামুনদের বারুইদের যুগীদের ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি জমিজিরাত কত লোকে দখল করে নিল। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল কিন্তু কোনো একটা ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে যে ঢুকবে তেমন ইচ্ছাটুকুও হল না।

দেশের কথা থাক। মনে পড়ে পাকিস্তান হবার ছ'সাত বছর পর গুণাহাবিবির গীত গাইতে গিয়েছিল মাইনকার চরে। সেখানে আসরভরা মানুষ। একধারে বসেছিল পুরুষ মানুষেরা, আরেক দিকে একটু আড়ালমতো জায়গায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছিল।

গান গাইতে গাইতে মেয়েদের ভিড়ে বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছিল। সেইখানে সে প্রথম দেখেছিল ফুলবানুকে।

সেদিন ফুলবানুর নাম জানত না হাসেম। সে কাদের মেয়ে, কোথায় থাকে—সবই ছিল অজানা। তবে মোটামুটি আন্দাজ করেছিল, এই মাইনকার চরেই তাদের বাড়ি।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারে নি হাসেম। পরস্তাবে (রূপকথায় হুরী-পরী আর সুন্দরী রাজকন্যার গল্প শুনেছে সে। এ যেন সে-ই। কিবা মু

তার, কিবা চোখ, কিবা গড়ন! মেয়েটার গায়ের রং পাকা ধানের মতো, পাতলা ফুরফুরে ঠোঁট, ছোট্ট কপাল, ঘন মেঘের মতো একমাথা চুল।

সেই বয়সে কত মেয়েই তো দেখেছে হাসেম। ভূঁইয়াদের মেয়ে, মীরেদের মেয়ে, গোঁসাইদের মেয়ে। কিন্তু মাইনকার চরের এই মেয়েটার মতো আর কেউ তার চোখে পড়ে নি। যতক্ষণ সে গান গেয়েছে, মেয়েটা মুগ্ধ চোখে পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কত আর বয়স তখন হাসেমের! সবে নতুন যৌবন, তার বুকে সিরসিরিয়ে ঢেউয়ের মতো কী যেন খেলে গেছে।

গান টান গেয়ে সেইদিনই মাইনকার চর থেকে ফিরে এসেছিল হাসেম। কিন্তু মেয়েটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

জীবনধারণ ছাড়া এতকাল আর কিছুই ভাবতে পারে নি হাসেম। কোনোরকমে শুধু টিকে থাকা—জন্মে থেকে এই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু মাইনকার চরের ওই মেয়েটা সব ওলট-পালট করে দিয়েছিল।

সেদিন গুণাইবিবির গান গেয়ে আসার পর তার জীবনের বাইরের দিকটায় তেমন কিছুই বদলায় নি। আগের মতোই সব চলছিল। কিন্তু পরের জমিতে নিড়ান দিতে দিতে, নিরালা বিলের জলে ধর্মজাল পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিংবা নিকারিদের খোলা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেত হাসেম। আর মাইনকার চরের ওই মেয়েটা স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে ভাসতে থাকত।

দিনকয়েক পর আর পারে নি হাসেম। নিজের অজান্তেই কি এক ঘোরের মধ্যে ঠাটা-পড়া রোদ মাথায় নিয়ে দুপুরবেলা সে মাইনকার চরে চলে গিয়েছিল।

ক'দিন আগে গুণাইবিবির গান গেয়ে গ্রামটাকে মাত করে গিয়েছিল হাসেম। তাকে দেখে সবাই চিনতে পেরেছিল। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে সে-ই জিজ্ঞেস করেছে, 'কি মিঞা, এই দুফারবেলায় আমাগো গেরামে?'

হাসেম বলেছিল, 'এট্টা কামে আইছিলাম।'

'কী কাম?'

এবার অস্পষ্টভাবে এমন জবাব দিয়েছে হাসেম যে কিছুই বোঝা যায় নি।

'খাওন-দাওন হইছে?'

'হ।'

'হউক। নহরপুর থনে (থেকে) খাইয়া আইছ, হেই ভাত কি আর প্যাটে আছে! এই দুফারবেলায় তুমারে দুগা না খাওয়াইয়া ছাড়ুম না।' খুব আদর করে মাইনকার চরের লোকেরা তাকে ডেকেছে, 'আহো (এসো)—'

হাসেম বলেছে, 'আইজ না, আরেকদিন আইসা খাইয়া যামু—'

'আইবা তো?'

'নিব্যস আমুম।'

মাইনকার চর একটুখানি জায়গা না। সমস্ত দুপুর আর বিকেল সারা গ্রাম সে

চষে বেড়িয়েছে কিন্তু গানের আসরের সেই মেয়েটির দেখা পায় নি।

হায় হায় রে, কী বোকা হাসেম! তার জন্য যুবতী মেয়ে কি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে! তা ছাড়া মেয়েটার নামও জানা নেই। আর জানলেই বা কী। এ কথা কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়, 'আমি অমুক মাইয়ার লাইগা আইছি গো, তুমরা আমারে তার বাড়ি দেখাইয়া দাও।' কারো বাড়ির ভেতর ঢুকেও খুঁজে খুঁজে দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পুকুরঘাট, খালের পাড় কিংবা যে বাড়ির যতটুকু দেখা যায়, হাসেম লক্ষ্য করেছে। কিন্তু পরস্তাবের সেই সুন্দরী রাজকন্যা নেই, কোথাও নেই। একেক বার তার সন্দেহ হয়েছে, সত্যিই সেদিন ওরকম একটা মেয়ে দেখেছিল কিনা। এমনও হতে পারে, মেয়েটা ভিন গেরামের, এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। তা হলে এ জন্মে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না? ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তার চাইতেও বেশি হতাশ, হাসেম সন্ধের আগে আগে নহরপুরে ফিরে যাবার জন্য যখন জেলাবোর্ডের সড়কে এসে উঠেছে সেই সময় আরে —আরে—কি আশ্চর্য, উত্তর দিক থেকে সেই মেয়েটা, সেই মেয়েটাই তো আসছে। তার সঙ্গে কাঁচা পাকা দাড়িওলা মধ্যবয়সী একটি লোক এবং দু'তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

মাঝবয়সী লোকটা আধ-চেনা গোছের। ইনামগঞ্জের হাটে অনেকবার দেখেছে তাকে, তবে আলাপ-সালাপ হয় নি। হাসেম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার মুখের ওপর তার চোখের তারা স্থির।

একটু পর ওরাও কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মাঝবয়সী লোকটা এক পলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'হাসেম মিয়া না?'

হাসেম খুব বিনীতভাবে বলেছিল, 'হে মেয়াছাব, সালাম—' মাথা ঝুঁকিয়ে সে আদাব জানিয়েছিল।

'সালাম—' বলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল প্রৌঢ়, 'ওঃ, হেইদিন গুণাইবিবির আসরে কিবা গীত গাইলা! চৌখের পানি আর ধইরা রাখতে পারি না।'

'ভাল লাগছে তাইলে আমার গীত?' প্রৌঢ়র সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই হাসেম কিন্তু তার চোখ অস্থিরভাবে বার বার সেই মেয়েটার দিকে চলে যাচ্ছিল।

মাঝবয়সী গলা তুলে প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'লাগছে! আমার বিবি, পোলামাইয়া—হগলের ভাল লাগছে।' বলেই সেই মেয়েটির দিকে ফিরেছিল, 'না ফুলবানু?'

সেই প্রথম হাসেম জানতে পেরেছিল, মেয়েটার নাম ফুলবানু।

ফুলবানু চোখ নামিয়ে আস্তে করে মাথা নেড়েছিল। আর হঠাৎ শীত লাগার মতো হাসেমের গায়ে যেন কাঁটা দিয়েছিল। কত লোকেই তো তার গান শুনে কত তারিফ করেছে কিন্তু ফুলবানুর ওই আস্তে আস্তে মাথা নাড়ার তুলনা নেই। হাসেমের মনে হয়েছিল, গানের জন্য জীবনের সব চাইতে সেরা পুরস্কারটা সে সেদিনই পেয়েছিল।

প্রৌঢ় আবার বলেছিল, 'খোদাতাল্লা তুমারে গলা দিছিল একখান মিয়া! হে যাউক, তুমি না নহরপুরে থাকো?'

'হ।'

'এহানে (এখানে) কই আইছিলা?'

হাসেম চমকে উঠেছিল, জড়ানো গলায় ভাসা ভাসা জবার দিয়েছিল, 'এই কাছাকাছি—'

'কাম আছিল?'

যে কাজে এসেছিল তা তো আর বলা যায় না। হাসেম বলেছিল, 'তেমুন কিছু না।' পাছে এ ব্যাপারে প্রৌঢ় আর কিছু জিজ্ঞেস করে, সেই ভয়ে হাসেম তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'মনে লয়, আপনেরা কই যিনি (যেন) যাইতে আছেন—'

'যাই না, ফিরতে আছি।' দক্ষিণ দিকে ধু-ধু চকের ওপারে আঙুল বাড়িয়ে প্রৌঢ় বলেছিল, 'উই উইদিকে হুলন্দপুর গেরাম, চিন (চেন) তো?'

'চিনুম না ক্যান?'

'হেইখানে আমার হউর বাড়ি (শ্বশুর বাড়ি)। দাওয়াত আছিল, বুঝল মিঞা। সকালে উইঠা গেছিলাম পোলাপাইন লইয়া।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'জবর খাওয়াইছে হউরে (শ্বশুরে)। চাইর কিসিমের মাছ, গোস্ত, আম, দুধ, অমৃতসাগর কলা, পাতক্ষীর। খাওনের কি চোট রে! খাইয়া প্যাটের ভারে আর উঠতে পারি না।'

টের পাওয়া গিয়েছিল, লোকটা খেতে টেতে ভালবাসে। হাসেম কিছু বলেনি, অল্প একটু হেসেছিল।

মধ্যবয়সী একটু ভেবে আবার বলেছিল, 'খাওনের কথা থাউক। অহন তুমি চললা কই মিঞা? নহরপুরে নি?'

'হ।'

'সময়-সুযুগ পাইলে আমাগো বাড়িত আইসো। এই যে মাইনকার চর গেরাম এহানে ঢুইকা আমার নাম কইলেই মাইনষে বাড়ি দেখাইয়া দিব।'

'আইচ্ছা। কিন্তুক—'

'কী?'

'আপনের নামখান যদি জানতাম—'

'আমার নামই জানো না? মাইনষে আমারে ফজল গাজী কয়—'

সেই শুরু। তারপর থেকে মাসে দু' তিনবার করে মাইনকার চরে যেতে লাগল হাসেম।

ফজল গাজীদের অবস্থা মোটামুটি। চকে কানি দশকের মতো ভাল তেফসলা টুনকি জমি আছে তার। তাতে পাট হয়, ধান হয়, আবার রবিশস্যও ফলে।

ধলেশ্বরীর নামাল চরে অল্প কিছু নীরেস জমিও আছে, সেখানে হয় গাবের দানার দানার মতো মোটা মোটা বোরো ধান।

জমি জমা ছাড়া আছে ছোট একখানা বাড়ি। তাতে খানদুই তেইশের বন্দের টিনের ঘর, কিছু বাগবাগিচা, একখানা পুকুর।

জমির ফসল ছাড়া আর কোনো আয় নেই ফজল গাজীর। জমিই তার বল-ভরসা, জমির সঙ্গেই তার বাঁচা-মরা জড়ানো।

মানুষটা বেশ ভালই। হাসেম গেলে আদর করে তাকে বসাতো, মুড়ি-চিঁড়ে-ফলফলারি—ঘরে যখন যা থাকত খাওয়াতো, পান-তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করত। আর করত নানা রকম গল্প। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সব খবর জেনে নিয়েছিল ফজল গাজী। বাপ-মা নেই শুনে বলেছিল, 'আহ্ হা রে!' ঘরবাড়ি জমি জিরাত নেই শুনে বলেছিল, 'আহ্ হা রে!' লোকের বাড়ির বারান্দায় রাত কাটায় শুনে বলেছিল, 'আহ্ হা রে!'

গল্পই শুধু হত না, মাঝে মধ্যে গানের আসরও বসত। তখন ফজল গাজীর বিবিজান আর ছেলেমেয়েরা ভেতর বাড়ি থেকে চলে আসত। তবে হাসেম যাকে চাইত, যার জন্য রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাক্কা সাত-আট মাইল পাড়ি দিত, সে কিন্তু কাছে ঘেঁষত না। অন্য সময় তাকে বড় একটা দেখা যেত না। কিন্তু যেই এক হাতে বাঁ কানটা চেপে আরেকটা হাত সামনে বাড়িয়ে সে গান ধরত, জানালার ফাঁকে কিংবা দরজার পাশে ঘন-পাপড়ি-ঘেরা এক জোড়া বড় কালো চোখ চকিতের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেত।

যাওয়া-আসা করতে করতে ফজল গাজীর বিবিজানের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মেলার আহ্লাদী পুতুলের মতো ছোটখাটো গোলগাল চেহারা। কথায় কথায় বিবিজানের হাসি। এমন হাসিখুশি মানুষ আগে আর কখনও দ্যাখে নি হাসেম।

তাকে দেখলে গাজী সাহেবের অন্য ছেলেমেয়েরা ছুটে আসত। যতক্ষণ সে ও-বাড়িতে থাকত, তার কাছ ওরা ছাড়ত না, গায়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত। কিন্তু যার জন্য দিনের পর দিন এত ছোটাছুটি এত পরিশ্রম, সেই ফুলবানু কেন যে কাছে ঘেঁষত না!

মাইনকার চরে কোথায় কার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত যাতায়াত করছে, এই খবরটা কেমন করে যেন নহবপুরের মৃধাপাড়ায় নিকারীপাড়ায় রটে গিয়েছিল।

নিকারীপাড়ায় বৌ-ঝিরা চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই নিয়ে আড়ে-ঠারে ঠাট্টা-ঠিসারা করত। একদিন সন্ধ্যেবেলা চাল-ডাল নিয়ে যখন সে নিকারীপাড়ায় গেছে গহরান্দর জরু হারুণা বিবি বলেছিল, 'মাইয়াগা ক্যাঠা (কে)?'

আশেপাশে নিকারীপাড়ার আরো অনেক মেয়ে-বউ ছিল। চোখের তারা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওরাও গলায় রং তামাসা লাগিয়ে বলেছিল, 'ক্যাঠা গো, ক্যাঠা ?'

বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠেছিল হাসেমের। এমনিতে তার স্বভাবটা লাজুক ধরনের। চোখেমুখে সে কথা বলতে পারে না। দুটোর বেশি এক সঙ্গে চারটে বলতে গেলে তার কথা যায় জড়িয়ে।

এতগুলো মেয়েমানুষ তার কী হাল করে ছাড়বে, ভাবতেই দম আটকে এসেছিল। ভয়ের গলায় সে বলেছিল, 'কার কথা কও ?'

'কার কথা ! আহ্‌হা রে, কিছুই য্যান জানে না। ডুইবা ডুইবা জল খাও, ভাবো আমরা ট্যার পাই না ! পাই গো মিঞা, পাই। অহন কও কে বা তুমারে 'গুণ' করল।'

হাসেম চুপ।

ওসমানের বউ তাহেরা বিবি বলেছিল, 'হ্যায় (সে) কি বড় সোন্দরী !'

হাসেমের উত্তর নেই।

জালালের চাচাতো বোন নাছিরণের রূপের বড় দেমাক। চামড়াখানা ধলা বলে মাটিতে তার পা পড়তে চায় না। সে বলেছিল, 'কেমুন সোন্দর ? আমার থনেও (চাইতেও) ?'

হাসেমের মুখে এসে গিয়েছিল, 'হারামজাদী মাইয়া তুই তার কাছে একখান আন্ডা বান্দর (বাঁদর)।' কিন্তু মুখ ফুটে তা তো আর বলা যায় না।

যে মানুষ মুখ খোলে না, তার পেছনে আর কতক্ষণ লাগা যায়। নিকারী-পাড়ার বৌ-ঝিরা একসময় ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল। সেদিনকার মতো গেলেও ঠাট্টা-ঠিসারা তারা ছাড়েনি। সন্ধ্যেবেলা নিকারীপাড়া কি মুধা পাড়ায় গেলেই মেয়েমানুষগুলো তাকে ছেঁকে ধরত। খানিকটা সময় তাকে নিয়ে আমোদ করা আর কি।

নহবপুর থেকে মাইনকার চর, মানকার চর থেকে নহবপুর—এই করে ক'বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ফজল গাজী আর তার বিবিজান কথায় কথায় জানিয়েছিল তারা ফুলবানুর বিয়ে দেবে, ধলেশ্বরীর ওপারে রহমতপুরের খানেদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। খানেরা নাম করা ঘর অবস্থাও ভাল। দু-তিন শ' কানি দোফসলা জমি ওদের। হাল-হালুটি বিশ জোড়া। একমাল্লাই দোমাল্লাই চারমাল্লাই আর কোষ মিলিয়ে ষোলখানা নৌকা, ধানের ডোলই আছে তিরিশটা, বাড়িতে নতুন ঢেউটিনের ঘর যে কত লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মানুষও ওরা খুব সৌখিন। ফজল গাজী নিজের চোখে দেখে এসেছে খানেদের ঘরে কলের গান আছে, ব্যাটারিওলা রেডিও আছে, সাইকেল আছে। সব চাইতে বড় কথা, যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে সে চকে গিয়ে হাল দেয় না। চার বছর ইংরাজি স্কুলে যাওয়া-আসা করেছে, পেটে অনেকখানি বিদ্যা আছে। দেখতে শুনতেও চমৎকার। এই লম্বা, ভরা-ভর্তি শরীর, পুরুষ মানুষ বলতে যা বোঝায়,

তাই। রংটা একটু চাপা, তা হোক। পুরুষ মানুষের রং ধুয়ে কি লোকে জল খাবে? মোট কথা খানেদের বাড়ির ছেলেকে খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ফজল গাজীর।

শুনতে শুনতে চোখের আলো নিভে গিয়েছিল হাসেমের। ভাঙা বসা গলায় সে বলেছিল, 'সাদি কি ঠিক হইয়া গ্যাছে?'

'না, কথাবাত্‌রা চলতে আছে।'

'পোণ কত ট্যাকা দিব?'

'পচিশ কুড়ি চাইছি।'

'পচিশ কুড়ি —' শব্দ দুটো পুরোপুরি উচ্চারণ করবার আগেই শ্বাস আটকে গিয়েছিল হাসেমের।

সেদিন আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে নি সে। ফজল গাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন হাসেম জেলাবোর্ডের উঁচু সড়কটায় গিয়ে উঠেছিল তখন বিকেল। খালে-বিলে মাঠে-ঘাটে এবং গাছপালার গায়ে প্রচুর আলো মাখানো ছিল, তবু কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধের মত পথ হাতড়ে হাতড়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসেম শুধু ভাবছিল পাঁচশ কুড়ি টাকা কত টাকা!

নহরপুরে ফিরে সোজা সে চলে গিয়েছিল নিকারীপাড়ার গহরদ্দির কাছে সারা রাস্তা যে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে এসেছে তাকে তা-ই জিজ্ঞেস করেছিল।

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে গহরদ্দি বলেছিল, 'ক্যান রে, ক্যান?'

'কাম আছে, কও না—'

বিড় বিড় করে হিসেব কষতে কষতে রাতি প্রায় কাবার করে এনেছিল গহরদ্দি সঙ্গে সঙ্গে ঘেমে নেয়ে অস্থির। বলেছিল, 'হে মেল্য (অনেক) ট্যাকা।'

অসীম ধৈর্য নিয়ে সারাক্ষণ গহরদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল হাসেম। তার হিসেব কষা শেষ হলে বলেছিল, 'মেলা (অনেক) ট্যাকা তো বুঝলাম। কয় শ -'

'চাইর পাঁচশ হইব।'

চার পাঁচশ। একটা একটা করে অতগুলো টাকা এক জায়গায় 'ভুর' (স্তূপ) করলে রকম দেখাবে ভাবতে চেষ্টা করেছিল হাসেম। কিন্তু থই পায়নি।

বাপের জন্মে একসঙ্গে পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি দেখে নি হাসেম। তার কল্পনাশক্তি এত দুর্বল যে চার পাঁচ শ পর্যন্ত পেঁছিয় না। তবু মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছিল, টাকা জমাতে থাকবে। কিসের আশায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তবে অদ্ভুত এক গোঁ চেপেছিল ঘাড়ে. টাকা তাকে জমাতেই হবে।

খেয়ে না-খেয়ে জমানো চলছিল। কোমরের একটা গেঁজেতে টাকা-পয়সা ভরে বেঁধে রাখত হাসেম। কত জমালো, ধান কাটতে কাটতে কিংবা কামলা খাটতে

খাটতে দিনের মধ্যে দশ বার করে গেঁজে থেকে বার করে গুণে দেখত। তা ছাড়া মাইনকার চরে যাওয়া-আসা তো ছিলই।

ওদিকে খানেদের বাড়িতে কিন্তু এক কথায় ফুলবানুর সাদি হয়নি। সেখানে ফজল গাজী সপ্তাহে দু'বার করে গিয়ে কথা চালাতেই লাগল, চালাতেই লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর সাদির তারিখ ঠিক হয় না। ফজল গাজী যা চায় খানেরা পুরোপুরি তা মানে না, আবার খানেরা যা চায় ফজল গাজী তা মানে না। এই করে করে ফুলবানুর সাদিটা শুধু পিছিয়েই চলল। ফুলবানুর সাদি যত পিছোয় হাসেমের চোখ মুখ কি এক ভীরু আশায় চকচক করতে থাকে।

দেখতে দেখতে একটা বছর ঘুরে গিয়েছিল। ততদিনে পঞ্চাশ ষাটটা টাকা জমিয়ে ফেলেছে হাসেম। চার পাঁচ শ' টাকার আর কত বাকি? হাসেমের ভীরু আশা সর্বক্ষণ ফিসফিসিয়ে তাকে ভরসা দিত, 'যেভাবে ফুলবানুর সাদি পিছোচ্ছে এমন চলতে থাকলে চার পাঁচ শ' টাকা নিশ্চয়ই জমিয়ে ফেলতে পারবে।

কিন্তু বছর ঘুরে একটা মাস যেতে না যেতেই হঠাৎ খানেদের বাড়িতে ফুলবানুর সাদির কথা পাকা হয়ে গেল। তারপর তিনটে দিনও কাটেনি, গিরিগঞ্জ বন্দর থেকে প্রকাণ্ড আট মাল্লাই নৌকোয় উঠে ধলেশ্বরীর ওপারে খানেদের বাড়ি চলে গিয়েছিল ফুলবানু।

ফুলবানুর সাদিতে হাসেমকে দাওয়াত করেছিল ফজল গাজী. সে গিয়েও ছিল। সারাদিন থেকে না খেয়েই সন্ধ্যেবেলা নহরপুরে ফিরে এসেছিল। তারপর মৃধাপাড়ার ফেলু মৃধার ঘরের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল।

সেই একটা দিনই না, রাতের পর রাত সে জেগে থেকেছে আর কেঁদেছে।

কাজকর্ম কিছুই তখন তার ভাল লাগত না। ক'দিন পলো নিয়ে জলে নামল না সে, জনমে কাজ করতে গেল না। হাড়গোড় ভাঙা জখমী মানুষের মতো কখনও নিকারীপাড়ায়, কখনও বা নদীর পাড়ে গিয়ে চুপচাপ শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।

সবাই জিজ্ঞেস করত, 'কী হইছে রে তর কী হইছে?'

হাসেম উত্তর দিত না।

কিন্তু পেট বলে কথা। হাত-পা ভেঙে এভাবে বসে থাকলে কে তাকে খাওয়াবে? ক'দিন পর আবার হাসেমকে মাঠে যেতে হয়েছিল, খালে বিলে নামতে হয়েছিল। জলে-স্থলে তার সেই আজন্মের জীবনযুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল।

ধান কাটতে কাটতে কিংবা ধর্মজাল নাইতে বাইতে এক এক দিন হাসেমের ইচ্ছা হত, ধলেশ্বরী পেরিয়ে খানেদের বাড়ি গিয়ে একবার ফুলবানুকে দেখে আসে। পরক্ষণেই একটা কথা তার মনে পড়ে যেত। ফজল গাজী বলেছিল, খানেদের

বাড়িতে বড় আব্রু। দশ-বারো কানি জমির মালিক ফজল গাজীর বাড়ির সঙ্গে দু-তিন শ' কানি জমির মালিক খানেদের বাড়ির অনেক তফাত। যত সহজে ফজল গাজীর অন্দর মহলে যাওয়া যায়, তত সহজে কি খানেদের বাড়ি ঢোকা যাবে? তা ছাড়া খানেরা তাকে চেনে না। সেখানে গিয়ে বলবেই বা কী? 'তোমাগো অমুক পোলার বিবি মাইনকার চরের ফুলবানুর দেখতে আইলাম। তার লগে (সঙ্গে) দুইখান কথা কমু—'বললে ফলাফলটা কী দাঁড়াবে? হয়তো ট্যাটা বার করে খানেরা তাকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে ফেলবে।

ফুলবানুর সাদির পর ক'টা মাস কেটে গেল। দুঃখটা অনেকখানি সয়ে এলেও পাঁজরের তলায় ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকল।

এই সময় অসুখে পড়ল হাসেম। পুরো একটা মাস গহরদ্দিদের খোলা বারান্দায় পড়ে পড়ে পালা জ্বরে ভুগল সে, তারপর যখন উঠে বসল একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। ভুগে ভুগে শরীর এত কাহিল হয়ে গিয়েছিল যে, জ্বর ছাড়বার পর আরো পনেরটা দিন সে মাঠে কিংবা জলে নামতে পারল না। পাক্কা দেড়টি মাস কাজ নেই। ওষুধ পত্তর আর বসে খেয়ে জমানো টাকা ক'টা ফতুর হয়ে গেল।

দেড় মাস পর যেদিন আবার সে উত্তরের চকে গিয়ে নামল সেদিন বিকেলে নিড়ান দিতে দিতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল সামনের জেলা-বোর্ডের সড়ক (তখন রাস্তাটা কাঁচা ছিল) ধরে ফজল গাজী আর ফুলবানু এগিয়ে আসছে। গিরিগঞ্জ বন্দরের দিক থেকে ওরা আসছিল। খুব সম্ভব মাইনকার চরে যাবে।

অত দূর থেকে দুজনকে শুধু চেনা যাচ্ছিল, আলাদা আলাদাভাবে তাদের চোখমুখ—কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

কতকাল পর ফুলবানুকে দেখেছিল হাসেম! তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আচমকা জমাট বেঁধে গিয়েছিল, তারপরেই দুরন্ত বেগে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল।

মাঠের মাঝখানে আর বসে থাকতে পারে নি সে। লাফ দিয়ে উঠে বড় সড়কের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল।

ফজল গাজীরা তাকে দেখে অবাক। এভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়তো ভাবে নি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে ফজল গাজী বলেছিল, 'তুমি কই থন (কোথা থেকে) মিঞা?'

হাসেম বলেছিল, 'উই চকে আছিলাম। কাম করতে করতে মুখ তুলতেই দেহি আপনেরা যাইতে আছেন। দৌড়াইয়া আইসা পড়লাম।'

'কত দিন পর তুমার লগে দেখা! ফুলবানুর সাদির দিন হেই যে না খাইয়া চইলা আইলা, হের (তার) পর আর যাও নাই। আমরা ভাবলাম, গুসা হইছে বুঝিন। বিবিজানে কয় মিঞা আমাগো ভুইলাই গ্যাছে।'

অস্পষ্টভাবে কিছু একটা উত্তর দিয়ে হাসেম বলেছিল, 'আপনেরা কই থন (কোথা থেকে) আইলেন? গিরিগঞ্জে গেছিলেন নিহি?'

ফজল গাজী বলেছিল, 'ধলেশ্বরীর উই পারে ফুলবানুর হউরবাড়ি গেছিলাম, হেইখান থন মাইয়ারে জন্মের লাহান (মতো) লইয়া আইলাম।'

হাসেম চমকে উঠেছিল, জন্মের লাহান কইতে?'

'ফুলবানুর তালাক হইয়া গেল আইজ—'বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ফজল গাজী, 'তুমি তো মাইনকার চরে যাও নাই, গেলে আগেই জানতে পারতা, ওই খানেরা কত বড় শয়তান! যে ছ্যামরার লগে মাইয়ার সাদি দিছিলাম, হেই হুমুন্দির পুতে এট্টা আস্তা কসাই। দিন-রাইত মাইয়ারে মারত, খাইতে দিত না।'

ফজল গাজী সমানে বকে যাচ্ছিল। তার শেষ দিকের কথাগুলো আবছাভাবে শুনতে শুনতে হাসেম ফুলবানুর দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণ ভালভাবে তাকে লক্ষ্য করে নি, এবার করেছিল। পাকা ধানের মতো তার সেই উজ্জ্বল রং এখন কালিবর্ণ, মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন সারা গায়ে তার রক্ত নেই। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। এখন কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, গাল দুটো ভাঙা; চোখ দুটো মরা মাছের চোখের মতো। হায় রে হায়, সোনারবর্ণ মেয়েটার কি চেহারা হয়ে গেল!

একটু পর ফজল গাজীর গলা আবার শুনতে পেয়েছিল হাসেম, 'হেই ভোরে বাইর হইছিলাম, বিকাল পার হইতে চলল। মাইনকার চরে পৌছাইতে পৌছাইতে রাইত দুফার হইয়া যাইব। আহন যাই। তয় একখানা কথা মনে রাইখো মিঞা --'

অন্যমনস্কের মতো হাসেম বলেছিল, 'কী?'

'উই কুত্তার ছাওগো থন (কুকুরের বাচ্চাদের থেকে) অনেক ভাল ঘরে ফুলবানুর আবার সাদি দিমু—'বলেই হাঁটতে শুরু করেছিল।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা গিয়েছিল হাসেম। তারপর বড় সড়কটা যেখানে বাঁক ঘুরে তাজহাটির দিকে গেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ফজল গাজীরা দাঁড়ায় নি। যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'আমাগো বাড়িত্ যাইও মিঞা—'

'যামু ' মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল হাসেম।

তারপর আবার মাইনকার চরে যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল হাসেমের। মনের ভেতর থেকে সেই ভীরু আশাটা মুখ তুলে তাকে উস্কে দিয়েছিল, 'ট্যাকা জমা হাসমা ট্যাকা জমা—' আবার কোমরের গেঁজেতে খেয়ে না-খেয়ে টাকা জমাতে শুরু করেছিল হাসেম।

ফুলবানু তালাক নিয়ে আসার পর দু তিন বছর কেটে গেল। হাসেমের গেঁজে

যখন চার কুড়ির মতো টাকা জমে উঠেছে সেই সময় রসুলপুরের ধানী মহাজন রহমৎ চৌধুরীর ভাতিজা আতিকুলের সঙ্গে আবার ফুলবানুর নিকা হয়ে গিয়েছিল। রহমৎ চৌধুরীদের জমিজিরাত, টাকাপয়সা, হাল-হালুটি, নৌকো-টৌকো খানেদের তুলনায় অনেক—অনেক বেশি।

মেয়েকে যে আগের বারের চাইতে অনেক বড় ঘরে দিতে পেরেছে এতেই ফজল গাজী ডগমগ। লোক ডেকে ডেকে সে বলে বেরিয়েছিল, 'খানেগো গালে একখানা জুতা মারলাম। যে ঘরে এইবার মাইয়া দিছি খানেরা তাগো বাড়িত্ বান্দা থাকনেরও যুগ্যি না। ফুলবানু আমার সুখে থাকব।'

ফুলবানুর দ্বিতীয় সাদির পর আবার মাইনকার চরে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল হাসেম। বুকের ভেতর যে দুর্বল বাসনাটা পিদীমের আলোর মতো কতকাল ধরে কাঁপছে, সেটা যেন দপ্ করে নিভে গিয়েছিল। এবারও চোখের জলে ক' রাত বুক ভাসিয়ে বিনা ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছে হাসেম।

ফুলবানুর নতুন সাদির কিছুদিন পর নাগল বর্ষা। পূর্ব বাংলার এদিকটায় সব বছরই বর্ষাকালটা বড় সমারোহ করে নামে। তখন চক ভাসে, মাঠ ভাসে, খাল-বিল-দীঘি-নদী সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু সেবারের বর্ষাটা ছিল নিদারুণ। মাঠঘাট তো সেবার ভাসলই, লোকের বাড়িঘরও ডুবে গেল। নেহাত যাদের বাড়ি-গুলো উঁচু ভিতের ওপর তেমন দু চারটে দ্বীপের মতো মাথা তুলে থাকল।

এমন ভন্নার দিনে কোথায় কাজকর্ম? কাজ নেই, তাই রোজগারও ছিল না হাসেমের।

হাসেমদের মতো যারা, সব বছরই বর্ষার সময়টা তাদের বড় কষ্টে কাটে। সাময়িক একটা দুর্ভিক্ষ লেগে যায় তখন। সেবার সেই দুর্দান্ত বর্ষার বছর যে দুর্ভিক্ষটা লেগেছিল তার জের চলেছিল একটানা দু'টি মাস। তখন হাতের পয়সা ভেঙে ভেঙে খাওয়া ছাড়া উপায় কী? যে চার কুড়ি টাকা হাসেম জমিয়েছিল, ভয়ানক দুর্দিনে তা খরচ হয়ে গেল।

বর্ষা নামলেই পাকিস্তান যেদিন হল সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যেত হাসেমের। চমৎকার করে সাজানো প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলায় বড় বড় মিঞাসাহেবরা গলা ফাটিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তান হয়েছে, এবার থেকে আর দুঃখ ঘুচবে। এমন একখানা সুদিনের ছবি তারা চোখের সামনে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যাতে হাসেমের মনে হয়েছিল ঘিয়ে মাখানো দুধে চান করার দিন খুব বেশি দূরে নয়। আসমানের চাঁদ এবার থেকে হাত বাড়ালেই পেড়ে আনা যাবে।

পাকিস্তান হয়ে গেছে সেই কবে! কিন্তু হাসেম যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। পরের জমিতে হাল দেওয়া আর ধান কাটা, পলো কি বর্শজাল নিয়ে খালে বিলে নামা কোনোদিনই তার ঘুচল না। হাত-পায়ের ঘা কোনোদিনই সারল না। খই-ওঠা চামড়া ফাটতেই থাকল, ফাটতেই থাকল।

সেবার বর্ষার পর ভাদ্র আশ্বিন গেল, তারপর হেমন্তে ধান কাটার খন্দ পেরিয়ে সেই পৌষ মাস পড়ল অমনি হাওয়ায় হাওয়ায় খবর এল মাইনকার চরের ফজল গাজীর মেয়ে ফুলবানুর আবার তালাক হয়ে গেছে। আগের বারের মতো এবারও তার বিয়েটা সুখের হয়নি।

খবরটা কানে আসামাত্র মাইনকার চরে ছুটে গিয়েছিল হাসেম। যা শুনেছে তা সত্যি। ফুলবানুর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সেই সে-বছর প্রথম বার তালাক হবার পর হাসেম যেমন দেখেছিল. তার চেয়ে অনেক খারাপ। মুখ আরো কালিবর্ণ, কণ্ঠার হাড় আরো ঠেলে বেরিয়েছে। কি রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা!

ফজল গাজী বলেছিল, 'বড় মাইনষের ঘরে আর না, খুব আক্কল হইছে। এইবার কাম করুম গরীব ঘরে। খাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখতে পারলেই হইল। তয় পোলাগা (ছেলেটা) ভাল চাই। কুচরিত্তির হইব না, মাইয়ার গায়ে হাত তুলব না। বড় মাইনষে আমার ঘিন্না ধইরা গ্যাছে!' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'এইবার আর অত ট্যাকা চাই না, দশ কুড়ি ট্যাকা পাইলেই মাইয়ার সাদি দিমু!'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা তিরতিরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে হাসেমের। সেই ভীরু আশাটা মনের তলায় মরে পড়ে ছিল, হঠাৎ আবার সেটা জ্বলে উঠেছে। হাসেমের এই আশাটা কতকাল ধরে জুনি পোকার (জোনাকি) মতো জ্বলছে নিভছে নিভছে জ্বলছে!

মাইনকার চর থেকে ফিরে আবার নতুন করে টাকা জমাতে শুরু করেছিল হাসেম। দশ কুড়ি টাকা কত টাকা! যতই হোক, এবার সে নিশ্চয়ই জমিয়ে ফেলবে।

এই সময় তাদের এদিকে একটা রায়ট হয়ে গেল। বড় গাঙের পারে গিরিগঞ্জের বন্দরে দিনদুপুরে ক'টা লোক মরল। নহরপুরেও মারা গেল জনাকয়েক। দূর দূর গ্রাম থেকে খুনখারাপির খবর আসতে লাগল। চারদিকের দশ-বিশটা গ্রাম জুড়ে ক'দিন দারুণ উত্তেজনা। তার পর থেকে এই গ্রামে গ্রামে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। নহরপুর থেকেও রাতের অন্ধকারে ক'ঘর যুগী, কুমোর গণক আর বারুই চলে গেল। আর গেল ভুবন গোঁসাইরা।

দেশভাগের পর আশেপাশে এদিকের দাঙ্গাও অনেকবার রায়ট হয়েছে। ভুবন গোঁসাই তখন যায় নি। এবার তার কি যে হয়ে গেল, গাঁয়ে, বাড়িতে থাকল না।

ভুবন গোঁসাই অন্য আর সবার মতো রাতের আঁধারে পালায় নি. সবার চোখের সামনে দিয়ে খালের ঘাটে গিয়ে উঠেছিল। নহরপুরের বড় মিঞারা —ওই শফিকুলাব রাজান, মতিউর হোসেন সাহেব, জমিরুদ্দিন শাহ। সবাই অনেক বুঝিয়েছে, বলেছে, 'যা হওনের হইয়া গ্যাছে। আর কিছু হইতে দিমু না। আপনে থাকেন ভোবন কত্তা। আমরা আছি, কেও (কেউ) আপনের কিছু করতে পারব নাহ!' কিন্তু ভুবন গোঁসাই কোনো কথাই শুনল না।

ভুবন গোঁসাই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার মা এখানকার মাটি

কামড়ে পড়েই থাকল। তাকে নহরপুর থেকে নড়ানো গেল না। স্বামী-শ্বশুরের ভদ্রাসন ছেড়ে সে যাবে না।

যাবার আগে ভুবন গোঁসাই হাসেমকে তাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তুই তো এর বাড়ি অর (ওর) বাড়ি পইড়া থাকস। তার থনে এক কাম কর না—'

'কী?'

'অহন থনে তুই আমাগো বাড়িত্ আইসা থাক হাসমা। পুবদুয়ারী বড় ঘরখান তরে ছাইবা দিমু।'

হাসেম সৎ, হাসেম নিরীহ, হাসেম ভাল মানুষ—এটা নহরপুরের কে না জানে। তার ওপর সবার খুব বিশ্বাস। সবাই তাকে ভালবাসে, পছন্দ করে।

ভুবন গোঁসাই আবার বলেছিল, 'মায় একলা দ্যাশে রইল, তুই দেখাশুনা করবি। তর ভরসায় মায়েরে রাইখা যাইতে আছি।'

সেই থেকে ভুবন গোঁসাইদের বাড়ি আছে হাসেম।

রায়ট-টায়ট বাধলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত হাসেমের। তখন মানুষ মরে, চেনাজানা লোকেরা দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় চলে যায়। গ্রাম ফাঁকা করে যারা যায় তারা আর ফিরে আসে না।

ভুবন গোঁসাইরা চলে যাবার পর কিছুদিন মনটা ভারী হয়ে থাকল হাসেমের। তারপর আবার সব কিছু সহজ হয়ে এল।

জীবনে এই প্রথম একটা গোটা ঘর পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল হাসেম। ভুবন গোঁসাইর মা-ও তাকে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল।

একই গ্রামের মানুষ, আগে থেকেই ভুবন গোঁসাইর মার সঙ্গে আলাপ ছিল। এ বাড়িতে কতদিন কামলা খেটে গেছে সে। দুটো চারটে পয়সা নিয়ে উঁচু উঁচু গাছের মাথা থেকে নারকেল সুপুরি পেড়ে দিয়েছে।

এক বাড়িতে থাকতে এসে হাসেম টের পেয়েছিল বাড়ির মায়া বড় মায়া।

আগে আগে খাওয়া দাওয়ার ঠিকঠিকানা ছিল না হাসেমের। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে নিকারী কি মুধাপাড়া থেকে উঠে সে মাঠেঘাটে কিংবা খালেবিলে চলে যেত। জেলা বোর্ডের সড়কের ওপর যে বাঁধানো পুলটা, তার গা ঘেঁষে আমজাদের পানবিড়ি চায়ের দোকান। মুড়ি চিড়ে পাঁউরুটি টুটিও ওখানে পাওয়া যায়। বছর কয়েক হল দোকানটা হয়েছে। দুপুরবেলা আমজাদের দোকানে গিয়ে চিড়ে মুড়ি কিনে খেত হাসেম। ভাত খেত সেই রাত্রিবেলা।

কিন্তু ভুবন গোঁসাইর বাড়ি আসার পর আগের নিয়ম আর চলল না। বুড়ি ভীষণ বকাবকি করত, 'আরে নিঃবইংশা, অত বড় শরীলটা (শরীরটা) তর, দুফারে চিড়ামুড়ি খাইয়া নি থাকন যায়! তুই মরবি—নিধ্যস মরবি।'

হাসেম কি করে বোঝায়, জ্ঞান হওয়া থেকে এইরকমই চলছে। এতকাল যখন সে

বেঁচে আছে, সহজে মরবে না। হাসেম যা ভাবত তা কিন্তু বলত না। দাঁত বার করে সে শুধু হাসত।

বুড়ী তাতে আরো রেগে যেত, 'হাসিস না হাসমা। তর হাসন দেখলে গা-ও (শরীর) জ্বইলা যাই। অহন থনে (এখন থেকে) দুফারে আইসা রান্‌বি (রাঁধবি)।'

বুড়ীই বকেঝকে হাসেমের এতকালের অভ্যাস বদলে দিয়েছিল। তার ভয়ে হাসেম রোজ দুপুরে মাঠঘাট খালবিল থেকে ফিরে এসে কাঠকুটো জেলে রান্না চড়াত। অবশ্য বেশির ভাগ দিন তাকে কিছুই করতে হত না, ভুবন গোঁসাইর মা-ই নিজের সঙ্গে ওর ভাত ফুটিয়ে রাখত।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা—সব কলকাতায় চলে গেছে। অত বড় বাড়িতে একা থাকে বুড়ী, আর থাকে হাসেম। এক বাড়িতে কাছাকাছি থাকার জন্য ভুবন গোঁসাইর মা'র সবটুকু মমতা গিয়ে পড়েছিল হাসেমের ওপর।

সারা দিন খাটা খাটনির পর চক-ফক থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে পুবের ঘরের বারান্দায় বসত হাসেম, আর বুড়ী বসত দক্ষিণের ঘরের বারান্দায়। তারপর শুরু হত গল্প সুখদুঃখের গল্প, দেশকালের গল্প, পুরনো আমলের গল্প। তা ছাড়া হাসেমের বাপ রহিমুদ্দির কথা উঠত। ভুবন গোঁসাইর কথা হত। দূর দেশে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে সে কেমন আছে, দু'জনে এইসব বলাবলি করত।

কথায় কথায় চোখ যখন ঘুমে জুড়ে আসত, যখন আর মাথাটা খাড়া রাখা যেত না, সেই সময় হাসেম বলত, 'ঠাউরমা, আর যে পারি না। শরীর ভাইঙ্গা আইতে আছে।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলত, 'তয় (তবে) আর কি, খাওন সাইরা শুইয়া পড় -'

রাতের দিকে আর রাঁধত না হাসেম। দুপুর বেলা বেশি করে ভাত রেঁধে ওবেলার জন্য রেখে দিত। যেদিন যেদিন বুড়ী দুপুরে খাওয়াত সেদিন সেদিন অবশ্য সন্ধ্যেবেলা ফিরেই আখা ধরতে হত তাকে। কেননা ভুবন গোঁসাইর মা বামুনের ঘরের বিধবা, একবেলার বেশি দু'বেলা সে রাঁধে না। রাত্রিবেলা কোনোদিন একটু খই কি এক বাটি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে, কোনোদিন আবার তা-ও খায় না।

ভুবন গোঁসাইর মা'র স্নেহ-মমতা গায়ে মেখে দিন কাটছিল। এরই মধ্যে ফাঁক পেলে হাসেম মাইনকার চরে ছুটত, নতুন করে টাকা-পয়সা জমানো তো চলছিলই। যেদিন মাইনকার চরে যেত সেদিন দুপুরে আর ফিরত না, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দু'চারদিন লক্ষ্য করে করে ভুবন গোঁসাইর মা একদিন বলেছিল, 'মইধ্যে মইধ্যে দুফারে আসস না, যাস কই রে হাসমা ?'

হাসেম বলেছিল, 'মাইনকার চরে।'

'হেইখানে কী?'

হাসেম হকচকিয়ে গিয়েছিল। 'না, কিছু না। এমনেই যাই।

কিন্তু বুড়ীর চোখে অত সহজে ধুলো ছিটানো যায় নি। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'এমনে? ক' (বল্‌) পোড়াকপাইলা, যাস ক্যান?'

প্রথমে হাসেম বলতে চায় নি, খুবই লজ্জা লেগেছে। কিন্তু বুড়ী দারোগা-উকিলের মতো জেরা করে ফুলবানুর কথা বার করে নিয়েছিল। ক'বছর ধরে হাসেম যে মাইনকার চরে ঘোরাঘুরি করছে, তার মধ্যে দু দু'বার সাদি হয়েছে ফুলবানুর দু দু'বার তালাক হয়েছে—কিচ্ছু আর জানতে বাকি রাখে নি।

সব শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল বুড়ীর, 'আরে পিছা-কপাইলা, একখান বিয়ার লেইগা তুই এমুন কইরা মরতে আছস?'

হাসেম উত্তর দেয় নি।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলেছিল, 'মাইয়াগো তালাক হইয়া অহন বাপের ঘরেই আছে?'

'হ।'

'তয় (তবে) আর কি, বিয়া কইরা ফালা (ফেল)।'

হাসেম বলেছিল, 'ক্যামনে করি? ঘরদুয়ার নাই, সাদি কইরা বউ কুনখানে তুলুম?'

'ঘরের লেইগা বিয়া আটকাইয়া থাকব নিহি (নাকি)? ঘর তো তরে একখান দিয়াই দিমু। বউ আইনা হেইখানেই তুলবি!'

'ঘর পাইলাম। কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'টাকাও তো লাগব। ফুলবানুর বাপজানরে (বাবাকে) দশ কুড়ি ট্যাকা দিতে হইব। আমার জমছে খালি এক কুড়ি।'

একটু চুপ করে থেকে ভুবন গোঁসাইর মা বলেছিল, তার হাত এখন শূন্য। তবে [illegible] আর সঙ্গে আছে। সে সব বেচে চার কুড়ির মতো টাকা হতে পারে। পারলে টাকাটাই সে হাসেমকে দিয়ে দেবে। এই চার কুড়ি আর হাসেমের এক কুড়ি, দুইয়ে মিলে দাঁড়াল পাঁচ কুড়ি। তারপরও পাঁচ কুড়ির দরকার, এই টাকাটা হাসেমকে জমাতে হবে।

হাসেম আবার বলেছিল, 'কিন্তুক —'

'কী হইল আবার?'

'ঘর আর ট্যাকা হইলেই হইব না।'

'আর কী চাই?'

'রাজ্জা সাহেব কি আমার লাখান (মতো) মাইনষের হাতে মাইয়া দিব?'

'এইটা আবার কেমুন কথা! ফুলবানুর বাপেরে সাদির কথা ক'স নাই অহনও!'

'না।' আস্তে করে মাথা হেলিয়েছিল হাসেম।

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে থেকেছে ভুবন গোঁসাইর মা। তারপর বলেছে, 'কয় বছর ধইরা মাইনকার চরে যাইতে আছস?'

'হে চাইর-পাচ বচ্ছর হইব।'

'এইর ভিতরে সাদির কথা কইয়া উঠতে পারলি না!'

'কেমনে কই? ডর লাগে যে—'

'কিসের ডর?'

'যদি গাজী সাব মুখের উপর 'না' কইয়া দ্যায়—'

'তয় (তবে) ট্যাকা জমাইছিলি কোন্ আশায়? অহনও তো জমাইয়া যাইতে আছস—'

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় নি হাসেম। বুড়ী কি ভেবে বলেছিল, 'আমারে এক বার মাইনকার চরে লইয়া যাইতে পারবি?'

'ক্যান?'

'গাজী সাহেবের লগে সাদির কথাখান পাকা কইরা আসুম। পুরুষমানুষ হইয়া তুই তো পারলি না! আস্ত পিঠা-কপাইলা তুই একটা।'

বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে বান ডেকে গিয়েছিল যেন। হাসেমের ইচ্ছা হয়েছিল ভুবন গোঁসাইর মায়ের দুই পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকে। সে বলেছিল 'কবে যাইবেন মাইনকার চরে?'

'ট্যাকা-পয়সাগুলান জমাইয়া নে। হের পর যামু—'

'হেই ভাল।'

কিন্তু এবারও টাকা জমাবার আগে আবার সাদি হয়ে গিয়েছিল ফুলবানুর। আর বোকা হাসেম, সৎ সরল ভালমানুষ বলে যার খ্যাতি সেই হাসেম, আগের দু'বারের মতো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। ভুবন গোঁসাইর মা'রও খুব দুঃখ হয়েছিল। হাসেমের কান্না দেখে বুড়ীও না কেঁদে পারে নি। সে বলেছিল, 'দ্যাশে কি আর মাইয়া নাই রে? অর থনেও (ওর থেকেও) ভাল মাইয়ার লগে তর সাদি দিমু—'

হাসেম রাজী হয় নি। সে শুধু কেঁদেই গেছে, কেঁদেই গেছে।

ফুলবানুর তৃতীয় সাদির কিছুদিন পর থেকেই দেশের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করেছিল। হাটে-গঞ্জে লোকেরা বলাবলি করত, আয়ুব খাঁ নাকি মুজিব সাহেবকে জেলে দিয়েছে, শিগগিরই তার বিচার হবে। মুজিব সাহেবের নাম কত কাল ধরে শুনে আসছে হাসেম। তবে আয়ুব খাঁর নামটা নতুন শোনা। এই তো সেদিন, ফুলবানুর দ্বিতীয় সাদির কিছু আগে তার নাম কানে এসেছে। আয়ুব খাঁ

পশ্চিম পাকিস্তানের খান। সারা দেশখানা নাকি তারই হাতের মুঠোয়।

মোতালেফ সাহেবের ছেলে শফিকুল সেই সময় বলেছিল, শিগ্‌গিরই একটা গোলমাল বাধবে। সে আরো জানিয়েছিল, তাদের এই পূব বাংলার রক্ত চুষে খানেরা শেষ করে দিচ্ছে। টাকা-পয়সা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই জেলে পুরে দিচ্ছে। মুজিব সাহেব প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে।

মোতালেফ সাহেবের এই ছেলেটাকে জন্মাতে দেখেছে হাসেম। চোখের ওপরেই সে বড় হয়ে ঢাকায় এম-এ, বি-এ, পড়তে গেল।

শফিকুল যা বলেছিল তা-ই হয়েছে। ঢাকা থেকে গোলমালের খবর এসেছিল। ছাত্ররা খেপে উঠেছে। শুধু কি ঢাকা শহরের ছাত্ররাই, সমস্ত পূব বাংলাই সেদিন রাগে ফেটে পড়েছিল। এমন কি তাদের এই নহরপুর তাজহাট রসুনিয়া মালি-কান্দার স্কুল-মাদ্রাসায় একটা ছেলে ছিল না, সব মিছিল করে বেরিয়ে এসেছিল। তার কিছুদিন পর খবর এল মুজিব এবং আর সব নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারও দিনকয়েক পর শোনা গেল, আয়ুব খাঁর জায়গায় ইয়াহিয়া খাঁ বলে একজন খান দেশের মাথায় চড়ে বসেছে। তারপরেই এখানে ভোট হয়ে গেল।

ভোটের আগে বা পরে সারা দেশ জুড়ে সে কি উত্তেজনা! কি মিছিল! চিৎকার আর চেঁচামেচি! ভোটের ফল বেরুবার পর শোনা গেল, মুজিব সাহেবের দল জিতে গেছে। মুজিব সাহেব এবার দেশের রাজা বাদশা হবেন, তাঁর কথামতো সব চলবে।

ঠিক এই সময় ফুলবানুর তৃতীয় সাদিটা ভেঙে গেল। তালাক হয়ে আবার মাইনকার চরে ফিরে এল সে। মেয়েটার কপালই খারাপ। তিন তিনবার সাদি হ' কিন্তু কোনোটাই টিকল না।

আবার মাইনকার চরে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিল হাসেম।

এদিকে ভোটের পর কিন্তু দেশ জুড়ে আবার গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। গিরি গঞ্জের বন্দরে গিয়ে একদিন হাসেম শুনে এল, ইয়াহিয়া সাহেব সেই কোন মুলু' থেকে ঢাকায় আসছে মুজিব সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। দিনের পর দিন কথাবা' চলল। তারপর। তারপর হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! ঢাকার শহরে গুলি চলল আগুন জ্বলল, খানের বাচ্চারা হাজারে হাজারে লোক মারতে লাগল।

হায় রে হায়, আজ এসে খানেরা নহরপুর থেকে মাইনকার চর পর্যন্ত সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়ে গেছে।

*

জেলাবোর্ডের বাঁধানো সড়ক ধরে ওরা হাঁটছিলই হাঁটছিলই।

চাঁদটা কখন উঁচু উঁচু গাছগাছালির ওপারে ডুবে গেছে, কেউ লক্ষ্য করে নি জ্যোৎস্না নিভে গেলে কিছুক্ষণ পাতলা অন্ধকারে সব কিছু মাখামাখি হয়ে রইল

তারও পর অন্ধকার ভেঙে পূব দিকটায় আবছা আবছা আলো ফুটল। গাছপালার মাথা থেকে, ঝোপঝাড় থেকে পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যেতে লাগল।

মাইনকার চরের সীমানা পেরিয়ে হাসেমরা একসময় আজিপুরের খালের পাড়ে পৌঁছে গেল।

॥ চার ॥

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কটা সেই গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে আজিপুরের খাল পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে। তারপর বাঁ দিকে মোচড় খেয়ে গেছে দক্ষিণে।

হাসেমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই কখন থেকে ফুলবানুর জ্ঞানশূন্য অসাড় শরীর বয়ে আনছে হাসেম। প্রথম দিকে তার মধ্যে একটা অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল। ফুলবানুর শরীরটাকে ভার বলেই মনে হয়নি। কিন্তু আজিপুরের খালের পাড়ে পেঁছে এখন হাসেমের মনে হল, ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এভাবে আর খুব বেশিক্ষণ ফুলবানুকে কোলে বা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

গহরদ্দি বলল, 'এলায় (এবার) কী কাম? দক্ষিণে যাইবা, না খাল পার হইয়া আজিপুরের দিকে যাইবা?'

কেউ উত্তর দিল না।

হাসেম একবার খালের ওপারে আজিপুরের দিকে তাকাল। তারপর তার চোখ গেল দক্ষিণে। আর তখনই সে দেখতে পেল, দক্ষিণ দিক থেকে মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা, বুড়ো-বুড়ী মিলিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটা দল এদিকেই আসছে।

অন্য সবাইও তাদের দেখেছে। ভুবন গোঁসাইর মা বলল 'অরা কারা রে?'

কে যেন বলল, 'দক্ষিণের মানুষ!'

'হেয়া (তা) তো বুঝলাম, কিন্তুক দল বাইন্ধা এই দিকে আসে ক্যান?'

'কেমনে কই? আগে আসুক, জিগাইয়া (জিজ্ঞেস করে) দেখি।'

একটু পরেই দলটা কাছে এসে গেল। ওদের চোখ লাল টকটকে, চুল উষ্কখুষ্ক, সারা গায়ে ভয় আর আতঙ্ক মাখানো। মনে হয় হাসেমদের মতো ওরাও সারারাত হেঁটে হেঁটে আসছে।

গহরদ্দি বলল, 'আপনেরা কুনখান থন আইতে আছেন?'

দলের ভেতর থেকে একটা আধবুড়ো কোমর-বাঁকা লোক এগিয়ে এসে বলল, 'নবীগঞ্জ মীরপুরের নাম শুনছেন নিচ্চয়। আমরা উই দিক থনে আইতে আছি। আপনেরা?'

'আমরা নহরপুর তাজহাটি রসুইনার দিক থন। চিনেন?'

'চিনুম না ক্যান ? কত বার উই হগল জাগার (জায়গার) ভিতর দিয়া গিরিগঞ্জ গেছি। অহন আপনেগো উই দিকের খবর ক'ন।'

'খবর আর কি, খানেরা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মানুষ মাইরা দোজখ বানাইয়া দিছে। গেরামে থাকতে আর সাহস হইল না। শুনতে আছি ইবলিশেরা আবার আইব। হেইর লেইগা বাইর হইয়া পড়লাম। কপালে কী আছে, খোদাতাল্লাই জানে।'

আধবুড়ো লোকটা বড় করে শ্বাস টেনে বলল, 'অয় রে অয়, আমাগো উই দিকেও তো একই ব্যাপার। বিশেখান গেরামে এই চল্লিশ পাঁচচাল্লিশ জন বাইচা আছি। খানেগো ডরে আমরাও বাইর হইয়া পড়ছি। কুন দিকে যামু, কুনখানে গ্যালে পরানে বাচতে পারুম বুঝতে আছি না।'

হাসেমরা বুঝল আর যেখানেই যাওয়া যাক, দক্ষিণে যাওয়া যাবে না। দক্ষিণের চল্লিশ পঞ্চাশজন আর হাসেমরা বিশ পঁচিশ জন—সবাই ওখানে বসে ঠিক করে ফেলল, আপাতত আজিমপুরের খাল পেরিয়ে ওপারে যাবে। তারপর অবস্থা বুঝে কী করা যায়, ভাবা যাবে। একই সর্বনাশ আর দুর্ভাগ্য অনেকগুলো অচেনা মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

আজিমপুরের খালটা খুব ছোট নয়, রীতিমতো একটা নদীই বলা যায় সেটাকে। চৈত্র মাসের এই টাইনা কালেও সেখানে প্রচুর জল, পনের বিশ হাত লগি থই পায় না। স্রোত অবশ্য নেই, তবে জায়গায় জায়গায় কচুরিপানা চাপ বেঁধে আছে।

খালের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা বাঁশের পুল। গহরদ্দি হাসেমকে বলল 'মাইয়াগারে লইয়া পুল পার হইতে পারবি ?'

হাসেম বলল, 'পারুম '

ওরা পুল পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। এ ধারে জেলাবোর্ডের পাকা সড়ক নেই। পুলের তলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। রাস্তাটা কাঁচা হলেও বেশ উঁচু আর চওড়া।

খানিকটা হাঁটবার পর রসময় ডাকল, 'হাসমা—'

হাসেম মুখ ফেরাল, 'কী কও ?'

'হেই মইধ্য রাইত থন মাইয়াটারে কুলে-কান্ধে (কোলে এবং কাঁধে) কইরা-আনতে আছস। এইবার আমারে এট্টু দে ?'

হাসেম বলল, 'যাই আরেট্টু। হের (তার) পর তো দিতেই হইব। একলা কি আর লইয়া যাইতে পারুম ?' আসলে সে কারো কাছেই ফুলবানুকে ছাড়তে চাইছিল না। হায় রে হায়, তার ভীরু দুর্বল বাসনা কিভাবে পেতে চেয়েছিল ফুলবানুকে, আর কিভাবেই বা তাকে নিয়ে চলেছে।

যেতে যেতে ফুলবানুর মুখের দিকে তাকাল হাসেম। সকালের প্রথম সোনালী রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। ফুলবানুর চোখ দুটো আধ-বোজা। কাল রাত্রি-

ডাক্তারের লগে পরামর্শ্য কর। আমি চিঠিতে লেইখা (লিখে) দিমু নে। উই দিকে অহনও (এখনও) কিছু হয় নাই, হইব বইলা শুনিও নাই। ডাক্তারসাব যা কইব তা-ই কইরো।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হাসেম জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তুক আপনে?'

'আমি কী?'

'খানেরা আইব, আপনে যাইবেন না? এইখানে থাকলে বিপদে পড়বেন জাফর সাব।'

জাফর সাহেব হাসল, 'জানি বিপদ হইব। কিন্তুক হগলেই (সবাই) যদি পলাইয়া যাই, থাকব কে? ইবলিশের ছাওগো (বাচ্চাদের) মুকাবিলা করব কে?' হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বলল, 'এই অস্তরখান আমার দিন-রাইতের সাথী, এইটা থাকতে কেওরে (কাউকে) ডরাই না।'

খান-সেনাদের হাতে যে সব অস্ত্র আছে সেগুলোর তুলনায় দোনলা বন্দুকটা যে কিছুই না, তারা এসে গেলে এটা যে কোন কাজেই লাগবে না, এই কথাটা জাফর সাহেব কি জানে না? তার সাহস দেখে হাসেম অবাক হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, যে কোন সময় খানেরা এসে পড়তে পারে – এত সব জেনেও জাফর সাহেব আজিপুরেই পড়ে থাকবে। হাসেম তাকে কী যে বলবে, ভেবে পেল না।

জাফর সাহেব আবার বলল, 'একখান কথা ভাইবা (ভেবে) দেখছ মিয়া?'

'কী?'

'বেবাক গেরামের বেবাক মানুষ যদি পলাইতে থাকে, দ্যাশের অবস্থা কী হয়? এত মানুষ যাইবই বা কই?'

সারা দেশের সমস্ত মানুষ পালালে কী হবে, এতখানি ভাববার মতো জোরালো কল্পনা-শক্তি হাসেমের নেই। সে কিছু বলল না।

অন্য সব যারা আছে তাদের মুখেও কথা নেই। জাফর সাহেবকে ঘিরে সমস্ত ভিড়টা স্তব্ধ হয়ে রইল।

দুপুরের কিছু পরে হাসেমরা আজিপুর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরুবার সময় রাস্তায় খাবার জন্য তাদের সবাইকে খানিকটা খানিকটা করে চিড়ে আর মুড়ি দিয়ে দিল জাফর সাহেব এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক ধরে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেল

।। পাঁচ ।।

ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে খাড়া পশ্চিমে এগিয়ে চলল হাসেমরা। নিদারুণ এক অনিশ্চয়তা তাদের তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল।

মাইনকার চর থেকে আজিপুর পর্যন্ত একলাই কোলে-কাঁধে করে ফুলবানুকে নিয়ে এসেছিল হাসেম। এখন অবশ্য ডুলির চওড়া পাটাতনে শুইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডুলির একদিকের বাঁশ হাসেমের কাঁধে, আরেক ধারেরটা গহরুদ্দির। সামনে আছে গহরুদ্দি, পেছনে হাসেম। এভাবে নিয়ে যাবার জন্য কষ্টটা আর হচ্ছে না। তাছাড়া হাঁপিয়ে গেলে কাঁধ বদল করে নেওয়া যাবে। এত মানুষ আছে, যাকে বলা যাবে সে-ই এসে কাঁধ দেবে।

ডুলির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে ভুবন গোঁসাইর মা আর দশ মাসের ভরা গাভীন কুলসম এবং মীরপুর-নবীগঞ্জের আরো ক'টি মেয়েমানুষ। ওদের বেশির ভাগই হিন্দুঘরের সধবা বউ, মুসলমান ঘরেরও দু-চারজন আছে। এদের কারো সঙ্গেই আলাপ হয়নি হাসেমের, হবার সময় কোথায়? আজই তো সকালবেলা আজিপুরের খালপাড়ে প্রথম ওদের দেখেছে হাসেম।

এখন সূর্যটা পশ্চিমদিকে অনেকখানি টাল খেয়েছে। চৈত্র মাসের সূর্য—যেমন তীব্র তেমনি গনগনে। তবে এটুকু বাঁচোয়া, প্রচুর হাওয়া আছে।

ফুলবানুর জ্ঞান এখনও ফেরে নি। রোদটা যাতে খাড়া মুখে না পড়তে পারে তাই তাকে কাত করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখটা হাসেমের দিকে ফেরানো।

আজিপুরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছে হাসেমেরা। সেই সময় ফুলবানুর মাথাটা খুব যত্ন করে ধুয়ে দিয়েছিল ভুবন গোঁসাইর মা, গা মুছিয়ে দিয়েছিল।

এখন মাথাটা শুকিয়ে গেছে। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় ফুলবানুর রুক্ষ চুল মুখের ওপরে এসে পড়ছিল। যতবার মুখের ওপর চুল আসছে ততবারই ঝুঁকে ভুবন গোঁসাইর মা সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই সে বলে উঠছে, 'যম—যমেরা মাইয়াটারে শ্যাষ কইরা গ্যাছে।'

হাসেম উত্তর দেয় না। পলকহীন সে শুধু ফুলবানুর দিকে তাকিয়েই থাকে।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলে, 'কবে যে অর জ্ঞান ফিরব, কবে সুস্থ মাইনষের লাখান উইঠা বইব, হাইটা-চইলা (হেঁটে-চলে) বেড়াইব, ঈশ্বর জানে। হায় হায় রে—'বলতে বলতে তার গলার ভেতর থেকে ফোঁপানির মতো শব্দ উঠে আসতে থাকে।

ফুলবানুকে আগে আর কখনও চোখে দেখে নি বুড়ী, হাসেমের মুখে তার সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছে। প্রায় অচেনা একটা মেয়ের জন্য কাল রাত থেকে মাঝে মাঝেই কাঁদছে ভুবন গোঁসাইর মা। বুড়ীর প্রাণে বড় মায়া।

কুলসম কিন্তু ফুলবানুর দিকে একবারও তাকাচ্ছিল না। আজিপুরে তাকে হাজার বলে বলেও স্নান করানো যায় নি, খাওয়ানো যায়নি। চুলগুলো এক রাত্তিরেই রুক্ষ, উষ্কখুষ্ক। সারা রাত না ঘুমিয়ে শুধু হেঁটেছে, হেঁটেছেই। চোখ দুটো লাল টকটকে। গালে চোখের জলের দাগ শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে।

তার ওপর আছে নতুন বাচ্চার ভার। মুখ থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটা ভেঙেচুরে যেন কিরকম হয়ে গেছে।

কুলসম যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কিছুই সে বুঝতে পারছিল না।

অন্য মেয়েমানষগুলো থেকে থেকে ডুকরে উঠছিল, 'অয় অয় রে, কী সব্বনাশ হইল। কই যামু, কী করুম!'

আজিপুরের পর টুঙ্গা, টুঙ্গার পর সখির বাজার। তারপর ঘোড়ামারার হাট পেরুলেই হাবিবগঞ্জ।

টুঙ্গা, সখির বাজার, ঘোড়ামারার হাট—হাসেমরা যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেখানেই রাস্তার পাশ থেকে উদ্বিগ্ন মুখে অনেক মানুষ উঠে আসছে।

'কই থন (কোথা থেকে) আইতে আছ?'

হাসেমরা জানায়, নহবপুর, তাজহাটি, রসুনিয়া, মাইনকার চরের দিক থেকে তারা আসছে। নবীগঞ্জ-মীরপুরের লোকগুলো জানিয়ে দেয়, তারা কোথা থেকে আসছে।

'উই দিকের খবর কী?'

গ্রামে গ্রামে খান-সেনারা ঢুকে কী করেছে, হাসেমরা তার বর্ণনা দিয়ে যায়।

'আমরাও শুনছি, নহরপুরের পর থনে আর কিছু নাই। তুমরা কী কও, খানেরা এই দিকে আইব?'

'হেইরকমই শুনছি।'

'অয় অয় রে, গেরাম ছাইড়া কি যামু গা?'

'হে (তা) তুমরা বোঝো। শুনাশুন শুনছি, খানেরা এইখানেও আইব।'

'কী সব্বনাইশা কথা!'

ঘোড়ামারার হাটুরে চালাগুলো ছাড়িয়ে হাবিবগঞ্জের দিকে মাইলখানেক যেতে না যেতেই আরো পশ্চিম থেকে হঠাৎ মানুষের চিৎকার ভেসে এল।

হাসেমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন ভীত স্বরে বলল, 'ব্যাপারখান কী?'

আরেকজন বলল, 'ক্যামনে কই! কিছুই তো বুঝতে আছি না।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'আর আউগাইয়া (এগিয়ে) কাম নাই। এইখানেই খাড়াও। ভাবগতিক বুইঝা যা হয় করন যাইব।'

ওরা সারা মুখেচোখে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

বেলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। নেহাত চৈত্র মাস, তাই দিনের আভা একেবারে নিভে যায় নি, পশ্চিমের ভাসন্ত মেঘে আবছাভাবে একটু আলো লেগে আছে। তবে চারপাশের গাছপালার ছায়া অনেক ঘন হয়ে গেছে। পুব, উত্তর আর দক্ষিণ দিক জুড়ে কেউ যেন কালচে একটা জাল ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে।

দম বন্ধ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর হাসেমরা দেখতে পেল, পশ্চিমের উঁচু উঁচু গাছগাছালির মাথা ছাড়িয়ে আগুন আর ধোঁয়া উঠছে। দেখতে দেখতে লকলকে আগুনের জিভ আকাশে গিয়ে ঠেকল।

গহরাদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'অয় অয় রে, জল্লাদেরা উই দিকে গ্যাছে বুঝি—'

হাসেম কী বলতে যাচ্ছিল, সেইসময় ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়ে অনেক লোক—পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো-উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসতে লাগল।

ওরা কাছাকাছি এসে গেলে হাসেম চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হইছে, কী হইছে, অমুন দৌড়াও ক্যান ?'

লোকগুলো ভয়ার্ত উদ্‌ভ্রান্ত সুরে বলল, 'খানেরা আইছে হবিবগঞ্জে। বেবাক জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া শ্যাষ কইরা দিতে আছে। আমরা পলাইছি। এইখানে আর খাড়াইয়া থাইকো না, পুব মুখি দৌড়াইতে থাকো।'

রসময় বলল, 'পুব থনেই তো আমরা আইলাম।'

'পুবেও যমেরা আইছে নিহি (নাকি) ?'

'হু, । পুব. দক্ষিণ—দুই দিকেই আইছে। জান বাচনের লেইগা আমরা পচ্চিমে যাইতে আছিলাম।'

'পচ্চিমেও কুনো আশা নাই। খানেরা ইখানেও আইসা গ্যাছে।'

'তাইলে উপায় ?'

'উপায় আর কিছু নাই। এইবার মরণ। কিন্তুক সড়কের উপুর খাড়াইয়া বিপদ ডাইকো না। জল্লাদেগো গাড়ি-গুড়ি আছে। গুলি বন্দুক আছে। এই মুখি যদি আইসা পড়ে রক্ষা নাই।'

'কী করতে চাও ?'

'পুব পচ্চিম দক্ষিণ, তিন দিক গ্যাছে। খালি আছে উত্তর দিকখান। লও হেই মুখিই নাই—'

এখান থেকে উত্তর দিকে যাবার রাস্তা নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কের তলাতেই মজা খাল। তারপর দুই কাইক গেলে নিবিড় উলুবন।

কে যেন বলল, 'উলুবনের ভিতর দিয়া যাইবা ক্যামনে ?'

বনটা প্রায় আধ মাইলের মতো লম্বা, যেতে হলে অনেকখানি উজিয়ে কিংবা পিছিয়ে নিচের দিকের সড়ক ধরতে হয়। হাসেম কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলল, 'আর সব্বনাশ, উই দ্যাখ—উই মুখি—'

তক্ষুণি সবার চোখ পশ্চিমে ঘুরল। অনেক দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা সরু হতে হতে যেখানে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে সেইখানে দুটো কালো ফোঁটার মত কী ফুটে উঠেছে। চক্ষের পলকে ফোটা দুটো মিলিটারি ট্রাক হয়ে গেল।

ইউনিয়ন বোর্ডের এই সড়কটা কাঁচা হলেও বেশ চওড়া। বর্ষার জলে পুব বাংলার

অন্য সব মেটে রাস্তার মতো এটাও জলের মধ্যে ডুবে যায়। তবে খরার দিনে আর শীতে মানুষ, গরুবাছুর হেঁটে চলে বেড়ায়। আগে শুধু গরুর গাড়িই চলত, ক'বছর ধরে মোটর-টোটরও যাতায়াত করছে।

ভুবন গোঁসাইর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'নিঃবংশারা আইতে আছে, তরাতরি উলুবনে ঢুইকা পড়।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়তে দৌড়তে রাস্তা আর মজা খালের ওপর দিয়ে সবাই উলুর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

গহরবন্দি চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যত পাব ভিতরমুখি যাও '

উলুবন ভেঙে সবাই ছুটছে। ইউনিয়ন ভেতর সড়ক থেকে যতদূরে চলে যাওয়া যায় ততই তারা নিরাপদ।

কিন্তু পায়ে পায়ে বাধা সরিয়ে কত দূর যাওয়া সম্ভব! দু হাতে ঘন জঙ্গল তোলপাড় করে ছুটতে ছুটতে অনেকে, বিশেষ করে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা যাচ্ছিল। দু শ' কাইকের বেশি তারা যেতে পারে নি, তার আগেই সড়কে ভারী ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা এসে গেছে।

অন্য সবাই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডুলিতে মানুষের ভার নিয়ে হাসেম আর গহরন্দি পিছিয়ে পড়েছে। তবু সমস্ত শক্তি দুই পায়ে জড়ো করে ওরা এগুচ্ছে।

হাসেম সড়কের দিকে কান খাড়া করে রেখেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পায়, ট্রাক দুটো শব্দ করে থেমে গেছে। তবে কি খানেরা তাদের উলুবনে ঢুকতে দেখেছে? যদি দেখে থাকে? তার ভাবনাটা শেষ হল কি হল না, ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ আসতে লাগল—বুম—বুম—বুম—

উলুবনের ভেতর দিয়ে গুলি আসছে। ভীত আতঙ্কিত জন্তুর মত উলুর জঙ্গল দলে মুচড়ে হাসেমরা একবার এদিকে একবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। কোন্ দিকে গেলে বাঁচা যাবে, কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। কে কোথায় আছে, ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবে সন্ত্রস্ত ছোটাছুটির মধ্যে থেকে আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠছিল, 'হায় আল্লা, গেলাম!' কিংবা 'হে ভগবান, মরলাম।' তারপরেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকে গুটিয়ে পড়েছে। নির্ঘাত ওদের গুলি লেগেছে।

আশে-পাশে কত লোক যে ছুটতে ছুটতে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, হিসেব নেই। একটা গুলি শেষ পর্যন্ত, হায় হায় রে গহরন্দির বুকে এসে লাগল। তক্ষুণি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মুখ গুঁজে পড়ে গেল সে। ভলকে ভলকে তাজা লাল উষ্ণ রক্ত তার বুক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

নহরপুরে খানেদের হাতে গহরন্দির তিন পোলা, দুই জরু আর এক মেয়ে মরেছে। প্রাণে বাঁচবার জন্য খুব বেশিদূর তাকে যেতে হল না, উলুবনের ঘন

ছায়ায় সে পড়ে রইল।

গহরদ্দি পড়ে যেতে তার কাঁধ থেকে ডুলির বাঁশটা খসে গিয়েছিল। কাজেই ফুলবানুকে নিয়ে ডুলিটা ওধারে পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে তার দিকের বাঁশটা নামিয়ে গহরদ্দির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল হাসেম। সারা গা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একটা মানুষের দেহে কত রক্ত আছে কে জানে। হাসেম ডাকল, 'গহরভাই -গহরভাই—'

ঘোলাটে চোখে একবার তাকাল গহরদ্দি। কাতরানির মতো একটা শব্দ করল। তারপরেই তার চোখ বুজে গেল।

গহরদ্দিকে নিয়ে কী করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না হাসেম। এই মানুষটার সঙ্গে তার কতকালের চেনাশোনা। ভুবন গোঁসাইরা ডেকে নিয়ে যাবার আগে নিকারী-পাড়ায় গহরদ্দির ঘরের খোলা বারান্দায় কত বছর যে কাটিয়ে দিয়েছে! এক সঙ্গে কত দিন ধলেশ্বরীতে গেছে মাছ মারতে, পলো আর ধর্মজাল নিয়ে নেমেছে বিলে—বর্ষায় ডুবে যাওয়া চকে। আষাঢ়-শ্রাবণের ভরা কোটালে খালে গিয়ে কতদিন 'চাই' পেতে রেখে এসেছে দু'জনে। জীবনধারণের জন্য জলে জলে যে লড়াই তাতে গহরদ্দি ছিল সর্বক্ষণের সহযোদ্ধা। হায় রে হায়, সেই মানুষটা উলুবনে মরে পড়ে রইল!

হাসেমের বুকের তলা থেকে মোচড় দিয়ে দিয়ে হাজার মণ ভারী কী একটা যেন উঠে আসছিল। ঢোক গিলতে, নিশ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। এর মধ্যেই আবছাভাবে সে টের পাচ্ছিল, ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দিক থেকে গুলির শব্দ থেমে গেছে। হয়তো খানেরা চলে গেছে।

কতক্ষণ গহরদ্দির মুখের ওপর ঝুঁকে বসে ছিল, হুঁশ নেই। হঠাৎ উলুবনের ভেতর থেকে অগুনতি গলার ভীত চিৎকার উঠতে লাগল, 'পলাও, পলাও—উত্তরমুখি পলাও। ইবলিশেরা আগুন ধরাইয়া দিছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত ওপর দিকে তাকাল হাসেম। সত্যিই আগুন, উলুবনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। আগুন লাগালেও এত তাড়াতাড়ি আসবার কথা নয়, দক্ষিণের বাতাস পিঠে চড়িয়ে সেটাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।

তক্ষুণি ফুলবানুর কথা মনে পড়ে গেল হাসেমের আর মনে পড়ল ভুবন গোঁসাইর মাকে।

লাফ দিয়ে উঠে ফুলবানুকে পাঁজাকোলে তুলে হাসেম ছুটতে লাগল, আর গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল, 'ঠাউরমা—ঠাউরমা—' বাঁশের ডুলিটা উলুবনেই পড়ে থাকল।

ভুবন গোঁসাইর মা'র সাড়া পাওয়া গেলনা।

হাসেম এবার ডাকল কুলসমকে। তারপর নহরপুরের যে ক'টা জীবন্ত মানুষ একসঙ্গে এসেছিল, তাদের সবার নাম ধরে ধরে। কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। গুলি আর আগুনে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে জানে!

উলুবন তছনছ করে দুদ্দাড় মানুষ ছুটে যাচ্ছে। হাসেমও ছুটছিল, কিন্তু একটা মানুষের ভার নিয়ে প্রতিটি কাইকে উলুর বাধা সরিয়ে সরিয়ে কত তাড়াতাড়িই বা এগুনো সম্ভব! ওদিকে আগুন যেভাবে যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তাতে আর বোধহয় পারা যাবে না। ছুটন্ত আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালাতে পালাতে হাসেমের মনে হচ্ছিল, যে কোন সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হায় হায় রে, শেষ পর্যন্ত বেড়া আগুনে পুড়ে মরবে তারা!

উলুবনটা যে কত বড়, কে জানে। এটার বোধ হয় শেষ নেই।

পালাতে পালাতে হঠাৎ এক কাণ্ড হল। হাসেম দেখতে পেল ছুটে আসতে আসতে আগুনটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এবং উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়েছে। কিন্তু সেদিকে যাবার জো নেই, কেননা উলুবন যা ছিল সব পুড়িয়ে ছাই করেই তো সেটা এতখানি এগিয়ে এসেছে। ওদিকে এমন আর কিছুই নেই যা ধরে আগুনটা ফিরে যেতে পারে।

ব্যাপারটা কী হল, প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না হাসেম। একটু পরেই তার খেয়াল হল, এতক্ষণ দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে এখন উত্তর দিক থেকে ঝড়ো বাতাস ছুটে আসছে। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে আগুনটা এগিয়ে আসতে পারছে না। হাসেম মনে মনে বলল, 'হগলই (সবই) খোদাতাল্লার ইচ্ছা।'

আগুনের ভয় আপাতত নেই।

হাসেম ছোটাছুটি থামিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

দিনের শেষ নিভু-নিভু যে আলোটুকু খানিক আগেও আকাশের গায়ে আটকে ছিল, সেটা একেবারেই মরে গেছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। তারপর অনেকক্ষণ হেঁটে উলুবন পার হয়ে বিশাল এক চকে এসে পড়ল হাসেম।

এর মধ্যেই দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় চকটা ভেসে যাচ্ছিল।

হাসেম দেখল, সে আসবার আগেই কুলসম আর ভুবন গোঁসাইর মা চকে এসে পড়েছে। নহরপুরের আরো কয়েকজনকে দেখা গেল। তা ছাড়া, নবীগঞ্জ মীরপুর, মাইনকার চর, হাবিবগঞ্জের মানুষয়া তো আছেই। এক পলক দেখেই হাসেমের মনে হল যত লোক তারা উলুবনে ঢুকেছিল তার আধাআধি চকে এসেছে, বাকি অর্ধেক নিশ্চয়ই উলুবনে গুলি খেয়ে পড়ে আছে।

হাসেমকে দেখে ভুবন গোঁসাইর মা ছুটে এল, 'অয় রে ড্যাকরা, নিঃবইংশা, আমি তো ভাবছিলাম তুই নাই। কসাইগুলা তরে শ্যাষ করছে।'

ফুলবানুকে কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিতে দিতে হাসেম বলল, 'আমি মরি নাই ঠাউরমা। কিন্তুক গহরদ্দি ভাই গুলি খাইয়া মরছে।'

'গহইরা মরছে!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গেল ভুবন গোঁসাইর মা।

হাসেম আবছা গলায় বলতে লাগল, 'আমরাও কেও (কেউ) বাচুম না ঠাউরমা।

কয়দিন আর পলাইয়া থাকুম, ইবলিশগো চোখে একদিন না একদিন পইড়া যামুই। আর তহন—' বলতে বলতে আচমকা সেই ডুলিটার কথা মনে পড়ে গেল। তক্ষুণি উঠে পড়ল সে।

ভুবন গোঁসাইর মা জিজ্ঞেস করল, 'উঠলি যে?'

'এট্টু উলুবনে যাইতে হইব। ফুলবানুর ডুলিটা ফালাইয়া আইছি, হেইটা লইয়া আসি—

'উলুবনে গিয়া মরবি? ডাকাইতরা গুলি চালাইয়া তরে শ্যাষ করব।'

'হ্যারা (তারা) নাই, আগুন ধরাইয়া গ্যাছে গা—' হাসেম আর দাঁড়াল না।

উলুবনে ঢুকে তার বুক ছমছম করতে লাগল। চারদিক থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। কেউ কেউ জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, 'পানি—এট্টু পানি—'

'মইরা গ্যালাম রে—'

যাদের গুলি লেগেছে তারা সবাই মরে নি। জলটল আর ওষুধ পেলে এখনও হয়তো কাউকে কাউকে বাঁচানো যায়। কিন্তু হাঁড়ি পাতিল বাটি-গেলাস কিছুই সঙ্গে নেই যা দিয়ে জল আনা যায়। তা ছাড়া এখানে জলই বা কোথায়?

খুঁজে খুঁজে ডুলিটা বার করে আবার চকে ফিরে এল হাসেম। উলুবন থেকে যারা বেঁচে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি আর আচ্ছন্নের মতো বসে আছে।

হাসেম তাদের বলল, 'উলুবনে অহনও কেও কেও (কেউ কেউ) বাইচা আছে, গুঙাইতে আছে। এট্টু পানি হইলে অগো বাচান যায়।'

তক্ষুণি দলের শক্ত সবল পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল এবং উলুবনের ভেতর যারা গুলিতে জখম হয়ে পড়েছিল তাদের তুলে চকে এনে শুইয়ে দিল। কেউ কেউ কোত্থেকে কানা-ভাঙা মাটির পাতিল জোগাড় করে মাঠের মাঝখানে একটা মজা খাল থেকে জল নিয়ে এল। খানিকটা খানিকটা জল খেয়ে আহত মানুষগুলো কাতর শব্দ করতে করতে একসময় চুপ করে গেল।

সমস্ত দিন শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে যা গেছে তাতে সুস্থ জীবন্ত মানুষগুলোও আর মাথা খাড়া রাখতে পারছিল না. শূন্য চকে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মেখে তারা শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে অসাড় হয়ে গেল।

হাসেম শুয়েছিল ফুলবানুর পাশে। শোওয়ামাত্র তার কিন্তু ঘুম এল না। চিত হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবছিল, কাল রাত্তিরে ছিল কোথায়, আর আজ কোথায়? আসছে কালই বা কোথায় থাকবে, কে জানে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনাই তার কাছে অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্যও।

কিছুক্ষণ চিত হয়ে থাকবার পর পাশ ফিরে ফুলবানুর দিকে তাকাল হাসেম। এখনও মেয়েটার জ্ঞান ফেরে নি। ফুলবানুকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা

তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার। সাড়া পাবে না জেনেও ডাকতে লাগল, 'ফুলবানু-ফুলবানু—'অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগল, 'আর কি তুমি চৌখ মেলবা (চোখ খুলবে) না, আর কি কথা কইবা না ?' বলতে বলতে আর ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাসেম কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

সকালবেলা ঘুম ভাঙলে হাসেম দেখতে পেল, উলুবন থেকে কাল রাত্রে যে রক্তাক্ত জখমী লোকগুলোকে তুলে আনা হয়েছিল তাদেব বেশির ভাগই মরে গেছে। যে আটদশ জন এখনও বেঁচে আছে, ভয়ার্ত করুণ সুরে তারা গোঙাতে গোঙাতে বলছিল, 'আমাগো ফালাইয়া তুমরা যাইও না।'

কিন্তু ওদের ফেলে না গিয়ে উপায়ই বা কী। এত লোককে কে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে ? ওদেব জন্য যদি এখানে পড়ে থাকতে হয়, নানা দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা। খানেদের ভয় তো আছেই, এই নির্জন চকে তার চাইতে অনেক বেশি ভয় না খেয়ে মরার।

কাল দুপুরে আজিপুরের জাফর সাহেব কিছু চিড়ে আর গুড় সঙ্গে দিয়েছিল। রাত্তিরে কেউ খায় নি। এখন দু মুঠ খেয়ে, আহত লোকগুলোকে খানিকটা দিয়ে হাসেমরা চকের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল।

পেছন থেকে জখমী লোকগুলো ভাঙা দুর্বল সুরে চেঁচাতে লাগল, 'আমাগো ফালাইয়া যাইও না, ফালাইয়া যাইও না।'

অন্য সময় হলে এভাবে কি চলে যেতে পারত ? হাসেম ভাবল, তার মন একদিনে কি পাষাণ হয়ে গেছে !

কাল গহবন্দি ডুলিব একদিকের বাঁশ কাঁধে নিয়েছিল। আজ সে নেই, তার জায়গায় যুগীপাড়ার রসময় কাঁধ দিয়েছে। চকটার যেন শেষ নেই। হাসেমরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যের কিছু আগে আগে ওরা একটা গ্রামের কাছে এসে পড়ল।

চক থেকে ওরা সবে গ্রামে ঢুকছে সেইসময় কে চিৎকার করে বলল, 'কারা তুমরা ?'

হাসেমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাবপরেই দেখতে পেল, চারপাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে অনেকগুলো লোক বেরিয়ে এল। বেশির ভাগই যুবক, তবে দু-চার জন প্রৌঢ় এবং বারো চোদ্দ বছরের ক'টি ছেলেও আছে। তাদের কারো পরনে পাজামা-গেঞ্জি, কারো বা লুঙ্গি-শার্ট। কিন্তু সবার হাতেই বন্দুক। বন্দুক

থাকলেও এরা অন্তত খানসেনা নয়, এদেশেরই মানুষ।

হাসেমরা ভয়ে ভয়ে জানাল, তারা কারা, কোথা থেকে কিভাবে আসছে।

সব শুনে লোকগুলোর চোখ দপদপ করতে লাগল। চোয়ালের হাড় শক্ত হল। তাদের একজন বলল, 'তাইলে (তাহলে) তো তোমাগো খাওন দরকার, বিশ্রাম দরকার। আসো আমাগো লগে'

হাতে যেন বেহেস্ত পেয়ে গেল হাসেমরা। ওদের সঙ্গে গ্রামের ভেতর যেতে যেতে হঠাৎ হাসেম জিজ্ঞেস করল, 'আপনেরা ?'

একজন বলল, 'আমরা মুক্তিফৌজ—'

'মুক্তিফৌজ' কথাটা হাসেমের জানা। কিন্তু কোথায় শুনেছে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। সে বলল, 'একখান কথা জিগামু ?'

'কী ?'

'জঙ্গলের ভিতরে বইসা আপনেরা কী করতে আছিলেন ?'

'পরি (পাহারা) দিতে আছিলাম। শুনছি খানের বাচ্চারা আমাগো গেরাম জ্বালাইতে আইব। তাগো মুকাবিলা করতে হইব তো।'

হাসেমের মনে পড়ল, তাদের নহবপুরের ছেলেমেয়েরা খানেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য লাঠি-চালানো, ছোরা চালানো, এবং বন্দুক ছোঁড়া শিখেছিল। কিন্তু কী হয়েছে তাতে ? কেউ কি প্রাণে বেঁচেছে ? খানেরা কি মানুষ ? একেকটা জানোয়ার, ইবলিশ। প্রাণে ওদের দয়ামায়া নেই।

একটা কথা ভেবে হাসেমের বুকে কাঁপুনি ধরল, অচেনা এই গ্রামের এই নানা বয়সের মানুষগুলোও বাঁচবে না, ক'টা দোনলা বন্দুক দিয়ে কি খানেদের রোখা যায় ?

গ্রামের ভেতর এসে একটা ফাঁকা মাদ্রাসায় হাসেমদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল লোকগুলো। খাওয়ারও বন্দোবস্ত হল।

নহরপুর থেকে বেরুবার পর দাঁতে আর কিছু কাটে নি ভুবন গোঁসাইর মা। বামুনের ঘরের বিধবা, যখন তখন যেখানে সেখানে খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাছাড়া অন্যের রান্নাও তার চলবে না। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা বুড়ি দারুণভাবে মেনে চলে।

একই বাড়িতে আট দশ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে ভুবন গোঁসাইর মা'র সব অভ্যাস এবং জীবনযাত্রার মোটামুটি ছকটা জেনে গেছে হাসেম। দু' দিন বুড়ি নির্জলা উপোস দিয়েছে। তার ওপর আছে প্রাণের ভয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটা। একে তো ফুলবানুকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, বুড়ির যদি কিছু হয় আবার একটা বিপদ জুটে যাবে।

বলে-কয়ে একটু দুধ, খানিকটা খই আর পাকা কলা জোগাড় করে ভুবন গোঁসাইর মাকে খাওয়াল হাসেম।

সবার খাওয়া-দাওয়া হতে হতে রাত নেমে গেল।

সেই বন্দুকওলা লোকগুলো তাদের তদাবক করছিল, কোত্থেকে দুটো হেরিকেন জ্বালিয়ে তারা মাদ্রাসায় এনে রাখল।

বন্দুকওলারা তো আছেই, গ্রামের অন্য লোকরাও মাঝে মাঝে এসে হাসেমদের দেখে যাচ্ছে। নহবপুর থেকে হাবিবগঞ্জ পর্যন্ত দু' ধারের গ্রামগুলোতে কী হয়েছে, খানেরা কত লোক মেরেছে, কত বাড়ি পুড়িয়েছে, কত মেয়ে লুট করেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিচ্ছে। তারপর বলছে, 'হায় হায় রে, জল্লাদেরা যদি আমাগো গেরামে আসে কী হইব? হায় হায় রে—'

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক বন্দুকওলাকে হাসেম বলল, 'আপনেগো এইখানে ডাক্তার আছে?'

'না, ক্যান?'

ফুলবানুকে দেখিয়ে হাসেম বলল, 'দুই দিন থইবা এয়ার হোঁশ নাই। ডাক্তার পাইলে বাচান যাইত।'

বন্দুকওলা ফুলবানুকে দেখতে দেখতে চমকে উঠল, 'কী হইছে মাইয়াটার?'

কী হয়েছে, হাসেম বলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দুকওলা বলল, 'হ, এট্টা ডাক্তার পাওন দরকার। কিন্তুক এই গেরামে নাই, জবর চিন্তায় ফালাইলা মিয়া—'

হাসেম উত্তর দিল না।

রাত একটু বাড়লে বন্দুকওলারা বলল, 'সমস্ত দিন ধকল গ্যাছে, অহন তুমরা ঘুমাও। কাইল সকালে আসুম—' ওরা দল বেঁধে চলে গেল।

তারপর কেউ আর বসে থাকল না। মাদ্রাসার তিনটে ঘরে যে যেখানে পারল আড়াআড়ি লম্বালম্বিভাবে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়ল।

হাসেম কাল রাতের মতো আজও ফুলবানুর কাছে শুয়েছিল। ফিসফিস করে সে বলল, 'আইজও ডাক্তার পাইলাম না, তুমারে বাচাইতে পারুম না ফুলবানু, পারুম না—' তার গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

পরের দিন সকালে হাসেমদের ঘুম ভাঙতেই বন্দুকওলারা এসে পড়ল।

হাসেমরা বলল, 'আপনেগো লগে একখান পরামশ্য করতে চাই '

'কও—'

'আমাগো খবর সগলই তো শুনছেন। অহন আমরা কইযাই? কুনখানে গ্যালে পরানখানা বাচাইতে পারি?' ঠিক এই প্রশ্নগুলিই হাসেমরা আজিপুরের জাফর সাহেবকে করেছিল।

জাফর সাহেব যা বলেছিল, এরাও তা-ই বলল। এই গ্রামেই হাসেমদের তারা থাকতে বলতে পারত। কিন্তু খান সেনারা যে কোনদিন হানা দিতে পারে। কাজেই এখানে থাকা হাসেমদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

হাসেমরা বলল, 'আমরা কই যামু কইয়া দ্যান—'

একটু ভেবে বুড়ো বন্দুকওলা বলল, 'পুবে-পশ্চিমে-দক্ষিণে যাইও না। খাড়া উত্তরেও না। শুনাশুন শুনতে আছি, উত্তরেও নিহি অরা আইব।'

'তাইলে?'

'তুমরা কোণাকুণি উত্তর-পচ্চিমে যাও। উই দিকে অহন তরি (এখন পর্যন্ত) বিপদ নাই। কানে অন্তত কিছু আহে নাই।'

হাসেমদের কিছু খাইয়ে, কিছু মুড়ি চিড়ে বেঁধে দিয়ে সড়কে তুলে দিল বন্দুক-ওলারা।

॥ সাত ॥

ছোটবেলায় কার কাছে একটা পরস্তাব (রূপকথা) শুনেছিল হাসেম। তাতে কে যেন কাকে বলেছিল, 'উত্তরে যাইও, পচ্চিমে যাইও, পুবেও যাইও কিন্তুক দক্ষিণে যাইও না।'

পরস্তাবে একটা দিকেই ছিল বিপদ, বাকি তিন দিকে নিশ্চন্তে পা বাড়ানো যেত। হায় হায় রে, খানেদের ভয়ে একটা দিকও আর এদেশে নিরাপদ নেই। উত্তর-পশ্চিমেও তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে কে জানে।

সারা সকাল হাসেমরা হাঁটল আর হাঁটল আর হাঁটল। তারপর দুপুরবেলা চৈত্রের খাড়া রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম যে গ্রামটায় এসে পড়ল সেখানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

গ্রামটার ভেতর থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ আসছে। মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক শকুন উড়ছে। আর দেখা যাচ্ছে শিয়াল। চারপাশের বনজঙ্গলে একটা শিয়ালও আর নেই, সব ওই গ্রামটায় গিয়ে জড়ো হয়েছে।

ভাল করে তাকাতেই হাসেমরা দেখতে পেল, গ্রামটার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পোড়া ঘর-বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। শিয়াল এবং শকুনরা সেগুলো নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করছে।

দুর্গন্ধের কারণটা বোঝা যাচ্ছে—মৃতদেহগুলো গলিত। মানুষের শরীর একদিনে নিশ্চয়ই পচে নি, পচতে পচতে কম করে তিন চার দিন লেগেছে। তার মানে খান সেনারা এখানে আগেই হানা দিয়ে গেছে। অথচ যে গ্রাম থেকে এল হাসেমরা সেখানকার লোকেরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

ভুবন গোঁসাইর মা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'যমেরা এইখানেও আইছিল রে—'

ভিড়ের ভেতর থেকে আরেক জন কে বলে উঠল, 'অয় রে, অয় রে, মাইনষের শরীল!'

হাসেম বলল, 'এইখানে আর খাড়াইয়া থাকতে পারতাছি না, গন্ধে প্যাটের নাড় (নাড়ি) পাক দিতে আছে।'

বাকি সবাই বলল, 'হ-হ, লও যাই—'

সড়কের ডান ধারে গ্রাম, বাঁ ধারে ফাঁকা মাঠ। হাসেমরা মাঠে নেমে সড়ক থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে হাঁটতে লাগল।

দূরে যাওয়ার জন্য গন্ধটা তেমন করে নাকে লাগছে না। মাঝে মাঝে এককেটা ঝলক বাতাসে ভেসে আসছে শুধু।

সড়কেব ডান ধারে গ্রামের পর গ্রাম। দূর থেকে গ্রামগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে অস্পষ্টভাবে টের পাওয়া যায়। তবে যা দেখা যাচ্ছে তা হল লাখ লাখ শকুন, গ্রামগুলোর মাথায় সেগুলো উড়ছে।

হাসেমরা বুঝতে পারছিল, খানের বাচ্চাবা এদিকের গ্রামের পব গ্রাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের পর হাসেমরা একটা ফাঁকা হাটে এসে পেঁছিুল। কেউ কোথাও নেই, নির্জন হাটে অসংখ্য চালা সারিবন্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

সেই সকাল থেকে হাসেমরা হাঁটছে। আর পারছিল না তারা, হাত-পা ভেঙে আসছিল যেন। শরীরের সব শক্তি তাদেব যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রসময় বলল, 'আইজ রাইতটা এইখানের কাটাইয়া দেই। কাইল সকালে উইঠা আবাব দেখা যাইব।'

অন্য সবাই বলল, 'হ-হ, শরীলে আর দিতে আছে না।

কাল রাতে যে গ্রামে ওবা ছিল সেখানকার মুক্তিফৌজরা আজ সকালে কিছু মুড়ি দিয়ে দিয়েছিল। তা-ই অল্প অল্প খেয়ে বাকিটা পরের দিনের জন্য রেখে সবাই খোলা হাটের চালায় মাটির ওপব শুয়ে পড়ল।

কালকের মতো আজও দিগন্তের তলা থেকে একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। তবে জ্যোৎস্না আগের দু দিনের মতো অত উজ্জ্বল না। পূর্ণিমার চাঁদ যত দিন যাচ্ছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে।

হাসেম ফুলবানুর কাছেই শুয়েছে। চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোয় সে ফুলবানুকে দেখতে লাগল।

আজও জ্ঞান ফেরেনি মেয়েটার। সারাদিন রোদে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে ফুলবানু। তার ওপর খাওয়া নেই দাওয়া নেই, মুখ শুকিয়ে একেবারে একটুকু হয়ে গেছে। হায় রে হায়, যাকে একদিন পরস্তাবের হুরী-পরী বলে মনে হয়েছে, তার চেহারা ভেঙেচুরে কি হয়ে গেছে!

'আর বুঝি তুমারে বাঁচাইতে পারলাম না ফুলবানু, বাচাইতে পারলাম না—' রোজকার মতো আজও বলতে বলতে আর ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল হাসেম।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, কে জানে। হঠাৎ কাদের চেঁচামেচিতে ধড়মড় করে উঠে বসল হাসেম। দেখল ভুবন গোঁসাইর মা, কুলসম, রসময়—তাদের দলটার সবাই জেগে উঠেছে। আর মীরপুর-নবীগঞ্জের একটা লোক, তমিজদ্দি তার নাম, সমানে চিৎকার করছে। তার ডান পায়ের উরুর কাছটা খোবলানো। সেই ক্ষত থেকে গল গল করে রক্ত পড়ছে।

উদ্বেগের গলায় হাসেম জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?'

কে যেন বলল, 'তমিজদ্দিরে শিয়ালে কামড়াইছে।'

'শিয়াল!'

'হ হ, শিয়াল। উই যে—' যে বলছিল, সামনের দিকে সে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

হাসেম দেখতে গেল, তাদের চালাগুলো থেকে খানিকটা দূরে আট-দশটা শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় জন্তুগুলোর চোখ জ্বল জ্বল করছিল।

রসময় মুখের ভেতর একটা শব্দ করে তাড়া লাগাল, 'এই হালারা, হট্—হট্—'

জন্তুগুলোর ভয়ডর নেই, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মানুষদের দেখতে লাগল।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'কি সব্বনাইশা কাণ্ড! শিয়ালে তাজা মানুষ খাইতে আসে এমুন তাজ্জব কথা বাপের জন্মে শুনি নাই।'

মীরপুর-নবীগঞ্জের একটা লোক বলল, 'ঘুমাইয়া আছিলাম। আমরা মড়া না জ্যাতা (জীবন্ত) বুঝতে পাবে নাই। দ্যাশ ভরা খালি মড়া আর মড়া। মড়া খাইয়া খাইয়া হালার পুতেগো জিভ্যা বাইড়া গ্যাছে।'

রসময় আবার বলল, 'কি সাহস শয়তানের ছাওগো, খেদাইলে যায় না। র' হালারা—' বলেই খুঁজে পেতে একটা বাঁশের টুকরো জোগাড় করে ছুঁড়ে মারল। এবার শিয়ালগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সবার কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে শুনতে হাসেম ভাবতে লাগল, তমিজদ্দিকে না কামড়ে শিয়ালটা যদি ফুলবানুকে কামড়াত!

হায় হায় রে, ফুলবানুর তো জ্ঞান নেই। সে চিৎকার করে কাউকে জানাতে পারত না। জন্তুগুলো তাকে খেয়ে হাড় ক'খানা ফেলে রেখে চলে যেত। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল হাসেম।

বাকি রাতটা আতঙ্কে কেউ আর ঘুমোতে পারল না, হাটের চালায় জেগেই কাটিয়ে দিল।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে হাসেমদের বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যেতে লাগল।

কাল তারা যেখানে রাত কাটিয়েছে সেখান থেকে পঞ্চাশ হাতও হবে না, সারি

সারি অনেকগুলো কবর। দেখেই টের পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়ে সেগুলোর ভেতর কয়েক শ', নাকি কয়েক হাজার করে মৃতদেহ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মাটি ভালভাবে চাপা দেওয়া হয়নি। ফলে চারদিক দিয়ে অনেক হাত, পা, মাথা এবং শরীরের অন্য অন্য অংশ বেরিয়ে আছে। কিংবা এ-ও হতে পারে শিয়াল কিংবা অন্য জন্তুরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মড়া বার করেছে।

হাসেমরা আরো দেখতে পেল, অসংখ্য শিয়াল কবরগুলোর চারধারে টহল দিচ্ছে। চারপাশের গাছগুলোর পাতা দেখা যায় না, শুধু শকুন আর শকুন। সারা রাত তারা বোধ হয় ওখানে বসে ছিল। এখন সকালের আলো ফুটতে ডানা মেলে ঝপাঝপ নেমে আসছে।

কাল আবছা চাঁদের আলোয় এসব দৃশ্য চোখে পড়ে নি। হাসেমরা বুঝতে পারে নি কোথায় কিসের পাশে তারা রাত কাটাতে এসেছে।

ভুবন গোঁসাইর মা দু-হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল, 'তরাতরি এইখান থনে ল (চল)। আমি আর সইতে পারতাছি না।'

শুধু ভুবন গোঁসাইর মা-ই না, সহ্য কেউই করতে পারছিল না। সবার শিরা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। শূন্য হাটের চালা পেছনে ফেলে টলতে টলতে ওরা সামনের সড়কে গিয়ে নামল।

তারপর তিন দিনে ওরা তিরিশটা গ্রাম পেরুল কিন্তু একটা জীবন্ত মানুষেরও দেখা পাওয়া গেল না।

তিরিশটার ভেতর পনেরটা গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্রাম-জোড়া সেই সব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে অগুণতি মৃতদেহ। মরা মানুষের শরীর ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক শিয়াল ঘুরছে আর মাথার ওপর হাজার হাজার শকুন চক্কর দিচ্ছে। নহরপুর থেকে বেরুবার পর অনবরত এই দৃশ্যই তো দেখে আসছে হাসেমরা।

পনেরটা গ্রামের তো এই দশা। বাকি পনেরটা অবশ্য পোড়ে নি, তবে সেখানে লোকজন বলতে কেউ নেই, খানেদের ভয়ে বাড়িঘর ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে।

হাসেমরা শেষ ভাত খেয়েছিল মুক্তি ফৌজদের গ্রামে। ওরা সঙ্গে কিছু মুড়ি দিয়ে দিয়েছিল। সেই মুড়ি ক'টা কবেই শেষ হয়ে গেছে।

এই তিন দিনে চকের ক্ষীরাই আর বাঙ্গি (ফুটি) ছাড়া হাসেমদের কিছুই জোটেনি। ওই খেয়ে কি মানুষ প্রাণে বাঁচে?

সবাই খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। হাত-পা-বুক-মাথা ভয়ানক টলছিল, ওদের কেউ আর ঠিক মতো কাইক ফেলতে পারছিল না। এলোমেলো দুর্বল পা ফেলে ফেলে কোনরকমে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল।

কে একজন বলে উঠল, 'আর পারুম না, চাউরগা ভাত না পাইলে মইরা যামু।'

আরেক জন বলল, 'খানেগো গুলির ডরে পলাইলাম, অহন না খাইয়া উপাস দিয়া মরতে হইব।'

অন্য একজন বলল, 'তিন দিন ধইরা হাটতে আছি, এট্টা তাজা মাইনষের মুখ দেখি নাই। সারা দ্যাশে যদি কুনো মানুষ বাইচা না থাকে, কে খাইতে দিব? কার কাছে আশ্রয় পামু?'

রসময় বলল, 'তাব থিকা যে যেইখান থন আইছি, হেইখানেই ফিরা যাই। কপালে যা আছে তাই হউক। পরানে বাচনের লাইগা পাগলের নাহান কই চলছি কিছুই বুঝি না।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'ফিরা আর যাওন হইব না। ছয় দিন ধইরা হাটতে আছি, ফিরতে আবার ছয় দিন লাগব। এই ছয় দিন খাবি কী?'

'তাইলে?'

'সুমুখেই আউগাইয়া যাইতে হইব। সুমুখে যদি কিছু না মিলে তভু যাইতে হইব। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

ওরাহাটতেই থাকে। সবার হাল যেমন তেমন। কিন্তু হাসেম, ফুলবানু, তমিজদ্দি আর কুলসমের দিকে তাকানো যায় না। তমিজদ্দির শিয়ালে কামড়ানো উরুটা ফুলে পেকে দুলিযে উঠেছে। সেই সঙ্গে আরেক উপসর্গ, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে খুঁড়িযে খুঁড়িয়ে টলতে টলতে খানিকটা হাঁটে তমিজদ্দি। দশ বিশ কাইক যেতে-না-যেতেই তাকে ফুলবানুব পাশে ডুলিতে তুলে নেয় হাসেম। ফুলবানুর জ্ঞান এখনও ফেরেনি। রোদে রোদে আরো শুকিয়ে আরো কালো হয়ে গেছে ফুলবানু। এক এক সময় হাসেমের মনে হয়, মেয়েটা বোধহয় বেঁচে নেই। তখনই চমকে উঠে একটা হাত ফুলবানুব নাকের কাছে নিয়ে আসে। নাঃ, এখনও তির তির করে শ্বাস পড়ছে। 'এট্টা ডাক্তার যদি পাইতাম! হায় খোদা, এট্টা ডাক্তার যদি মিলাইয়া দিতা!' নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলে যায় হাসেম।

এরপর কুলসমের কথা: খানের বাচ্চারা তার সোয়ামীকে মেরেছে, ছেলেমেয়েদের মেরেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। সেই শোক তো আছেই, তার ওপর আছে দশ মাস গর্ভের ভার। না খেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা ঘোরের মধ্যে সে সবার সঙ্গে হাঁটছিল। তাকে দেখে মনে হয়, খুব বেশিক্ষণ কুলসম আর হাঁটতে পারবে না। তার বাঁচবার ইচ্ছা, শরীর এবং মনের শক্তি—সব ফুরিয়ে গেছে।

আর হাসেম নিজে? কুলসমের ডুলির একটা বাঁশ প্রথম দিকে গহরদ্দি কাঁধে নিয়েছিল, তারপর রসময়। একা রসময় না, কিছুক্ষণ পর পরই ওদিকটায় কাঁধ বদল হয়েছে। হাফেজ, আলতাফ, নিবারণ, আনিসুর, হাচাই পাল, কত লোক যে ওধারটা কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু এদিকের বাঁশটা কাউকে ছাড়ে নি হাসেম, ছ'দিন ধরে সমানে বয়ে আসছে। তার ফল হয়েছে এই, দু কাঁধের মাংসে মস্তবড় গর্ত হয়ে

গেছে। মনে হচ্ছে দুটো হাতই তার যে কোন সময় ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

তিন দিন তিন রাত হাঁটবার পর ওরা বিরাট এক নদীর পাড়ে এসে পেঁছিুল।

নদীটার ওপার দেখা যায় না, অনেক দূরে আবছা ধূ ধূ একটা দাগের মতো মনে হয়।

এখন দুপুর। চৈত্রের ঝকঝকে রোদে নদীর ঢেউ জ্বলছিল। কালো কালো বিন্দুর মতো ক'টা নৌকো ছাড়াছাড়া ভাবে নদীময় ছড়িয়ে আছে।

ককানির মতো শব্দ করে কে বলে উঠল, 'এই আমরা আইলাম বই?'

আরেক জন বলল, 'আর তো আউগানের জাগা নাই। এলায় (এবার) কী করন?'

অন্য একজন বলল, 'হয় নদী পার হইতে হইব নাইলে গেরামে ফিরা যাইতে হইব।'

এইসময় রসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'উই—উই দ্যাখ—'

সবাই দেখল, এখান থেকে প্রায় সিকি মাইল উজানে পঞ্চাশ ষাটটা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোক সেগুলোর পাটাতনে বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে, ওরা এখনই নৌকো ছেড়ে দেবে।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অরা কারা?'

'আমাগো দ্যাশের মানুষই মনে লাগে।'

'খানেরা না তো?'

'না।'

'ভাল কইরা দ্যাখ। আমার চোখে ছানি পড়ছে, খুয়া খুয়া (আবছা আবছা) দেখি, দূরের জিনিস ঠাওর পাই না।'

হাসেম বলল, 'না-না, অরা খানের ছাও না। আমাগো নাহান চাষাবাসী গিরস্ত মানুষ। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'খান হইলে নায়ে উঠত না। অরা পানিরে জবর ডরায়। পানি অগো যম।'

একটু ভেবে ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অরা যায় কই?'

হাসেম বলল, 'না জিগাইলে জানুম ক্যামনে?'

'জিগা—জিগা—'

হাসেম কিছু বলবার আগেই দশ বারো জন চিৎকার করে উঠল, 'ভাইজানেরা এট্টু খাড়াও গো—এট্টু খাড়াও—'

নৌকোর লোকগুলো এদিকে ফিরল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ক্যান?'

'কামের কথা আছে।'

'আসো তাইলে। তরাতরি—'

কিছুক্ষণের মধ্যে হাসেমরা নৌকাগুলোর কাছে পেঁছে গেল। সামনে আসতে দেখা গেল নৌকোর লোকগুলোর চেহারা তাদেরই মতো—সন্ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত।

লোকগুলো জিজ্ঞেস করল, 'তুমরা কুনখানকার মানুষ?'

হাসেমরা বলল, 'গিরিগঞ্জ বন্দরের নাম শুনছ?'

সবাই শোনে নি। দু' চারজন শুনেছে। তারা বলল 'হ-হ, হেই ধলেশ্বরীর পাড়ে—দুই একবার গেছি।'

'আমরা হেই দিক থন আইতে আছি।'

'উই ধারে কিছু হইছে?'

'হায় হায় রে, হয় আবার নাই!'

'কী হইছে?' পঞ্চাশ ষাটটা নৌকোর সব লোক উদ্বিগ্ন মুখে হাসেমদের দিকে তাকাল।

কী হয়েছে, সব বলল হাসেমরা। তারপর কিভাবে শুধু প্রাণটুকু হাতে নিয়ে তারা এই নদীর পাড় পর্যন্ত পেঁছেছে, সে কথা বলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমরা কুনখান-কার মানুষ?'

নৌকোর লোকগুলো জানাল, হাসেমরা যে পথ দিয়ে এসেছে তার পাশে যে পনেরটা গ্রাম এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে তারা সেখানকার মানুষ। তিন দিন আগে খানেরা এদিকে হানা দিয়েছিল, তাদের দেখেই তারা জঙ্গলে পালিয়েছিল। তিনদিন জঙ্গলে কাটিয়ে এখন নৌকোয় করে চলে যাচ্ছে।

'কই যাইতে আছ?'

'নদীর উইপারে তো আগে যাই। হের পর দেখা যাইব।'

হাসেমরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ঠিক করল ওপারেই চলে যাবে। বলল, 'আমাগো তোমাগো নায়ে নিবা (তোমাদের নৌকোয় আমাদের নেবে)?'

'নিয্যস নিমু (নিশ্চয়ই নেব)। সগল জাইনা-শুইনা তোমাগো ফালাইয়া যাইতে পারি? আসো—'

প্রতিটি নৌকোয় এক আধজন করে হাসেমদের সকলের জায়গা হয়ে গেল। নৌকোয় উঠে ওরা দেখতে পেল, লোকগুলো খালি হাতে-পায়ে তাদের মতো এক কাপড়ে যাচ্ছে না। বাক্স-বিছানা, হাঁড়ি-পাতিল, চাল-ডাল, বাসন-কোসন বদনা-সানকি—পাড়ি দেবার আগে যে যা পেরেছে সব নৌকোয় তুলে নিয়েছে।

হাসেমরা ওঠার পর নৌকোগুলো ছেড়ে দিল।

পাড় থেকে খানিকটা যাবার পর হাসেম বলল, 'নদীখানের নাম কী?'

'পদ্মা।'

আরো খানিকক্ষণ যাবার পর তাদের নৌকোর একটা বুড়োমতো লোককে হাসে

বলল, 'একখান কথা কমু ?'

বুড়ো বলল, 'কও না—'

ভয়ে ভয়ে হাসেম বলল, 'তিনদিন আমাগো প্যাটে ক্ষীরাই আর বাঙ্গি ছাড়া কিছুই পড়ে নাই। দুগা ভাত না পাইলে এইবার যে মরি।'

'আমাগো লগে চাউল আছে, নদী পার হইয়া ভাত বসামু, তহন আমাগো লগে খাইও। আমরা খামু আর তুমরা চাইয়া থাকবা, হে তো হয় না।'

বিশাল নদী পার হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল। ওপারে নৌকোগুলো যেখানে গিয়ে 'লগি' পুঁতল সেটা ছোটখাটো একটা গঞ্জমতো জায়গা।

গঞ্জের দোকানগুলোতে টিমটিম করে হেরিকেন জ্বলছিল। হাসেমরা নৌকো থেকে উঠে এসে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করল, এধারে কোন গোলমাল হয়েছে কিনা।

দোকানদাররা জানাল এখনও কিছু হয় নি। তবে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে কোন সময় খানেরা এসে পড়তে পারে।

নাঃ, এই দুনিয়ায় খানেদের পাল্লার বাইরে একটুও জায়গা নেই। তা হলে তারা কোথায় যাবে ? কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে ?

গঞ্জের দোকানদাররা জিজ্ঞেস করল, নদীর ওপার থেকে তারা চলে এল কেন ? কেন আসতে হয়েছে, হাসেমরা জানাল।

দোকানদাররা এবার বলল, 'আমাগো এইদিকের মেলা মানুষ পলাইয়া গ্যাছে। দুই একদিনের ভিতরে আমরাও যামু গা।'

'কই যাইবেন ?'

'দেখি কই যাই—'

তারপর হাসেমরা আর নৌকোর সেই লোকগুলো নদীর পাড় ঘেঁষে মাটি খুঁড়ে কাঠকুটো দিয়ে উনুন ধরাল, ভাত বসাল।

এক ফাঁকে হাসেম গিয়ে ভুবন গোঁসাইর মা'র জন্য দোকানদারদের হাতে-পায়ে ধরে চেয়ে চিন্তে খানিকটা খই নিয়ে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই পরামর্শ করে ঠিক করল এখানে তারা থাকবে না, কাল সকালে উঠেই রওনা হবে। একটা নিরাপদ আশ্রয় তাদের চাই-ই।

পদ্মার পাড়ে রাত কাটিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল। নৌকোর সেই লোক-গুলো তাদের বাক্স-টাক্স হাঁড়ি পাতিল মাথায় চাপিয়ে হাসেমদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

হাসেমরা সংখ্যায় ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ জন। তাদের সঙ্গে আরো ছ' সাতশ লোক যোগ হয়েছে।

দুপুরবেলা একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ভাত রেঁধে খেয়ে একটু জিরিয়ে আবার ওরা চলতে লাগল। তারপর বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিমের গাছগাছালির ওপর

ঝুঁকে পড়েছে সেইসময় হঠাৎ ভুবন গোঁসাইর মাকে জড়িয়ে ধরে গোঙানির মতে শব্দ করে টলতে টলতে বসে পড়ল কুলসম। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখ নীলবণ হয়ে গেছে, ঠোঁটদুটো থরথর করছে।

কুলসমের গোঙানির আওয়াজ যারা শুনেছে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাদে দেখাদেখি অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাসেম কাঁধ থেকে ডুলি নামিয়ে বলল, 'কী হইছে ঠাউরমা ?'

অভিজ্ঞ চোখে একপলক কুলসমকে দেখে খুব ব্যস্তভাবে বুড়ি পাশের দুটে বউকে বলল, 'মাইয়াগারে ধরো তো—'

ভুবন গোঁসাইর মা আর সেই বউদুটো কুলসমকে ধরাধরি করে কাছের শরবনে নিয়ে গেল। হাসেম এবং আরো দু'চারজন ওদের সঙ্গে যাচ্ছিল। ভুবন গোঁসাই মা ধমকে উঠল, 'আক্কল নাই রে তগো। পুরুষ মাইনষের এই সোমায় (সময় যে আইতে নাই।'

বুকভর্তি উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর শরবনে ভেতর থেকে আকাশ-ফাটানো ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে নতুন জন্মের ঘোষণা শোনা গেল। কুল সমের বাচ্চা হয়েছে। আরো খানিকটা পর সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার যখন ঘ হয়েছে সেই সময় শরবন থেকে ওরা বেরিয়ে এল। বউদুটো নির্জীব অসাড়-দে কুলসমকে কোলে করে নিয়ে এসেছে, আর বাচ্চাটা রয়েছে ভুবন গোঁসাই মা' বুকের ভেতর। বুড়ি বলল, 'অহন কী করন ? এই অবস্থার তো কুলসমকে হাটাইয়া লওন যাইব না।'

রসময় বলল, 'পাগল ! অরে ডুলিতে ফুলবানুর কাছে শোয়াইয়া দ্যান।'

হাসেমও বলল, 'হেই ভাল।'

ধরাধরি করে বউদুটো কুলসমকে ডুলিতে তুলে দিল।

আবার সাত আটশ' মানুষের জনতা চলতে লাগল। যেতে যেতে কুলসমে দিকে তাকিয়ে বার বার মুধাপাড়ার জহীরের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল হাসেমের। কোথায় কতদূরে কোন নহরপুরে মরে পড়ে থাকল সে, আর কোথায় শরবনে তা সন্তান জন্ম নিল !

ওদিকে ভুবন গোঁসাইর মা'র বুকের ভেতর একটানা কেঁদেই চলেছে বাচ্চাটা। সে যে এসেছে এই খবরটা দুনিয়ার সবাইকে না জানানো পর্যন্ত বোধহয় থামবে না।

॥ আট ॥

আরো তিন চারটে দিন কাটল।

জ্বালিয়ে-দেওয়া গ্রাম, হাজার হাজার মরা মানুষ, শিয়াল, শকুন এবং পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে হাসেমরা চলছে তো চলেছেই।

ওরা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে, জানে না। শুধু একটা ব্যাপার ওদের জানা আছে, সামনেই তাদের এগুতে হবে, ফেরা আর চলবে না।

এই ক'দিনে কুলসম খানিকটা সুস্থ হয়েছে। মাঝে মাঝে ডুলি থেকে নেমে পড়ে সে, তবে বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। বিশ পঞ্চাশ কাইক গিয়েই আবার ডুলিতে ওঠে। তার বাচ্চাটা সারা দিনরাত ভুবন গোঁসাইর মা'র কোলেই থাকে, শুধু খাওয়ানোর সময় বুড়ি তাকে কুলসমের কাছে দেয়। বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদুনে হয়েছে। যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই সে শান্ত, নইলে বাকি সময়টা কেঁদে কেঁদে সবাইকে, বিশেষ করে ভুবন গোঁসাইর মাকে ঝালাপালা করে দিচ্ছে। বুড়ি তাকে ভোলাতে ভোলাতে বলে, 'কী কান্দইনা (কাঁদুনে) পোলা রে তুই!'

ফুলবানুর জ্ঞান ফেরেনি, তবে এখনও সে বেঁচে আছে।

সবচেয়ে বিপদ হয়েছে তমিজদ্দিকে নিয়ে। শিয়ালের কামড় খেয়ে তার পা দুনিয়ে ফুলে উঠেছিল, সেই ফোলাটা এখন দু-তিন গুণ বেড়ে গেছে। ঘা থেকে সবুজ রস গড়াচ্ছে। তার ওপর জ্বর। জ্বরের তাড়সে তমিজদ্দি চোখ মেলতে পারছিল না। এই অবস্থায় তার পক্ষে হাঁটাও সম্ভব না। মীরপুর-নবীগঞ্জের ক'টা লোক তাকে কাঁধে নিয়ে চলেছে।

পদ্মার পাড় থেকে হাসেমরা কখনও কাঁচা রাস্তা, কখনও বা চকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ একটা পাঁচঢালা বড় সড়কে এসে উঠল।

সড়কটা ধরে এক দুপুর হাঁটবার পর ওরা একটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল। আর সেই সময় দূরে ট্রাকের গাঁক গাঁক আওয়াজ শোনা গেল।

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন ভয়ার্ত সুরে বলল, 'খানেরা আইতে আছে নিহি?'

রসময় চেঁচিয়ে বলল, 'য্যারাই হউক, সড়কে আর খাড়াইয়া থাইকো না, উই ঝোপরার (ঝোপের) ভিতরে লও।'

রাস্তার ধারেই নলখাগড়ার বন। হাসেমরা লাফ দিয়ে তার ভেতরে ঢুকে গেল। গায়ের ওপর নানারকম পোকামাকড় উড়ে উড়ে বসছে, কামড়াচ্ছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শরীর টেনে টেনে সাপ চলে যাচ্ছে। তবু কারো নিঃশ্বাসের শব্দ নেই। দম বন্ধ করে হাসেমরা অসাড় দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই চুপচাপ। কিন্তু কুলসমের বাচ্চাটা পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে এইসময় এমন কান্না জুড়ে দিল যে আর থামে না। ভুবন গোঁসাইর মা অনেক করেও যখন তাকে শান্ত করতে পারল না সেই সময় কুলসম বলল, 'আমার কুলে (কোলে) দ্যান দেখি ঠাউবমা—'

কোলে নিয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াতে গেল কুলসম, কিন্তু সে কিছুতেই খাবে না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে শুধু চেঁচাতেই থাকে।

এদিকে ট্রাকের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে। চারদিক থেকে ফিস ফিস করে সন্ত্রস্ত গলায় সবাই বলতে লাগল, 'পোলা থামাও, 'পোলা থামাও। যদি ওইগুলো খানেগো গাড়ি হয় কান্দনের শব্দে এইখানে থামব। হের পর কী যে হইব ভাবতে পারতাছি না। পোলা সামাল দ্যাও '

নলখাগড়ার ঝোপ ফাঁক করে হাসেম সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। ট্রাকগুলো খানিকটা দূরে থামতেই সে চিনে ফেলল—মিলিটারি গাড়ি। চাপা গলায় হাসেম বলল, 'খানেরাই আইছে। পোলা থামাও জহীরের জরু।'

'পোড়া কপাইলা পোলা- ' বলেই বাচ্চাটার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল কুলসম।

একটু পরেই মিলিটারি ট্রাকগুলো নলখাগড়া বনের পাশ দিয়ে গাঁ গাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোন দিকে গেল, কে জানে।

গাড়িগুলো চলে যাবার পরও অনেকটা সময় হাসেমরা নলখাগড়া ঝোপের ভেতরই বসে থাকল। তারপর বেশ রাত হলে আবার সড়কে উঠে এল। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করে ওরা ঠিক করল, সড়ক দিয়ে হাঁটা ঠিক হবে না, খানের বাচ্চারা গাড়িতে ঘোরাফেরা করে, যে কোন সময় তাদের মুখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

হাসেমরা ফের সড়ক থেকে নেমে নলখাগড়া ঝোপের পাশ দিয়ে চকে গিয়ে পড়ল। তারপর আবার নতুন করে পাড়ি।

কুলসমের বাচ্চাটা অনেকক্ষণ কাঁদছে না। কোনরকম নড়াচড়া বা সাড়াশব্দ—কিছুই করছে না। মায়ের কোলে চুপচাপ শুয়ে আছে।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, তর পোলাটা তো বড় লক্ষ্মী হইয়া গ্যাছে কুলসম ওইটুকু ছাওটাও বুঝছে খানেরা আইলে চুপ কইরা থাকতে হয়।'

কুলসম উত্তর দিল না।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলল, 'দে, তর পোলাটারে আমার কুলে দে—'

কুলসম ছেলে দিল না, কিছু বললও না।

জন্মের পর থেকেই বাচ্চাটা ভুবন গোঁসাইর মা'র কোলে কোলে আছে। ছেলে বায়না ধরলে চাইবার আগেই কুলসম কতবার বুড়ির কোলে গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু এখন সাতবার চেয়েও বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে না। বুড়ি তাড়া দিল, 'কী হইল তর?

দে—' বলেই হাত বাড়াতে গিয়ে বাচ্চাটাব গায়ে ঠেকে গেল। তক্ষুণি চমকে উঠল ভুবন গোঁসাইর মা। বাচ্চাটার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। নিজের অজান্তেই বুড়ির হাত তার নাকের কাছে চলে গেল। নাঃ, নিশ্বাস পড়েছে না। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল বুড়ি, 'এই কী সর্বনাশ কবছস নিঃবংশী, পিছাকপালী!'

কুলসম শূন্যে চোখে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী করুম, খানগো ডরে অর কান্দন থামানোব লাইগা মুখে হাত চাপা দিছিলাম, হের পর দেখি আর লড়েও না, উয়াসও (শ্বাসও) লয় না। বুঝলাম মইবা গ্যাছে।

'অয় রে মায়ের পরাণ! তুই মা, না রাইক্ষসী!' বলেই ঠাস করে কুলসমের গালে এক চড় মেরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ভুবন গোঁসাইব মা। তাব হাতেই বাচ্চাটা জন্মেছে। এ ক'দিন নাড়াচাড়া করে শিশুটাব ওপর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল।

কুলসম আগেব মতোই ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল। খুব আস্তে করে বলল, 'পোলারে না মাবলে এতগুলান মানুষ যে বাচত না ঠাউরমা—' সে কাঁদছিল না ভেতরকাব কি এক উত্তাপে তাব চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে।

কুলসমেব কথা শেষ হতে না হতেই এক হ্যাঁচকা টানে ভুবন গোঁসাইর মা'র কান্নাটা থমকে গেল। সাত আট শ'লোকের জনতাব ওপব অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো চকেব ওপর দিয়ে ওবা এগিয়ে চলল।

কুলসম বাচ্চাটাকে কারো হাতেই দিল না। যে সন্তানকে সে নিজেব হাতে শেষ করেছে তাব শক্ত অসাড় শরীর কোলে করে সবার সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

॥ নয় ॥

আরো দু'দিন পব ওবা একটা জীবন্ত মানুষেব গ্রামে পৌঁছল।

চক থেকে হাসেমবা সবে গ্রামে উঠেছে, চারদিকের ঝোপ জঙ্গল থেকে অনেকগুলো অল্পবয়সী ছেলে, হাতে বন্দুক, উঠে এল।

আগেও দু-একবাব ছেলেদের এইরকম বন্দুক হাতে গ্রাম পাহাবা দিতে দেখেছে হাসেমরা। এরা মুক্তিফৌজ।

মুক্তিফৌজেব ছেলেবা জানতে চাইল, তারা কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে? হাসেমরা জানাল, কোত্থেকে আসছে। গন্তব্য কোথায় তা অবশ্য বলতে পাবল না। তাদের গ্রামগুলোর কী অবস্থা হয়েছে, কিভাবে মৃত্যু আগুন হত্যা ধ্বংস শিয়াল-শকুনের ভেতর দিয়ে তাবা দিনের পর দিন পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছে, সে সবের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে হাসেমরা বলল, 'এমন এক জায়গা আমবা যাইতে চাই যেখানে গ্যালে পরানে বাচতে পারুম।'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা বলল, এ-জায়গাটা আদৌ নিরাপদ না, খানেরা এক বার এসে সুবিধে করতে পারে নি। নিশ্চয়ই তারা আবার হানা দেবে। সে যাক গে, দিনের পর দিন হাসেমরা হেঁটে আসছে। আপাতত আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করুক। বিশ্রামই শুধু, এত লোককে তারা খাওয়াতে পারবে না। কেননা এখানে কারো ঘরেই বিশেষ চাল-ডাল নেই। চারদিকের গ্রাম গঞ্জে যত ধান-চাল ছিল, খানেরা আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তার ফলে এ অঞ্চলে মোটামুটি একটা দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা চলছে। কোথাও একদানা খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই লোকগুলো, যাদের নৌকোয় পদ্মা পেরিয়েছিল হাসেমরা, বলল, 'আমাগো লগে চাউল আছে। থাকতে দিলেই চলব, খাওনেরটা আমরা ব্যবস্থা কইরা নিমু।'

'তাইলে আর কি—'

মুক্তিফৌজের ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের ভেতর গিয়ে প্রথমে ওরা স্নান করে নিল। তারপর রান্না খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে হাসেম বলল, 'একখান কথা কমু?'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা বলল, 'কী?'

'আপনেগো এইখানে ডাক্তার আছে?'

'ক্যান?'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে দেখিয়ে ওদের সব কথা জানিয়ে হাসেম বলল, 'অগো লাইগা'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এই দুইজনরে নিয়া লও আমাগো লগে। বেশি লোক আসবা না, অগো নিতে যে কয়জন লাগে খালি হেই কয়জন।'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে নিয়ে হাসেমরা চার পাঁচজন মুক্তিফৌজের ছেলেদের সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকদূরে একটা ঝুপসি জঙ্গলের ভেতর ঢুকল। কি আশ্চর্য, জঙ্গলের ভেতর সারি সারি দশ-বারোটা তাঁবুর ভেতর ছোটখাটো একটা হাসপাতাল। হাসেম পড়তে পারে না, পারলে দেখতে পেত একটা তাঁবুর গায়ে সাদা কাগজ আঁটা রয়েছে, তাতে লেখা 'আমেদপুর মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল।'

অসংখ্য রুগী চারদিকে গাদা দিয়ে পড়ে ছিল। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মুখ পুড়ে গেছে। তবে বেশির ভাগই গুলিতে জখম হয়েছে। দেখেই বোঝা গেল, খানেদের কীর্তি।

ক'জন ডাক্তার আর নার্স ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছিল। হাসেমদের দেখে এক-জন ডাক্তার এগিয়ে এল। বলল, 'কী হইছে?'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে দেখিয়ে হাসেম বলল, 'এয়াগো দ্যাখেন—'

দু'জনকে পরীক্ষা করে তক্ষুণি ইঞ্জেকসন দিল ডাক্তার। বলল, 'চাইর ঘণ্টা বসতে হইব, আবার ইঞ্জেকসন দিমু।'

হাসেম কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাইয়াটা বাচব তো ডাক্তার সাব?

'হ-হ, বাচব। তয় খুব সাবধানে রাখতে লাগব।'

চারঘণ্টা পর ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে আরেকটা করে ইঞ্জেকসন দিল ডাক্তার। একটা কাগজে খস খস করে কী লিখে মুখে বলল, 'কাইল আরো দুইটা ইঞ্জেকসন দিতে হইব, এই লেইখা দিলাম। তার আগেই মাইয়াটার জ্ঞান ফিরা আসব বইলা মনে হয়।'

কাল তারা কোথায় থাকবে, কোথায় ডাক্তার পাওয়া যাবে, কোথায় ওষুধ -কিছুই জানে না হাসেম। ঘোবের মধ্যে মাথা নাড়ল সে

ফুলবানু আব তমিজদ্দিকে নিয়ে হাসেমরা যখন মুক্তিবাহিনীব ছেলেদের সঙ্গে গ্রামে ফিরে এল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে।

বাকি রাতটুকু কাটিয়ে সকাল হতেই আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। দুপুর পর্যন্ত হেঁটে ওরা পাঁচ সাতটা গ্রাম পেরিয়ে গেল। যে গ্রামের পাশ দিয়েই তারা যাচ্ছে সেখানেই দেখা যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে কিংবা প্যারেড করছে। এদিকটায় মুক্তিফৌজের খুব দাপট।

পাঁচ সাতখানা গ্রাম পেরুবাব পর হঠাৎ হাসেমরা দেখতে পেল খানিক দূরে একটা উঁচু রাস্তার ওপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষের স্রোত চলেছে। তাদের মাথায় ধামা-কুলো, বাক্স-প্যাঁটরা, হাঁড়ি-কুড়ি এবং সংসারের তাবত জিনিস। হাসেমরা যেভাবে ফুলবানুকে নিয়ে চলেছে সেইভাবে ডুলির মতো বানিয়ে অনেকে বুড়ো অথর্ব এবং বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছে।

হাসেমরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুমরা যাও কই ?'

উঁচু রাস্তা থেকে উত্তর এল, 'ইণ্ডিয়ায়।'

ইণ্ডিয়ার নাম অনেক বার শুনেছে হাসেম। সে বলল, হেইখানে যাও ক্যান ?'

'পরানে বাচনের আশায়।'

'তুমরা আইতে আছ কুনখান থনে ?'

কেউ বলল, 'ঢাকার জিলা—' কেউ বলল, 'ময়মনসিং জিলা—' কেউ বলল, 'কুমিল্লা '

'তুমাগো উইদিকে কিছু হইছে ?'

'হয় আবার নাই, খানেরা হগল শ্যাষ কইরা দিছে। তুমরা কুন দিগের মানুষ ?'

হাসেমরা জানাল, তারা কোত্থেকে আসছে তারপর বলল, 'ইণ্ডিয়ায় গ্যালে বাচন যাইব ?'

উঁচু সড়কের লোকেরা বলল, 'হেই রকমই তো শুনছি।'

একটু ভেবে হাসেম বলল, 'ইণ্ডিয়া এইখান থন কদ্দূর ?'

'বেশি দূর না। আমরা বডারের কাছে আইসা গেছি।'

'খাড়াও, আমরাও তুমাগো লগে যামু।'

'আসো—'

হাসেমরা উঁচু সড়কের জনস্রোতে মিশে গেল।

॥ দশ ॥

সন্ধ্যের একটু আগে ইণ্ডিয়ার বর্ডারে পৌঁছে গেল হাসেমরা। আর সেই সময় ডুলির ভেতর চোখ মেলে তাকাল ফুলবানু, আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার গলার ভেতর থেকে দুর্বল, কাতর শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। তার চোখ দেখে মনে হল, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

হাসেম চমকে উঠল। তার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠাউবমা - ঠাউবমা—ফুলবানু চোখ মেলেছে। অর হোঁশ ফিরছে—' রসময় ডুলির ওধারের বাঁশ বইছিল, তাকে বলল, 'লামাও—লামাও, ডুলিখান লামাও—

দু'জনে ডুলি নামিয়ে ফেলল। হাসেম দ্রুত হাঁটু মুড়ে ফুলবানুর মুখের ওপর ঝুঁকল। ভুবন গোঁসাইর মাও হাসেমের পাশে বসে আশায় উদ্বেগে ফুলবানুকে দেখছে।

হাসেম ডাকতে লাগল, 'ফুলবানু— ফুলবানু—'

ফুলবানু শুনতে পেল কিনা কে জানে। ঝাপসা নির্জীব দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজল। কাতর গোঙানির মতো সেই শব্দটা তার গলা থেকে বেরিয়ে আসতেই লাগল।

হাসেম আবার ডাকতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অহন ডাকাডাকি করিস না। চোখ যখন মেলছে আর ডর নাই।'

সেই কবে নহরপুর থেকে তারা বেরিয়েছিল, কখন মাইনকার চর থেকে ফুলবানুর অসাড় প্রাণহীণ দেহ তুলে এনেছিল, হাসেমের মনে নেই। তারপর কত কাল ধরে —দু'দিন, চারদিন, এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ. নাকি দু মাস, চার মাস,তারা মাঠের ওপর দিয়ে, শ্মশানের মতো গ্রাম-গ্রামান্তরের ওপর দিয়ে, মৃত্যু-হত্যা আর রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটছে কিছুই মনে পড়ে না।

এতদিন পর চোখ মেলেছে ফুলবানু, তার জ্ঞান ফিরেছে।

ফুলবানু বাঁচবে—বাঁচবে—বাঁচবে। কথাটা যতবার ভাবল, প্রাণের ভেতর ঢেউ খেলে যেতে লাগল হাসেমের। অনেক অনেক দিন পর বুক ভরে বাতাস টানতে লাগল সে।

চেতলায় সন্দীপার এই বিশাল ঘরটা এক কথায় চমৎকার। পুরু জয়পুরী কার্পেটে মেঝেটা মোড়া। ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালের নীলাভ রঙ চোখকে আরাম দেয়। মাঝখানে ফোমের গদি বসানো সুদৃশ্য খাট। দেওয়াল কেটে আলমারি আর ওয়াড্রোব বসানো হয়েছে। আর আছে ফ্যাশনেবল বুক-কেস। সেটার মাথায় কাচ এবং পোর্সিলিনের দামী দামী কিউরিও। এক কোণে লেখাপড়ার কাজের জন্য টেবল-চেয়ার। এ ছাড়া রয়েছে টেলিফোন, ছোট ডিভান ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তবে ঘরটার আকর্ষণ অন্য জায়গায়। পূর্ব আর দক্ষিণ পুরোপুরি খোলা। পূবের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়বে একটা রাস্তা একেবারে সরলরেখায় সামনের দিকে চলে গেছে। ওদিকটা চিরকালই খোলা থাকবে। পূবের ঐ রাস্তাটা সুন্দীপাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ডাইনে ঘুরে গেছে। সুন্দীপার ঘরের দক্ষিণের ব্যালকনিতে গেলে প্রথমেই তাদের বাগান আর লন চোখে পড়বে। তারপর কমপাউণ্ড ওয়াল। ওয়ালের পর সেই রাস্তাটা। রাস্তার ওপারে বিরাট মাপের একটা পার্ক। কাজেই দক্ষিণ দিকটাও কোন দিন বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই।

সেপ্টেম্বর মাস সবে পড়েছে। বাঙলা ক্যালেণ্ডারের হিসেবে আশ্বিন চলছে। আর কয়েকদিন বাদেই পুজো।

এখন সকাল। সুন্দীপার ঘরের দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়িটায় আটটা বাজতে দশ। বাইরে গলানো গিনির মতো শরতের মায়াবী রোদের ঢল নেমেছে। লনের দেবদারু আর ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি অনবরত ডেকে যাচ্ছে।

অ্যাটাচ্‌ড বাথ থেকে স্নান সেরে এইমাত্র ঘরে এসে ঢুকল সুন্দীপা। তার হাঁটু পর্যন্ত এখন ধবধবে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

প্রায় যান্ত্রিক নিয়মেই সুন্দীপার চোখ ওয়াল ক্লকটার দিকে চলে গেল। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ওয়াড্রোবের কাছে এল।

সুন্দীপার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ কিন্তু অতটা দেখায় না। মাঝারি হাইট। গায়ের রঙ কালোও না, ফর্সাও না। দুইয়ের মাঝামাঝি। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা রেশমের সুতোর মত ঘন নরম চুল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ছোট্ট কপাল তার, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ, ধারাল নাক, সরু কোমর এবং টান টান সুগোল হাত। ত্বক এমনই মসৃণ আর উজ্জ্বল যে মনে হয়, শরীরের ভেতর থেকে একটা স্নিগ্ধ আভা বেরিয়ে আসছে। বড় বড় দীর্ঘ চোখ দুটিতে শান্ত গভীর দৃষ্টি। তাকে ঘিরে এমন এক রুচি, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস আর মর্যাদাবোধের ছাপ রয়েছে যা সর্বক্ষণ তাকে অসাধারণ করে রাখে।

রোজই এই সময় স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ে সুন্দীপা। কিন্তু আজকের দিনটা অন্য সব দিন থেকে একেবারেই আলাদা। আজ দুপুরে মৃন্ময়কে

জানিয়ে দেবে তার কথায় সে রাজী। পুজোর পর যেদিনই বিয়ের তারিখ ঠিক হোক, সুদীপার আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে মনঃস্থির করতে পাঁচটা বছর সময় লেগেছে তার। অথচ মৃন্ময় অসাধারণ ব্রাইট ছেলে। শিক্ষিত, সুপুরুষ, কৃতী। 'সাকসেসফুল ম্যান' বলতে যা বোঝায়, সে তা-ই। চল্লিশের নীচে বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই জীবনে সব দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কোন খুঁত নেই মৃন্ময়ের। তবে বাধাটা ছিল সুদীপার নিজের মধ্যেই। বাধা বলতে দ্বিধা, সংশয় এবং এক ধরনের ভয়ও। সে সব কাটিয়ে উঠতে পাঁচটা বছর লেগে গেল তার। আর এই পাঁচ বছরে এক দিনের জন্যও অসহিষ্ণু হয়নি মৃন্ময়, ধৈর্য হারায় নি। গভীর সহানুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করে গেছে। কিন্তু মৃন্ময়ের কথা পরে।

কাল রাত্তিরে বাবা আর ঠাকুমাকেও নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে সুদীপা। দু'জনেই খুব খুশী হয়েছেন। এ জন্য ওঁরাও অনেক দিন থেকেই উন্মুখ হয়ে ছিলেন। বাবা আর ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ নেই তার।

এস্রাজে মৃদু ছড় টানার মতো আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকেই সুদীপার বুকের গভীরে অবিরাম কী যেন বেজে যাচ্ছে। বড় ভাল লাগছে তার।

আস্তে আস্তে ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে ফেলল সুদীপা। হ্যাঙ্গারে শাড়ি, ট্রাউজার্স, সালোয়ার, কামিজ, চুস্ত, হাউসকোট, কাপ্তান' ম্যাক্সি— এমন নানা ধরনের 'অগুনতি' পোশাক ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে একটা নতুন জীনস্ আর শার্ট বার করল সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুদীপা প্রথমে যাবে ক্যামাক স্ট্রীটে তাদের অফিসে। লাঞ্চ ব্রেক পর্যন্ত সেখানে কাজ করার পর মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা হবে। তার যে ধরনের কাজ তাতে শাড়িটাড়িতে ভীষণ অসুবিধা। ট্রাউজার্স বা সালোয়ারে অনেক ফ্রী লাগে।

আচমকা পেছন থেকে কার গলা ভেসে এল, 'রঞ্জু—'

সুদীপার আদরের নাম, রঞ্জু। ঐ নামেই বাবা আর ঠাকুমা তাকে ডাকেন। ইদানীং দু'একবার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে মৃন্ময়ের মুখেও ওটা শোনা গেছে।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুদীপা। দূরে দরজার কাছে ঠাকুমা হেমনলিনী দাঁড়িয়ে আছেন। আশির কাছাকাছি বয়স কিন্তু এখনও পিঠ বেঁকে যায় নি। গায়ের রঙ একসময় ছিল স্বর্ণাভ। কুঁচকে কুঁচকে চামড়া এখন সোনার জালি হয়ে গেছে। যৌবনে মারাত্মক রূপসী ছিলেন। ধ্বংসাবশেষ যেটুকু আছে, তাতেও চোখ ফেরানো যায় না। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা ধবধবে সাদা চুল। পরনে দুধ-রঙ গরদ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে।

সুদীপা অবাকই হয়ে গেল। এই সকালবেলায় ঠাকুমা কখনও চেতলায় তার ঘরে আসেন না। উনি আর বাবা এ সময়টা একতলার ডাইনিং রুমে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সুদীপা ব্রেকফাস্ট করে না বেরুনো পর্যন্ত ওঁরা সেখানে বসে তাকে সঙ্গ দেন।

সন্দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে ঠাকুমা?'

হেমনলিনী বললেন, 'নিশ্চয় কমু। তর হাতে ঐগুলান কী? সাহেবগো জামা-পেন্টুল না?' দেশ ভাগের অনেকে সেই নাইনটীন ফর্টি ফর্টিওয়ানে পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছিলেন তিনি। তারপর পুরো চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এতদিনেও এপার বাঙলার ভাষাটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারলেন না। তাঁর জিভে ফরিদপুর জেলাটা এখনও অনড় হয়ে আছে। শাড়ি-ধুতি বাদে তাঁর কাছে আর সব কিছুই সাহেব-মেমদের পোশাক।

হেমনলিনীর বলার ভঙ্গি নকল করে রগড়ের গলায় সন্দীপা বলল, 'হ, সাহেবগো জামা-পেন্টুল।'

'আমি জানতাম এইগুলি পইরা তুই আইজও বাইর হবি। তাই উপরে উইঠা আইলাম।' হেমনলিনী বলতে লাগলেন, 'আইজ এমুন একটা দিন! পুরুষের পোশাক পইরা মাইয়া মাইনষে (মেয়েমানুষে) কি মনের কথা কইতে পারে? শাড়ি পইরা যা দিদি।'

মজা করে একটু হাসল সন্দীপা। বলল, 'কেন, মেমসাহেবরা লাভারদের কাছে মনের কথা বলে না? তখন কি তারা শাড়ি পরে নেয়!'

'ওরা হইল গিয়া মেম। ওগো কথা ভিন্ন। যতই লিখাপড়া শিখা পুরুষগো লগে পাল্লা দাও, মনে রাইখো তুমি বাঙালি ঘরের মাইয়া। জামা-পেন্টুল রাইখা শাড়ি বাইর কর। আর এইগুলা ধর—' বলে একটা কারুকাজ-করা চমৎকার রুপোর বাক্স বাড়িয়ে দিলেন।

বাক্সটা যে হেমনলিনীর হাতে ছিল, আগে লক্ষ্য করে নি সন্দীপা। সে জিজ্ঞেস করল, 'এর ভেতরে কী আছে?'

'খুইলা দ্যাখ না!'

কাছে এগিয়ে এসে বাক্সটা নিল সন্দীপা। ঢাকনাটা খুলতেই চোখে পড়ল অজস্র গয়না। বেশির ভাগই হীরের। অবাক হয়ে সে বলল, 'এসব দিয়ে কী হবে?

হেমনলিনী গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোর মায়ের জিনিস, আইজ এগুলা পইরা যাবি।'

সেই কোন ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে সন্দীপা। তখন তার বয়স পাঁচ কি ছয়। পানপাতার মতো একটি মুখ, প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ, হীরের নাকছাবি, নকশাদার তাঁতের শাড়ি, কাঁধে বড় চাবির গোছা—এটুকু ছাড়া মায়ের আর সব স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে তাঁর প্রচুর ফোটো আছে। এক‌েক সময় মায়ের ছবির সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপা।

ঠাকুমার মুখে মায়ের কথা শুনে মনটা একটুক্ষণ ভারী হয়ে রইল। তারপর সন্দীপা বলল, 'তুমি ভেবেছ কি বুড়ী, গাঁইয়া মেয়েদের মতো আমি এসব পরে সং সাজব!'

'আ লো মাইয়া, মনের ভিতর উৎসব থাকলেই হয় না, সাজে-পোশাকে ঠাটে-ঠমকে তারে ফুটাইয়া তুলতে হয়। না হইলে মৃন্ময় বুঝব কেমনে?'

'মৃন্ময়ের জন্যে নিজেকে গয়নার শো-কেস বানিয়ে তুলতে হবে! প্লীজ ঠাকুমা, এ আমি পারব না।'

'সব না পরস, দুই-একখান পরতেই হইব।'

'কিন্তু—'

হেমনলিনী বললেন, 'আমি আর কোন কথা শুনুম না।'

সুদীপা বলল, 'প্লীজ ঠাকুমা, একটা কথা শুনতেই হবে।'

'কী?'

'এইসব গয়না ফয়না প'রে গেলে অফিসের এমপ্লয়ীরা কী ভাববে? কোনদিন তো সেজে ফেজে যাই নি। আমার লজ্জা করছে।'

'কেউ কিছু ভাবব না। মনিবরে পরীর সাজে দেখলে আনন্দে তোর কর্মচারীরা তিন দিনের কাম একদিনে কইরা দিব।'

'একদম ইয়ার্কি' করবে না ঠাকুমা! আমাকে ঝামেলায় ফেলে মজা করতে খুব ভাল লাগছে, না?

'হুঁ।' ঘাড় কাত করে দিলেন হেমনলিনী, 'আমি নীচে খাওয়ার ঘরে যাই; তুই বেশি দেরি করিস না।' হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন।

আর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপা আবার ওয়ার্ডরোবের কাছে চলে এল। এবার জামা কাপড়ের স্তূপের ভেতর থেকে একটা মেরুন রঙের মাইশোর সিল্কের শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ বার করে পরে ফেলল। তারপর রুপোর বাক্সটা খুলে তাকিয়ে রইল। এত সব গয়না তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ পর একটা হীরের লকেটওলা সরু সোনার চেন তুলে গলায় পরল। বাঁ হাতের আঙুলে পরল মুক্তো বসানো একটা আংটি, ডান হাতে পল কাটা একটা রুলি, আর বাঁ হাতে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়ি।

শাড়ি গয়না টয়না পরা হয়ে গেলে সুদীপা ড্রেসিং টেবিলের মুখোমুখি একটা কুশনে গিয়ে বসল। ওভাল শেপের দামী বেলজিয়ান আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। আর সেই মুগ্ধতার মধ্যেই হেয়ার টনিক মেখে চুলগুলো ব্রাশ করল, আই লাইনার দিয়ে দীর্ঘ চোখ দুটো আরো আকর্ষণীয় করে তুলল। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে একটু ওপরে কপালে সবুজ একটা টিপ আঁকল। তারপর ঠোঁটে হাল্কা রঙ লাগিয়ে নেল পালিশ দিয়ে নখগুলোকে চকচকে করে তুলল তারও পর পাফ বুলিয়ে বুলিয়ে মুখে ফেস পাউডার মেখে শাড়ি এবং জামায় দামী ফরেন সেন্ট স্প্রে করে ডিভানের ওপর থেকে লেডীজ হ্যান্ডব্যাগটা তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এ বাড়ির তেতলায় থাকে সুদীপা, দোতলাটা হেমনলিনীর আর একতলায়

সুদীপার বাবা উমাপ্রসাদ থাকেন। দু'দুবার করোনারি অ্যাটাক হয়ে যাবার পর তাঁর সিঁড়ি ভাঙা বারণ। ডাক্তারের পরামর্শে তাই তাঁকে একতলাতেই থাকতে হয়। এ বাড়ির তিন জেনারেশন তিনটে ফ্লোরে থাকে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ডাইনিং রুমে এসে সুদীপা দেখল উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনী আছেন। হেমন্ত এবং কার্তিক একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মধ্যবয়সী হেমন্ত এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে, কার্তিক তার ভাইপো এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ছেলেটার বয়স কুড়ি-বাইশ।

ডাইনিং রুমের গায়েই কিচেন। হেমন্ত আর কার্তিক সুদীপাকে দেখে একরকম দৌড়েই সেখানে চলে গেল এবং পাঁচ মিনিটের ভেতর প্লেটে খাবার সাজিয়ে ফিরে এল।

সুদীপার জন্য রোজই প্রায় এক ধরনের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। দুটো ডিমের পোচ, দুটো বাটার টোস্ট, দুটো জেলি মাখানো টোস্ট, এক গেলাস দুধ আর যখন যে ফল পাওয়া যায় তার কয়েকটা টুকরো। উমাপ্রসাদের এসব চলে না। দু' দুটো স্ট্রোক হয়ে যাবার পর তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা, খাওয়া দাওয়া—সব কিছুতেই এখন দারুণ কড়াকড়ি। ডাক্তার তাঁর জন্য যে চার্ট করে দিয়েছেন তার বাইরে একটা পা-ও ফেলার উপায় নেই। তাঁর ব্রেকফাস্ট হল মাখন ছাড়া দু'টুকরো স্যাঁকা রুটি, সরতোলা এক কাপ দুধ, দুটুকরো শসা আর দু'টুকরো পেঁপে। হেমনলিনী এখানকার কিছু ছোন, না। তাঁর খাওয়া দাওয়া এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দোতলায়। একবেলা খান; নিজেরটা নিজেই রেঁধে নেন। তবে নাতনী এবং ছেলের খাওয়ার সময় তিনি কাছে এসে বসবেনই। দু'জনকে সামনে বসে না খাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি নেই।

খেতে খেতে সুদীপা বলতে লাগল, 'বাবা, তুমি দশটা আর একটায় ট্যাবলেট গুলো খেয়ে নিও। ঠিক সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ করবে।' রোজ এই সময়টা উমা প্রসাদ কখন কী ওষুধ খাবেন, ক'টায় লাঞ্চ করবেন, ক'টায় চা খাবেন, সব একবার করে বলে দিয়ে যায় সুদীপা। স্ট্রোক হবার পর থেকে বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে সব সময় সতর্ক থাকে।

সুদীপা আরো কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে উমাপ্রাসাদ হেসে হেসে বললেন, 'রোজ শুনে শুনে রুটিনটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এ নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। এখন দরকারী কথাটা মন দিয়ে শোন—'

উমাপ্রসাদ কী বলবেন, সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল সুদীপা। মুখ নামিয়ে বলল, 'কী ?'

'মৃন্ময়কে আজ সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। রাত্তিরে এখান থেকে ও খেয়ে যাবে।'

মুখ না তুলে আস্তে করে সুদীপা বলল, 'বলব।'

বিশাল ডাইনিং টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে হেমনলিনী বলে উঠলেন, 'মৃন্ময়রে

ক'বি (বলবি), আমরা কিলাম দেরি করুম না। আশ্বিন আর কার্তিক, এই দুই মাসে বিয়া নাই। অঘ্রাণ মাসের পরথম যেদিন তারিখ পামু সেইদিনই শুভকাম চুকাইয়া ফালামু।'

সুদীপা উত্তর দিল না।

ব্রেকফাস্টের পর উমাপ্রসাদকে প্রণাম করল সুদীপা। বলল, 'আমি যাই বাবা।'

তার মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত রেখে আধফোটা গলায় উমাপ্রসাদ বললেন, 'সাবধানে যাবি।'

বাবার পর ঠাকুমাকে প্রণাম করল সুদীপা। হেমনলিনী রুম থেকে বেরিয়ে বড় বড় পা ফেলে সামনের পোর্টিকোর দিকে চলে গেল। ওখানে নতুন মডেলের ঝকঝকে একটা টোয়োটো নিয়ে শোফার অপেক্ষা করছে।

উমাপ্রসাদ আর মেয়ের সঙ্গে এলেন না; নিজের বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। তবে হেমনলিনী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এলেন। রোজই তিনি সুদীপাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে যান।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল সুদীপা। কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'ঠাকুমা, আমি ভুল করতে যাচ্ছি না তো?

প্রবলবেগে দু' হাত নাড়তে নাড়তে হেমনলিনী বললেন, 'না না, কোন ভুল হইব না। মনে আনন্দ লইয়া যা।'

'কিন্তু-- '

'আবার কী?'

'তুমি তো সবই জানো।'

'জানি দিদি।'

'কোন অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না তো?'

গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে হেমনলিনী উচ্চারণ করলেন, 'না—না—না - '

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সুদীপা। আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠে ব্যাক সীটে বসে দরজা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শোফার স্টার্ট দিয়ে জাপানী টোয়োটোটাকে পোর্টিকোর তলা থেকে বাইরে বার করে আনল।

বাড়ির সামনের দিকে অনেকখানি জায়গা। জায়গাটাকে সমান দুটো ভাগ করে এক ধারে লন, আরেক ধারে বাগান বানানো হয়েছে। মাঝখানে নুড়ি বিছানো রাস্তা।

লনে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাস। সেখানে ক'টা রঙীন গার্ডেন আমব্রেলা আর একটা দোলনা রয়েছে। বাঁ দিকের বাগানে দেশী বিদেশী নানা মরসুমী ফুলের গাছ। একটা মালী এই মুহূর্তে সেখানে বড় কাঁচি দিয়ে গাছের মরা হলদেটে পাতা ছেঁটে দিচ্ছে।

নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে সুদীপার টোয়োটাটা এক সময় সামনের বিরাট লোহার গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামল।

॥ দুই ॥

আরো কুড়ি মিনিট বাদে ক্যামাক স্ট্রীটের প্রকাণ্ড একটা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের কাছে এসে শোফার গাড়ি থামাল। তারপর দ্রুত নেমে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে একধারে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইল। রোজই এভাবে দরজা খুলে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যাক সীট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সুদীপা। অভ্যাসবশতঃ বাঁ হাতের কব্জী উল্টে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। ন'টা বাজতে পাঁচ। ঘড়ি না দেখলেও মোটামুটি সময়টা বলে দিতে পারত সে। কেননা রোজই ন'টা বাজার দু'চার মিনিট আগে-আগেই সুদীপা এখানে চলে আসে। গত আট বছরে আট-দশ দিন বাদ দিলে এ নিয়মের কখনও হেরফের হয় নি।

সুদীপা আর দাঁড়াল না ; ধীরে পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে মনে হল, ভোর থেকে বুকের ভেতর যে এস্রাজটা বাজছিল, এখন কেউ যেন তাতে দ্রুত ছড় টেনে যাচ্ছে। সুখানুভূতির মতো এক ধরনের উত্তেজনা যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে খানিকটা নার্ভাসনেসও।

পনের-কুড়ি ফুট দুবে টাইলস বসানো অনেকগুলো সিঁড়ি। সেগুলো ভেঙে ওপরে উঠলেই বিরাট বাড়িটার মেইন এনট্রান্স। সিঁড়ির মাথা থেকে লম্বা করিডর চলে গেছে। তার একপাশে পর পর ছ'টা লিফট। সুদীপা একটা লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তার শোফার বাঁ দিকের ড্রাইভওয়ে দিয়ে টোয়োটো গাড়িটাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং এরিয়ায় নিয়ে গেল।

লিফটম্যান বাইরে টুলে বসে ছিল। সুদীপাকে দেখে সে হাঁ হয়ে গেল। তার বিস্ময়ের কারণ আছে। আট বছরে সে সুদীপাকে কোনদিন শাড়ি বা গয়না-টয়না পরে আসতে দেখে নি।

যাই হোক, বিস্ময়টা একটু থিতোলে লাফ দিয়ে উঠে লিফটম্যান দরজা খুলে দিল। সুদীপা ভেতরে ঢুকতেই সে টেনথ্ ফ্লোরে বোতাম টিপল। এই বিল্ডিংয়ে সব লিফটম্যানই জানে, রোজ ন'টার মধ্যে এসে সুদীপা কোন্ ফ্লোরে যায় ?

ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে লিফটটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। লিফট-ম্যানের দিকে না তাকালেও সুদীপা টের পেতে লাগল আড়ে আড়ে ছোকরা তাকে লক্ষ্য করছে। মনে মনে একটু লজ্জা পেল সে।

এই একুশতলা হাই-রাইজ বিল্ডিংটায় কয়েকশো অফিস রয়েছে। ব্যাঙ্ক, ট্র্যাভেল এজেন্সী, ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কনসার্ন, অ্যাডভারটাইজমেন্ট ফার্ম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

টেনথ্ ফ্লোরের অর্ধেকটা, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে সুদীপাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অফিস। নাম 'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন'।

এদের কাজ হল ক্লায়েন্টদের জন্য বাড়ির প্ল্যান করা, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সেগুলো পাস করানো, তারপর সাইটে গিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া। সিনেমা হল, মাল্টিস্টোরিড অফিস বিল্ডিং, প্রাইভেট বাংলো থেকে শুরু করে কো অপারেটিভের ফ্ল্যাট পর্যন্ত সবই ওরা তৈরি করে দেয়। ইদানীং কলকাতা এবং আশেপাশে নিজেদের উদ্যোগে জমি যোগাড় করে বাড়ি বানিয়েও বিক্রি করছে।

'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন' অবশ্য সন্দীপার বাবা উমাপ্রসাদ মিত্রের ফার্ম। মানুষটি খুবই দূরদর্শী। তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর আগে যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। অ্যাডভোকেট হিসেবে বেশ নামও করেছিলেন, পশারও জমে উঠেছিল। এই সময় হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে গেল। পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ডারের ওপার থেকে জলস্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল এপারে। শুধু কি পূর্ব বাঙলা থেকে, ইণ্ডিয়ার অন্য সব প্রভিন্স থেকেও জলস্রোতের মতো হুড়হুড় করে মানুষ এসে কলকাতা এবং চারপাশের শহরতলী বোঝাই করে ফেলতে লাগল। উমাপ্রসাদ তখনই বুঝেছিলেন, এ শহরে পরের একশো বছর ধরে যে সমস্যা সব চাইতে তীব্র হয়ে উঠবে তা হল মানুষের মাথা গোঁজার সমস্যা। পপুলেশন এক্সপ্লোসেন অর্থাৎ জন বিস্ফোরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বছরে হাজার হাজার টেনেমেণ্ট আর বাড়ি তৈরি করতে না পারলে কলকাতা একেবারে 'কোলাপ্স' করে যাবে। হাইকোর্ট ছেড়ে তিনি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ফার্ম খুলে বসলেন।

বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেক বুঝিয়েছিলেন, জমজমাট প্র্যাকটিস ছেড়ে মধ্যবয়সে অনিশ্চিত ব্যবসার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। উমাপ্রসাদ কারো কথা শোনেন নি। তাঁর মধ্যে চিরকালই একটা একরোখা অ্যাডভেঞ্চারার রয়েছে। যেটা একবার মাথায় ঢুকবে তার শেষ না দেখে ছাড়বেন না।

উমাপ্রসাদ যে ভুল করেন নি, তাঁর দূরদৃষ্টি যে পরিষ্কার ছিল তার প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেল। দু বছরও লাগল না, কনস্ট্রাকশনের বিজনেস দারুণ জমে উঠল। প্রথমে নিজেদের বাড়ির একতলাতেই দু'খানা ঘর নিয়ে ছোট করে অফিস খুলেছিলেন। কিন্তু তিন বছরের মাথায় কাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে দুটো ঘরে আর কুললো না। চার কামরার একটা অফিস ভাড়া করে অফিস উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সেখানে দু'বছর যেতে না যেতেই আরো বড় অ্যাকোমোডেশনের দরকার হয়ে পড়ল। এইভাবে তেত্রিশ বছরে বার ছয়েক ঠিকানা বদলে 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে'র অফিস ক্যামাক স্ট্রীটের এই হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে এসে উঠেছে।

উমাপ্রসাদের বুদ্ধি, পরিকল্পনা, সংগঠনের ক্ষমতা এবং পরিশ্রমে এই কনসার্ন বড় হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ক'বছর ধরে তিনি অফিসে আসতে পারছেন না। দুটো বড় রকমের স্ট্রোক তাঁকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। ডাক্তাররা তাঁর জন্য যে ছক কেটে দিয়েছেন, তার বাইরে একটা পা ফেলারও উপায় নেই।

সকাল-বিকেল লেকের ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আসা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ। শারীরিক বা মানসিক কোনরকম পরিশ্রমই তাঁকে করতে দেওয়া হয় না। কেননা সামান্য উত্তেজনাও উমাপ্রসাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই অফিস বা বাড়ির সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে তাঁকে দূরে রাখা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে যে চার্ট করে দেওয়া হয়েছে, যান্ত্রিক নিয়মে উমাপ্রসাদ তা মেনে চলেন। না চলে উপায়ই বা কী? বাকী জীবন এইভাবেই তাঁকে কাটাতে হবে।

কাজেই অফিসের যাবতীয় দায়িত্ব নিতে হয়েছে সুদীপাকে। সেই সঙ্গে বাবার শরীর-স্বাস্থ্য এবং বাড়ির নানা খুঁটিনাটির দিকেও নজর রাখতে হয়। কিন্তু এ সব কথা পরে।

একটানা আওয়াজ করে লিফটটা টেনথ্ ফ্লোরে এসে থেমে গেল। বাইরে বেরিয়ে করিডর ধরে কয়েক পা গেলেই 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে'র অফিস। ডিসটেম্পার-করা ঝকঝকে দেওয়ালে পেতলের প্লেটে এনগ্রেভ করে ইংরেজিতে কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে।

দরজার মুখে ইউনিফর্ম-পরা মধ্যবয়সী বেয়ারা বসে ছিল। সুদীপাকে দেখেই অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্তে' বলেই লিফটম্যানের মতো তার চোখের তারাও বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। লিফটম্যানটার মতো সে-ও সুদীপাকে এরকম সাজপোশাকে কখনও দ্যাখে নি।

চোখের কোণ দিয়ে বেয়ারাটাকে দ্রুত এক পলক দেখে নিল সুদীপা। তার না-কামানো গালে একদিনের দাড়ি, আধময়লা উর্দি, ট্রাউজার্সের ক্রীজগুলো ভাঙা-চোরা, জুতোয় পালিশ নেই।

প্রতিটি বেয়ারাকেই অফিস থেকে ইউনিফর্ম এবং বুট দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কাচাবার খরচ এবং জুতোর কালি। নোংরা পোশাক, পালিশ-ছাড়া জুতো বা না-কামানো মুখ দেখলে সুদীপার রক্তচাপ বেড়ে যায়। শুধু বেয়ারা-টেয়ারাদের ব্যাপারেই না, নবজীবন হাউসিংয়ের অন্য এমপ্লয়ীদেরও কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, অফিসে ময়লা পোশাকে আসা চলবে না। এখানে চাকরি পেতে হলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তো চাই-ই, সেই সঙ্গে ক্যান্ডিডেটের পরিচ্ছন্নতা, ডিসিপ্লিন এবং পাংচুয়ালিটি সম্পর্কে লিখিত আন্ডারটেকিং দিতে হয়। অবশ্য এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যা মাইনে দেওয়া হয়, সুদীপা তার দেড় গুণ দিয়ে থাকে। তার মতে এমপ্লয়ীদের খুশি রাখলে তারা কোম্পানির ইন্টারেস্ট দেখবে। কোন কিছুই এক-তরফা হয় না।

অন্য দিন হলে ঢোকার মুখে এমন অপরিছন্ন চেহারায় বেয়ারাকে দেখে ক্ষেপে যেত সুদীপা। কিন্তু আজ ভেতরে ভেতরে সেই লজ্জাটা কাজ করছে। 'নমস্তে' বলেই সে ভেতরে ঢুকে গেল।

সাড়ে চার হাজার ফুটের পুরো অফিসটাই দামী জয়পুরী কার্পেটে মোড়া। হাল্কা সবুজ রঙের ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালে নামী আর্টিস্টদের সুন্দর পেন্টিং। আর আছে নানা ডিজাইনের সব বাড়ির ফোটো। এই সব বাড়ি 'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন' তার ক্লায়েন্টদের তৈরি করে দিয়েছে। গোটা অফিসটাই এয়ার-কণ্ডিশানড। কাজেই মাথার ওপরে ফ্যান নেই। আলোর ব্যবস্থাও চমৎকার। কোথাও বাল্ব বা টিউবলাইট দেখা যাচ্ছে না। তবে দেওয়াল বা সীলিংয়ের আড়াল থেকে পর্যাপ্ত আরামদায়ক আলো ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছে।

গোটা অফিসটা পার্টিশান ওয়াল তুলে তুলে নানা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা। প্যারাবোলার আকারের কাঠের সব ফলকে সুদৃশ্য হরফে কোথাও লেখা আছে 'প্ল্যানিং সেল', কোথাও 'ডিজাইন সেকশন', কোথাও 'অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট', কোথাও 'কনফারেন্স রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া টপ লেভেলের এক্সিকিউটিভ-দের জন্য আলাদা আলাদা চেম্বার। কার চেম্বার কোন্‌টা, দরজার মাথায় নেমপ্লেট দেখে বোঝা যায়। গোটা অফিটা সুদীপার পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

ডিজাইন সেকশনের পাশেই সুদীপার চেম্বার। নেমপ্লেটে লেখা আছে ঃ সুদীপা মিত্র। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অ্যাণ্ড প্রিন্সিপ্যাল আর্কিটেক্ট।

এত বড় অফিসটা এখন একেবারেই ফাঁকা। এখানে ডিউটি আওয়ার্স সাড়ে ন'টা সাতাশ-আটাশ মিনিট বাকী।

নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিজের চেম্বারে চলে এল সুদীপা। প্রকাণ্ড ঘরটার মাঝখানে গ্লাস-টপ সেমি সার্কুলার টেবিল। টেবিলের একধারে নানা রঙের চার-পাঁচটা টেলিফোন। অন্য ধারে সুন্দর করে সাজানো অগুনতি ফাইল, রাইটিং প্যাড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি, পেন-হোল্ডার ইত্যাদি। আর আছে কাচের সুদৃশ্য স্ট্যাণ্ডে একটা আলট্রা-মডার্ন সিনেমা হলের মডেল। আর্কিটেকচারের দিক থেকে মডেলটা চমকে দেবার মতো।

টেবিলের এধারে দেড় ফুট ফোম-বসানো রিভলভিং চেয়ার। ওটা সুদীপার। সামনের দিকে ভিজিটরদের জন্য আরো দশখানা চেয়ার রয়েছে।

রিভলভিং চেয়ারের পেছনে ঝকঝকে দেওয়ালে অনেকগুলো মাল্টি স্টোরিড বাড়ির ফটো বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। 'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন' এইসব বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে।

সুদীপার টেবিল থেকে কয়েক ফুট দূরে ডান পাশের দেওয়াল ঘেঁষে কাচের বুক-কেসে আর্কিটেকচার, কোম্পানি ল এবং ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা রেফারেন্সের বই সাজানো রয়েছে। আর বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে স্টীলের সুদৃশ্য ছোট একটা চেয়ার এবং টেবিল। ঐ জায়গাটা সুদীপার সেক্রেটারি-কাম-পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট লিজার জন্য নির্দিষ্ট। পুরো নাম এলিজাবেথ স্যাণ্ডার্স। ওরা

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

ঘরে ঢুকেই সুদীপা দেখতে পেল, এর মধ্যে লিজা এসে গেছে। তারও ডিউটি আওয়ার্স সাড়ে ন'টা থেকে, কিন্তু সুদীপা আগে আসে বলে সে-ও ন'টার ভেতরেই চলে আসে। অবশ্য অফিসে ঢুকবার মুখে যে মধ্যবয়সী বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা হল, সে-ও লিজার মতোই রোজ অফিস শুরুর আগে এসে পড়ে। ফাঁকা অফিসে সুদীপার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে ওদের তীক্ষ্ণ নজর।

সুদীপাকে দেখে লিজা উঠে দাঁড়াল। স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

লিজার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ! মাথার চুল লালচে, চোখ কটা। তবে গায়ের রঙ বাদামী বা সাদাটে নয়। বলা যায় বাঙালীসুলভ, অর্থাৎ কিনা শ্যামাভ। চোখ আর চুলের কথা ভুলতে পারলে স্বচ্ছন্দে তাকে বাঙালী মেয়ে বলে চালানো যায়। দুর্দান্ত ফিগার তার, গায়ে এক ফোঁটা বাজে ফ্যাট নেই। লম্বাটে মুখে বুদ্ধি এবং স্মার্টনেসের ছাপ।

লিজার পরনে প্রিণ্টেড ভয়েল শাড়ি; শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো স্কার্ট বা গাউন পরে না সে। গলায় সরু সোনার হার, নৌকোর আকারে মীনে করা লকেটটা বুকের মাঝখানে ঝুলছে। কপালে কুমকুমের টিপ। পায়ে উঁচু হীলের জুতো।

'গুড মর্নিং'—বলে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সুদীপা। বিরাট হ্যাণ্ডব্যাগটা টেবিলে রাখতে লক্ষ্য করল, বেয়ারা বা লিফটম্যানের মতো লিজা অবাক হয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। লাজুক একটু হেসে ফের বলল, 'হঠাৎ শাড়ি পরতে ইচ্ছা হল, তাই—'কথাগুলো নিজের কানে খানিকটা কৈফিয়তের মতোই শোনাল যেন।

লিজা উত্তর দিল না, তাকিয়েই রইল।

এবার পরিষ্কার বাঙলায় সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা আজ কেমন আছেন! বাঙলা ভাষাটা ভাল বুঝতে পারে লিজা, বলতেও পারে চমৎকার। সেই জন্যই বাঙলাতে কথা বলে।

এমনিতে সুদীপা দারুণ কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অফিসে বসে কারো কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সে কৌতুহল দেখায় না। অফিস কাজের জায়গা। কাজ ছাড়া এখানে অন্য বিষয়ে কেউ সময় নষ্ট করুক, সুদীপার তাতে প্রচণ্ড আপত্তি। এমপ্লয়ীদের সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'আমরা আপনাদের ইণ্টারেস্ট দেখি' আশা করি আপনারাও আমাদের ইণ্টারেস্ট দেখবেন। উই ডু সামথিং ফর ইউ অ্যাণ্ড ইউ ডু সামথিং ফর আস।' কিন্তু লিজার ব্যাপার কিছুটা আলাদা। মোটে দু মাস হল এই কনসার্নে চাকরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু এর মধ্যেই কথাবার্তা, আচরণ, কাজ সম্পর্কে সীরিয়াসনেস—সব মিলিয়ে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। তা ছাড়া তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও লিজা লক্ষ্য

রাখে। সুদীপার আগের সেক্রেটারিটি ছিল কাজের ব্যাপারে ভয়ানক অগোছালো। দরকারী ফাইল, করেসপনডেন্স বা ডকুমেণ্ট অনেক সময় হাতের কাছে গুছিয়ে দিত না। এই নিয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু লিজার মধ্যে একটা সিক্সথ সেন্স সব সময় কাজ করে। সুদীপার কখন কী দরকার, সে যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারে। অফিসের ব্যাপারে তার ওপর বেশ খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সুদীপা। ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে লিজার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কখন যে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল, সে নিজেও বলতে পারবে না।

সুদীপা জানে, ক'দিন ধরে জ্বর চলছে লিজার মায়ের। রোজই অফিসে এসে সে তার মায়ের খবর নেয়।

লিজা বলল. 'আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, জ্বরটা একটু কম।'

সুদীপা বলল, 'রোজই তো সকালের দিকে জ্বর কম থাকে। কিন্তু পুরোপুরি ছাড়ছে কই?' একটু থেমে বলল, তোমর মা সাত দিন ধরে ভুগছেন না?' বলতে বলতে লক্ষ্য করল, যান্ত্রিক নিয়মে দ্রুত হাত চালিয়ে প্রচুর কাগজপত্র গোছগাছ করছে লিজা। না দেখেও সুদীপা বলে দিতে পারে ওগুলো কাল বিকেলের ডাকের চিঠি। আগের দিনের শেষ ডাকের চিঠিপত্র সেদিন আর সুদীপাকে দেওয়া হয় না। পরের দিন সকালে ওগুলো দেখে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অন্য কাজ শুরু করে সে।

লিজা বলল, 'না, পাঁচ দিন।'

'ব্লাড কালচার করানো হয়েছে?'

'না, ভেবেছিলোম সেরে যাবে। তাই—'

'এমনি এমনি হাওয়ায় সেরে যাবে! ডাক্তার দেখিয়েছ? না, সেটাও দরকার মনে কর নি?'

সুদীপার আজকের সাজপোশাক লিজাকে অবাক করে দিয়েছিল আগেই। কিন্তু তার বিস্ময়টা অন্য কারণেই বেড়ে যেতে লাগল। অন্য দিন মায়ের জ্বরের খবরটুকু নিয়েই চুপ করে যায় সুদীপা। সেই তুলনায় আজ অনেক বেশী কথা বলছে সে। ব্যাপারটা নতুন। ব্যস্তভাবে লিজা বলে উঠল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখিয়েছি।'

সুদীপা বলল, 'নিশ্চয়ই কোয়াক?'

'না, ভাল ফিজিসিয়ান—এম. বি. বি. এস.। আমাদের পার্ক সার্কাস এরিয়ায় যথেষ্ট নাম আছে।'

'ভাল হলে এতদিন জ্বর চলছে, এখনও রক্ত পরীক্ষা করল না! লোকটার ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া উচিত।'

'বলেছেন আজকের দিনটা দেখে কাল সকালে ব্লাড নিয়ে যাবেন।'

সুদীপা লিজাদের ফ্যামিলির সব কথাই জানে। বাবা, মা এবং সে ছাড়া আর কেউ নেই। দুই দাদা চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেটল করেছে। বাবা

একটা বড় প্রাইভেট ফার্মে সিকিউরিটি অফিসার। সেখান থেকে ছুটি পাওয়া মুশকিল। লিজা আর তার বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে অসুস্থ মাকে দেখার আর কেউ থাকে না। সুদীপা বলল, 'কাল থেকে তুমি এক উইক ছুটি নাও।'

লিজা বলল, 'ছুটি নিলে আপনার কাজের অসুবিধা হবে।' বলতে বলতে, একটা কভার ফাইলের ভেতর কালকের শেষ ডাকের চিঠিগুলো সাজিয়ে সুদীপার সামনে রাখল। তারপর একটা ডট পেন আর নোট বই এনে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিটি চিঠি পড়ে সুদীপা তাকে ইনস্ট্রাকশান দেয়। সেই অনুযায়ী উত্তর তৈরি করে সুদীপাকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

সুদীপা একটু হাসল। বলল, 'দু'মাস তুমি এখানে এসেছ। তার আগেও আমার কাজ চলেছে। যে সাত দিন ছুটি নেবে, তখনও চলে যাবে। আমার কাজের চাইতে তোমার মাকে সারিয়ে তোলা অনেক বেশি জরুরী।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল লিজার। বলল, 'আজ রাত্তিরে আমার এক মাসীমার আসার কথা আছে। এলে ক'দিন থাকবেন, মাকে দেখাশোনা করতে পারবেন। না এলে ছুটি নেব।'

সুদীপা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। টেবিলের ড্রয়ার থেকে পুরু সেলের চৌকো চশমা বার করে পরে নিল। এটা অফিসেই থাকে। বাড়িতেও অবিকল এরকম আরেকটা আছে। আজকাল লেখাপড়ার জন্য চশমা দরকার হয়। অন্য সময় না পরলেও চলে। এই চশমাটা তার চেহারায় বাড়তি অনেকটা ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য এনে দেয়।

কভার ফাইলটা খুলে চিঠি দেখতে লাগল সুদীপা। প্রতিটি চিঠির সঙ্গে তার বিষয় ছোট কাগজের টুকরোয় তিন-চার লাইনে লিখে পিন দিয়ে গেঁথে রেখেছে লিজা। তাতে গোটাটা পড়ার পরিশ্রম বাঁচে। লিজার কাজ একেবারে নিখুঁত এবং মেথডিক্যাল।

প্রথম চিঠিটা বাহেরিনের এক বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের। তিনি কলকাতায় আড়াই-তিন লাখের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট কিনতে চান। সবটাই ডলারে পেমেন্ট করবেন। পরের তিনটে চিঠিও মিডল-ইস্ট থেকেই এসেছে। একটা কুয়েত থেকে, একটা ইরাক থেকে, একটা আবুধাবি থেকে। সবারই আর্জি কলকাতায় ফ্ল্যাট বা বাংলো চাই।

চিঠিগুলো দেখতে দেখতে সুদীপা বলল, 'পেট্রোডলারের দেশগুলো থেকে রোজই দেখছি ফ্ল্যাটের জন্যে চিঠি আসছে।'

লিজা বলল, 'হ্যাঁ, অ্যাভারেজে ডেইলি তিন-চারটে করে।'

'ল্যাস্ট উইকে আমেরিকা আর কানাডা থেকেও তো ক'জন ফ্ল্যাটের জন্যে লিখেছিল।'

'হ্যাঁ। তার আগের উইকে চিঠি এসেছিল ইংল্যান্ড আর ওয়েস্ট জার্মানী থেকে।'

'প্রচুর বাঙালী ওয়ার্ল্ডের নানা জায়গায় কাজ নিয়ে গেছে, তাই না লিজা ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

সুদীপা বলল, 'সবাই ডলার, মার্ক, পাউণ্ডে দাম দেবে। দেশের পক্ষে এ একরকম ভালই।'

সুদীপা কী বলতে চায়, লিজা বুঝতে পেরেছে। সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। ডলার-টলার পেলে ইন্ডিয়ারই অনেক লাভ।'

'সারা জীবন তো আর বাইরে পড়ে থাকতে পারে না। রিটায়ারমেণ্টের পর লাস্ট লাইফটা দেশে কাটাবার জন্যে সবাই আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখতে চায়।'

'হ্যাঁ '

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না লিজা।' বলেই ফাইল থেকে চোখ তুলল সুদীপা।

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল লিজা।

সুদীপা বকল, 'আমরা তো গালফ্ কাণ্ট্রি বা ইউরোপ-আমেরিকার কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিই না। তা হলে ওখানকার বাঙালীরা আমাদের কোম্পানির নাম জানল কী করে ?

একটু ভেবে লিজা বলল, 'হয়ত এখান থেকেই কেউ কেউ ফরেনে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের কথা জানিয়েছে। তারপর মুখে মুখে নবজীবন হাউসিংয়ের নাম ছড়িয়ে গেছে।'

'দ্যাটস রাইট।' সুদীপা বলতে লাগল, 'আমাদের কনসার্নের গুড-উইল তা হলে হোল ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেছে !' বলে হাসল ; পরিতৃপ্ত উজ্জ্বল হাসি।

'নিশ্চয়ই।'

'এ তো আমাদের পক্ষে বিরাট অ্যাচিভমেণ্ট। কিন্তু লিজা একটা কথা ভেবে দেখেছ ?'

'কী ?'

'দেশের ভিতর থেকে বা ফরেন থেকে যাঁরা চিঠি লিখছেন, তাঁদের ফাইভ পারসেণ্টকেও ফ্ল্যাট বা বাংলো দিতে পারব না। কোত্থেকে দেব বল ? কলকাতা বা আশেপাশে এক ইঞ্চি ল্যাণ্ড পেতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের যা স্কেয়ার্সিটি ' মেকানিক্যাল অভ্যাসে সুদীপা কথা বলে বা কাজ করে যাচ্ছে ঠিকই তবে যত সময় যাচ্ছে ততই বুকের ভেতর সেই এস্রাজের বাজনাটা আরো তীব্র আরো জোরালো হয়ে উঠছে।

একটু চুপ।

তারপর সুদীপাই আবার শুরু করল, 'এঁদের লিখে দাও, আপাততঃ আমাদের হাতে ফ্ল্যাট নেই। আপনাদের নাম-ঠিকানা রেখে দিলাম। কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে জানিয়ে দেব। অনুগ্রহ করে আমাদের স্মরণ করেছেন, সেজন্য আন্তরিক

ধন্যবাদ। একটু থেমে বলল, 'টাইপ করে একটা ক্লায়েণ্টের নামে পাঠিয়ে দেবে, ডুপ্লিকেটটা রেকর্ড সেকশানের মিস্টার ব্যানার্জীকে দেবে। ব্যানার্জী ঠিকমতো যেন ফাইল করে রাখেন। পরে দরকার হতে পারে।'

লিজা শর্টহ্যাণ্ডে সুদীপার কথাগুলো নোট করে নিল।

প্রথম পাঁচটা চিঠি দেখা হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর পর রয়েছে একটা লম্বা সাদা খাম। সেটা খোলা হয় নি! সুদীপার ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, এই এনভেলপটা দেখ নি?'

লিজা বলল, 'দেখেছি।'

সুদীপা একটু অবাক হয়েই বলল, 'তাহলে খোল নি কেন? তোমাকে তো সব চিঠিই খুলতে বলেছি।'

দ্বিধান্বিতভাবে লিজা বলল, 'ওটা আপনার পর্সোনাল চিঠি। তাই খুলি নি।'

এবার ভাল করে খামটা লক্ষ্য করল সুদীপা। তার নাম ঠিকানা ইংরেজীতে টাইপ করা রয়েছে। এক কোণে লেখা 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল অ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল'।

সুদীপা আস্তে আস্তে খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠি বার করল। ধবধবে সাদা দামী কাগজে ইংরেজীতে টাইপ করা আট-দশ লাইনের ছোট্ট চিঠি। নীচে কারো নাম নেই।

চিঠিটার ওপর সামান্য ঝুঁকল সুদীপা। পড়তে পড়তে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যেতে লাগল যেন। টের পেল, শীততাপনিয়ন্ত্রিত এই আরামদায়ক ঘরেও গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে। মুহূর্তে জামা টামা ভিজে গেল তার। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোঁক গিলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

বেনামী চিঠিটা বাঙলায় তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা এইরকম। 'তেরো বছর আগে আপনার যে পুত্রটি হয়েছিল, সে কোথায় আছে জানতে চাই।' একটা নামকরা ইংলিশ ডেইলির নাম করে পত্রদাতা লিখেছে, আগামী রবিবার ওখানকার পার্সোনাল কলমে এই খবরটা দিলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। খবরের তলায় সুদীপার নামের আদ্যক্ষর 'S' দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাহলে পত্রদাতার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে। অবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শেষ।

কে এই চিঠি দিতে পারে। বাবা আর ঠাকুমা ছাড়া যে তার তেরো বছরের একটা ছেলে আছে, এ খবর কারো পক্ষে জানা সম্ভব না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে একজন অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে। তার ছেলের খবর যে জানতে পারত, তার সঙ্গে কবেই তো সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তিনশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে সে কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে? তবে কি তার জীবনের অত্যন্ত গোপন আর লজ্জাকর একটা দিকের কথা আচমকা কেউ জেনে ফেলে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে?

কার্পেটে মোড়া এই চেম্বার, চেয়ার-টেবিল, দেওয়ালে মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের ফোটো—সমস্ত দৃশ্যপট চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে মুছে গেল যেন। সিনেমার মনতাজ দৃশ্যের মতো এলোমেলো টুকরো টুকরো কিছু ছবি অদৃশ্য কোন পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল। পুলিশ ভ্যান, কোর্টরুম, কালো কোট পরে বহুদিন বাদে মামলা করতে নামা উমাপ্রসাদ, আর একটি বিষণ্ণ করুণ যুবকের মুখ—যার নাম রণবীর, রণবীর মুখার্জী। কত কাল বাদে রণবীরের নাম মনে পড়ল তার।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো বসে রইল সুদীপা। কতক্ষণ বাদে খেয়াল নেই, লিজার গলা কানে ভেসে এল, 'ম্যাডাম—'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে সুদীপা তাকাল। লিজা গভীর উদ্বেগ নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?'

মনের মধ্যে যে ভাঙচুর আর তোলপাড় চলছে, সেটা কারো, বিশেষ করে নিজেরই একজন অধীনস্থ কর্মচারীর কাছে ধরা পড়ুক, তা চায় না সুদীপা। রুমাল দিয়ে কপাল এবং গলার ঘাম মুছে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সে। অল্প হেসে প্রেসারে কোনরকম গোলমাল হয়েছে।'

'ডাক্তারকে ফোন করব ?'

'দরকার নেই। আই অ্যাম অলরাইট। বাড়ি ফিরে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে 'কল' দেব।' বলতে বলতে বেনামী চিঠিটা খামে পুরে নিজের হ্যান্ডবেগে রেখে দিল।

এর পর আর কিছু বলার নেই। লিজা কোন ব্যাপারেই অনাবশ্যক কৌতুহল দেখায় না। এই চিঠির ব্যাপারেও দেখাল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'এই চিঠিটা কে দিয়ে গেছে, বলতে পারবে ?'

লিজা বলল, 'না ম্যাডাম। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমাদের লেটার বক্সে কেউ দিয়ে যেতে পারে।'

'তাই হবে।'

সুদীপা আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাইরে জোর করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রচণ্ড অস্থিরতা চলছে।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একসময় লিজা বলল, ম্যাডাম, অন্য চিঠিগুলো কি দেখবেন ?'

সুদীপা আস্তে মাথা নাড়ল, 'না, আজ আর ভাল লাগছে না। ফাইলটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাল দেখব।

ফাইল নিয়ে লিজা নিজের জায়গায় চলে গেল। পাঁচখানা চিঠি সম্পর্কে সুদীপা যে নোট দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী করেসপনডেন্স তৈরি করতে লাগল। কিন্তু

ঘুরে ঘুরে তার চোখ সুদীপার দিকেই চলে যাচ্ছে। দু'মাসের মধ্যে তাকে এমন বিচলিত আর অস্থির হতে কখনও দেখে নি লিজা।

এদিকে সুদীপা আবার দুবমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল তার মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো অনবরত কিছু একটা পাক খেয়ে চলেছে। আজকের দিনটা তার কাজে সব দিক থেকেই আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠতে পারত। দুপুরে লাঞ্চব্রেকের সময় মৃন্ময়ের আসার কথা। পার্ক স্ট্রীটের একটা দামী রেস্তোরাঁয় আগে থেকে টেবিলও 'বুক' করা রয়েছে। ঠিক আছে, একসঙ্গে তারা লাঞ্চ খাবে। আর সেই সময় নিজের নিজের সিদ্ধান্তের কথা মৃন্ময়কে জানিয়ে দেবে। আজ যা বলবে বলে একটু একটু করে মনকে তৈরি করেছে তা শোনার জন্য পাঁচটা বছর অপেক্ষা করে আছে মৃন্ময়। আর আজই এল এই মারাত্মক চিঠিটা! সেই সঙ্গে অন্ধকার খাপ খুলে বিষাক্ত ভয়াবহ অতীত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠল সুদীপা। তার নয়, লিজার টেবিলে ইণ্টারন্যাল কানেকশানের লাইনটা বাজছে। লিজা দ্রুত সেটা তুলে নিয়ে কী শুনে 'প্লীজ হোল্ড অন' বলেই সুদীপার দিকে তাকাল। রিসিভারটা কান থেকে হাতে নিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, দশটায় জরুরী একটা মীটিং হবার কথা ছিল। এখন দশটা কুড়ি। মিস্টার সান্যাল, মিস্টার রাহা, মিস্টার তরফদার আর মিস্টার তলাপাত্র আপনার জন্যে কনফারেন্স রুমে ওয়েট করেছেন।'

সুদীপার মনে পড়ে গেল। মাল্টি-ন্যাশনাল একটা কোম্পানি কলকাতায় তাদের হেড কোয়ার্টারের জন্য হাই-রাইজ বিল্ডিং করতে চায়। এক লাখ পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার ফুটের এই সুবিশাল বাড়িটার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওরা টেণ্ডার চেয়েছে। দেড় মাস ধরে এ ব্যাপারে দিন চোদ্দ ঘণ্টা করে খেটে সুদীপা আর কোম্পানির দু'জন সিনিয়র আর্কিটেক্ট বাড়িটার একটা ব্লু-প্রিণ্ট তৈরি করেছে, সেই সঙ্গে একটা মডেলও। কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টের পারচেজ অফিসার আর সিভিল ইঞ্জিনীয়াররা মেটিরিয়াল থেকে লেবার পর্যন্ত যাবতীয় খরচের হিসাব করেছেন। আজ বাড়ির নকশা আর তৈরির খরচ সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনার জন্য মীটিংটা আগে থেকেই ডেকেছিল সুদীপা। এ দুটো ব্যাপার ফাইনাল করে সব খরচের ওপর দশ থেকে পনের পার্সেণ্ট প্রফিট ধরে টেণ্ডার দেওয়া হবে।

আজকের মিটিংয়ে যে চারজনকে ডাকা হয়েছে, তাঁরা কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। নিরঞ্জন রাহা সিনিয়র আর্কিটেক্ট, পরিতোষ তরফদার পারচেজ অফিসার, পুণ্যব্রত সান্যাল আর সব্যসাচী তলাপাত্র সিভিল ইঞ্জিনীয়ার।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'লাইনে কে কথা বলছেন?'

লিজা বলল, 'রাহাসাহেব।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে বল।'

লিজা তাই বলে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপার টেবিলে একটা ফোন বেজে

উঠল। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই নিরঞ্জন রাহার গলা ভেসে এল, 'আপনি আমাকে ফোন করতে বলেছেন ?'

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ। আচ্ছা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির ঐ বাড়িটার টেণ্ডার দেবার লাস্ট ডেট কবে ?'

'টোয়েণ্টিসিক্সথ সেপ্টেম্বর।'

টেবিল ক্যালেন্ডারটা দ্রুত দেখে নিয়ে সুদীপা বলল, 'আজ ফোরটিনথ। তার মাঝে মাঝখানে এগার দিন রয়েছে। আজ মিটিংটা বন্ধ থাক। কাল বসব। কাইণ্ডলি অন্য সবাইকে বলে দিন, অনুগ্রহ করে কাল দশটায় ওঁরা যেন কনফারেন্স রুমে চলে যান। কিছু মনে করবেন না প্লীজ।'

'না না, মনে করব কেন! সবাইকে বলে দিচ্ছি। হঠাৎ কী হল, শরীর খারাপ নাকি?'

গলা শুনে মনে হল, নিরঞ্জন রাহা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তার কারণও আছে। যে ক'বছর ধরে এই অফিসে সুদীপা আসছে তাতে মিটিং ডেকে বা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে বাতিল করেছেন, এমন কোন ঘটনাই নেই।

সুদীপা বলল, 'তেমন কিছু নয়। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'একটা কথা বলব ?'

'অবশ্যই।'

'আজ বরং বাড়ি চলে যান।'

'বাড়ি যাবার মতো কিছু হয় নি।' বলে নিরঞ্জন রাহাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল সুদীপা।

কিন্তু পাঁচ মিনিটও কাটল না, গোটা অফিসেই সম্ভবত সুদীপার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ল। একে একে নিরঞ্জন রাহা, পরিতোষ তরফদার, পুণ্যব্রত সান্যাল থেকে শুরু করে ছোট বড় অনেক অফিসার তাঁর চেম্বারে এসে প্রচুর পরিমাণে উদ্বেগ জানিয়ে গেলেন। সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। কোনরকমে তাঁদের বিদায় করল সুদীপা। তারপর লিজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমার আর কী কী প্রোগ্রাম আছে ?'

লিজা জানিয়ে দিল, লাঞ্চের পর আর্কিটেক্টদের নিয়ে বসতে হবে। একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি চারটে বারোতলা বাড়ি তৈরি করাবে। টেণ্ডার দিয়ে সেই কাজটা পাওয়া গেছে। মোটামুটি বাড়িগুলোর প্ল্যানও করা হয়েছে। কর্পোরেশনে সেগুলো জমা পড়ারও কথা ছিল কিন্তু কো-অপারেটিভের লোকেরা এখন চাইছে প্ল্যানের কিছু হেরফের করা হোক। সেই কারণে আর্কিটেক্টদের নিয়ে বসা দরকার।

সুদীপা বলল, 'আর্কিটেক্টদের জানিয়ে দাও, আজ আমি ওঁদের সঙ্গে বসতে পারছি না।'

লিজা বলল, 'আচ্ছা।' একটু ভেবে ফের শুরু করল, 'বিকেলে একটা পার্টি আসবে। ওঁরা সাউথ ক্যালকাটায় একটা আইস স্কেটিং রিংক করতে চান।'

'মিস্টার রাহাকে বলো, তিনি যেন আজ প্রাইমারি কথাবার্তা বলেন ; পরে আমি কথা বলব।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কাজ তোমাকে করতে হবে।'

'বলুন।'

'ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে পার্সোনালি গিয়ে জানিয়ে দেবে, আজ আমার পক্ষে কারো সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না। এমনভাবে বলবে যেন কেউ ভুল না বোঝে। আর টেলিফোন অপারেটরকে দাও, খুব জরুরী না হলে আমার ঘরে যেন লাইন না দেয়।'

লিজা প্রথমে ফোন তুলে অপারেটরকে সুদীপার কথা জানিয়ে দিল। তারপর চেম্বার থেকে বেরিয়ে নানা ডিপার্টমেন্টের খবর দিতে গেল।

॥ তিন ॥

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজে ছিল সুদীপা। কতক্ষণ পর মনে নেই, খুব কাছ থেকে লিজার নরম গলা কানে এল, 'ম্যাডাম—'

চমকে চোখ মেলে তাকাল সুদীপা। দেখল, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিজা। আগে বেয়ারা চা দিয়ে যেত। লিজা আসার পর চা তৈরির দায়িত্বটা সে-ই নিয়েছে।

এই চেম্বারের ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে অ্যাটাচড বাথ। সেটার গায়ে রয়েছে একটা ছোট ক্লোজেট। লিজা সেখানে গ্যাসট্যাস আনিয়ে ছোটখাটো কিচেন বানিয়ে নিয়েছে।

অফিসে দু'বার চা খায় সুদীপা। দুপুর বারোটায় আর বিকেল চারটেয়। এক মিনিটও এদিক-ওদিক হয় না, দু'বারই ঠিক সময়ে চা নিয়ে আসে লিজা।

ঘড়ি না দেখেও সুদীপা বলে দিতে পারে, এখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। সে বলল, 'বসো।'

লিজা টেবিলের ওধারে বসে টী-পট সুগার-পট মিল্ক-পট ইত্যাদি থেকে দুটো কাপে লিকার চিনি দুধ ইত্যাদি ঢেলে চা বানিয়ে নিল। তারপর একটা কাপ দিল সুদীপাকে, আরেকটা নিজে নিল। প্রথম প্রথম নিজের জন্য চা করত না লিজা। তাতে সুদীপা রাগারাগি করত। ফলে এখন দুজনের জন্যই করতে হয় এবং মুখোমুখি বসে খেতেও হয়।

চায়ে একটু চুমুক দিয়ে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'ডিপার্টমেণ্টগুলোতে খবর দিয়ে এসেছ ?'

লিজা বলল, 'হ্যাঁ।'

এর পর আর কিছু জানতে চাইল না সুদীপা।

অদ্ভুত এক নৈঃশব্দের মধ্যে চা খাওয়া শেষ হলে ট্রে এবং কাপপ্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল লিজা। আর সুদীপা আবার পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে বসে রইল।

আরো এক ঘণ্টা পর ঠিক একটায় মৃন্ময় এল। সুদীপার মতোই ডিসিপ্লিনারিয়ান সে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ম এবং ছকে বাঁধা। তার স্বভাবের মধ্যে রয়েছে প্রখর শৃঙ্খলাবোধ।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। টানটান চেহারা। গায়ের রঙ কালোই। চওড়া কপাল, ব্যাকব্রাশ করা ঘন চুল, জোড়া ভুরু, দৃঢ় থুতনি। ছ'ফুটের মতো হাইট। যেটুকু মেদ থাকলে এই বয়সে মানিয়ে যায় ঠিক সেইটুকুই রয়েছে। তার মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সবল পুরুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

আগে কোনদিনই মৃন্ময়কে ট্রাউজার্স-শার্ট ছাড়া দ্যাখে নি সুদীপা। আজ সে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে এসেছে। পায়ে চকচকে পাম্প-শু। তার জীবনে আজকের দিনটা খুবই স্মরণীয়। ভেতরকার খুসি উথলে উঠে এসে তার সাজ-পোশাকে ছড়িয়ে পড়েছে যেন।

বেনামী চিঠিটা না এলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসার জন্য মৃন্ময়কে ঠাট্টা-টাট্টা করত সুদীপা। বলত, 'একেবারে জামাই সেজে এসেছ দেখছি।' কিন্তু তাকে দেখামাত্র বিচিত্র এক ভয় আর পাপবোধ সুদীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মনে হল, এতক্ষণ অফিসে বসে না থেকে বাড়ি চলে গেলেই ভাল হত।

সামনের একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে মৃন্ময়ের নজর সুদীপার শাড়ি-টাড়ির দিকে এসে পড়ল। চোখের তারা গোল করে রগড়ের গলায় চেঁচিয়েই উঠল সে, 'আরে বাবা, এ কী! শাড়ি-ফাড়ি পরে একেবারে বিয়ের কনে সেজে এসেছ! ফাইন! ভেবেছিলাম, ধুতি পরে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব। তুমিই দেখছি হোল বাড়িতে সারপ্রাইজ নিয়ে বসে আছ।'

এভাবে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে মৃন্ময়কে দ্যাখে নি সুদীপা। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। এমনিতে মৃন্ময় খুবই ধীর স্থির এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সে শোনে বেশি, বলে কম। যা বলে, খুব ওজন করে, মেপে। হাসি উচ্ছ্বাস আনন্দ—সবই তার পরিমিত। কিন্তু আজকের এই দিনটা একেবারেই আলাদা যে।

সন্দীপা কিছু বলল না। ব্লটিং পেপারের মতো অদৃশ্য কিছু যেন তার সব উৎসাহ উচ্ছ্বাস এবং জীবনীশক্তি চুষে নিয়েছে।

মৃন্ময় আবার বলল, 'তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না—এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল। একেবারে ড্রিম-গার্ল'।' বলতে বলতে হঠাৎ লিজার দিকে নজর পড়ল। একটু লজ্জা পেল সে। দ্রুত নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সন্দীপার দিকে মুখ ফিরিয়ে নীচু গলায় বলল, 'আই অ্যাম স্যরি। ভুলে গিয়েছিলাম, দিস ইজ অফিস।'

সন্দীপা এবারও চুপ করে রইল।

মৃন্ময় বলতে লাগল. আর বসে থেকে কী হবে? লাঞ্চব্রেক তো হয়ে গেছে। চল বেরিয়ে পড়া যাক। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সন্দীপা একবার ভাবল, মৃন্ময়ের সঙ্গে না। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল '। তার মধ্যে নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই যেন কাজ করছে না।

সন্দীপারা বেরিয়ে যাবার মিনিট দশেক বাদে টেলিফোন তুলে অপারেটরকে একটা লাইন দিতে বলল লিজা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নাম্বারটা পাওয়া গেল। খুব নীচু গলায় সে বলল, 'কে, মিস্টার মুখার্জী'?'

ওধার থেকে পুরুষের গলা ভেসে এল, 'লিজা নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার ফোনের জন্যই ওয়েট করছি; লাঞ্চে বেরুতে পারছি না। তারপর খবর কী?'

'ফাইন। আপনি যেমন যেমন ছক করে দিয়েছেন সেইভাবে কাজ করে গেছি।'

'খামটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার মালকিন ওটা খুলে পড়েছেন?'

'নিশ্চয়ই। পড়াবার জন্যে এত বড় একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছেন। পড়বেন না মানে?'

'রি-অ্যাকশান?'

'একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল?

'সিমপ্যাথি?'

'শী ইজ এ গ্রেট লেডী। প্রথম থেকেই আমাকে স্নেহ করে আসছেন। একটু সিমপ্যাথি হওয়া তো উচিতই।'

লাইনের ওধার থেকে সামান্য হাসির আওয়াজ ভেসে এল, 'গুড। নতুন মালকিনের ব্যাপারে তোমার লয়ালটির কথা জেনে খুশী হলাম।'

লিজা বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমার লয়্যালটিও একটুও কম নয় কিন্তু। বরং কয়েক গুণ বেশিই।'

'দ্যাট আই নো, দ্যাট আই নো। তা নাহলে ঝুঁকি নিয়ে তুমি ওখানে চাকরি করতে যাবে কেন? আমি জানি, আমার জন্যেই গেছ। সে যাক, আর সব খবর ডিটেলে দাও।'

'আজ আমার 'বস' খুব সেজে এসেছিলেন। দামী শাড়ি, ভালো অর্নামেন্ট—এই সব পরেছিলেন। আগে আর কখনও তাঁকে এরকম সাজতে দেখি নি।'

'আর তাঁর প্রেমিকটি?'

'তিনিও খুব সেজেছেন আজ। ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি পরেছেন। গা থেকে ফরেন সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছিল।'

'একেবারে জামাইবাবুটি সেজে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

মৃন্ময় চ্যাটার্জী মিস মিত্রকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।'

'ঐরকম একটা চিঠি পাবার পরও তোমার 'বস' তাঁর লাভারের সঙ্গে যেতে পারলেন? ভদ্রমহিলার নার্ভের জোর আছে বলতে হবে।'

'উনি নিজের থেকে গেলেন বলে মনে হল না। মৃন্ময় চ্যাটার্জীই তাঁকে নিয়ে গেলেন, বলা যায়। চিঠিটা পাবার পর মিস মিত্র কেমন যেন হয়ে গেছেন।'

'ওঁরা কোথায় গেলেন, বলতে পারবে?'

'কথাবার্তা শুনে মনে হল, কোন রেস্তোরাঁয় যাবেন। টেবিল 'বুক' করা আছে। দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করবেন।'

'আই সী।'

একটু চুপচাপ। তারপর লাইনের ওধার থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে এল, 'তুমি যে কারো এজেন্ট আর বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নবজীবন হাউসিংয়ে ঢুকেছ, তা কি তোমার 'বস' সন্দেহ করতে পেরেছেন?'

লিজা বলল, 'এখনও পারেন নি।'

'বী কেয়ারফুল। মিস মিত্র ইজ এ ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট লেডী।'

'জানি। আমারও একটু-আধটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আমাকে ধরে ফেলা খুব সহজ না। আমার ওপর ডিপেণ্ড করতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তোমার ওপর ভরসা করতে না পারলে কি এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে পাঠাতে পারি? তোমার বুদ্ধি, ধীর-স্থির নেচার, তোমার কাজের মেথড—সব কিছুর ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'একেবারেই না। যা বললাম খাঁটি সত্যি।'

'ধন্যবাদ।'

'এখন একটা কাজের কথা শোন।'

'বলুন।'

'ওঁরা দু'জনে তোমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন, কী করলেন—সব খবর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার জানিয়ে দেবে।'

'চেষ্টা করব।'

'ও, আরেকটা কথা, তোমার মায়ের জ্বরটা আজ কেমন?'

'পুরোপুরি ছাড়ে নি।'

'ভাল ডাক্তার দেখাও।'

লিজা শব্দ করে হাসল।

'হাসলে যে!' লাইনের ওধারের সেই স্বরটায় কিছুটা বিস্ময় মিশল।

'মিস মিত্রও আমার মায়ের অসুখ নিয়ে খুবই চিন্তিত। মায়ের জন্যে তিনি তো আমাকে ছুটিই নিতে বললেন। আমার দুই মালিকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।'

'দুই মালিক মানে?'

'আপনি আর মিস মিত্র।'

'ও। কিন্তু এখন কিছুতেই তোমার ছুটি নেওয়া চলবে না। রোজ অফিস যাবে। অফিসের পরও যদি সম্ভব হয়, মিস মিত্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করবে। আমার অনেক খবর দরকার। বিশেষ করে মিস মিত্রের সেই ছেলেটির খবর।'

'ঠিক আছে। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে ত্রুটি হবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার সব দায়িত্ব আমার। সন্ধেবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি এখন যদি দেখি মায়ের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা নার্সের দরকার, ব্যবস্থা করে দেব।'

গভীর গলায় লিজা বলল, 'ধন্যবাদ স্যার।'

ওধার থেকে লাইন কেটে গেল।

॥ চার ॥

কিছুক্ষণ বাদে লিফটে করে মৃন্ময়ের সঙ্গে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ কী মনে পড়তে সন্দীপা বলল, 'নীচে গিয়ে আবার একবার ওপরে উঠতে হবে।'

মৃন্ময় জানতে চাইল, 'কেন?'

'গাড়ির অ্যারেঞ্জমেণ্ট করি নি।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে বেয়ারা পাঠিয়ে সন্দীপা শোফারকে দিয়ে খবর পাঠায়।

শোফার আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং এরিয়া থেকে গাড়ি বার করে সে নামা পর্যন্ত ড্রাইভওয়ের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। আজ খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল।

মৃন্ময় বলল, 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। লাঞ্চের পর যদি অফিসে আসতে চাও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

সন্দীপা উত্তর দিল না।

একটু পর দু'জনে নীচে নেমে এল।

হাই-রাইজ বিল্ডিংটার কম্পাউণ্ডের বাইরে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মৃন্ময়ের ইমপোর্টেড লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্দীপাকে নিয়ে মৃন্ময় সোজা গাড়িটার ব্যাক-সীটে উঠে শোফারকে বলল, 'পার্ক স্ট্রীট।'

বিদেশী গাড়ির চাকা ক্যামাক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে তেলের মতো গড়িয়ে যেতে লাগল।

মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে ছিল সন্দীপা। মৃন্ময় কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'মনে হচ্ছে আজকের দিনটা আমার জীবনে সব চাইতে রিমার্কেবল দিন হতে চলেছে। এ ডে অফ অল ডেজ—তাই না?'

এমনিতে মৃন্ময় খুবই ভদ্র, মার্জিত। পাঁচ বছরের ওপর তার সঙ্গে আলাপ, কিন্তু কখনও সে এমন কিছু বলে নি বা এমন আচরণ করে নি যা অশোভন বা দৃষ্টিকটু। একদিনের জন্যও এমন কোন দুর্বলতা দেখায় নি যা কুরুচিকর। আজ এই মুহূর্তে সে যে গা ঘেঁষে এসে বসল, তার কারণ একটাই। কাল বিকেলে সন্দীপা যখন ফোনে জানিয়েছিল, আজ দুপুরে একটা সুখবর দেবে, মৃন্ময় তখনই তা আন্দাজ করে নিয়েছিল। আর তখন থেকেই সন্দীপার ওপর এক ধরনের সূক্ষ্ম অধিকারবোধ অনুভব করতে শুরু করেছে। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় দেখা হবে?' সন্দীপা বলেছিল, 'তুমি যেখানে বলবে।' একটু ভেবে মৃন্ময় বলেছিল, 'কাল দুপুরে আমরা দু'জনে লাঞ্চ খাব। তখনই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। রেস্তোরাঁয় টেবিল 'বুক' করে রাত্তিরে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

যাই হোক, সন্দীপা উত্তর দিল না।

মৃন্ময় আবার বলল, 'জানো, কাল তোমার ফোন পাবার পর থেকে এত থ্রিলড আর এক্সাইটেড হয়ে আছি যে কিছুই করতে পারছি না। কাল হোল নাইট ঘুমোতে পারি নি। ভেবেছি কখন সকাল হবে, সকালের পর দুপুর, তারপর লাঞ্চ টাইমে তোমার মুখোমুখি বসে কখন সেই গুড নিউজটা'—বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্য করল তার কথা কিছুই শুনছে না সন্দীপা; দূরমনস্কর মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

মৃন্ময় স্থির চোখে খানিকক্ষণ সন্দীপাকে দেখল। তারপর বলল, 'কী ব্যাপার রঞ্জু, কী হয়েছে তোমার?'

সন্দীপা চমকে মুখ ফেরাল। হাসার চেষ্টা করে বলল, 'কই কিছু না তো?'

মৃন্ময় সন্দীপার দিক থেকে চোখ সরাল না। তাকে দেখতে দেখতে মনে পড়ল, এতক্ষণ উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে সে একাই কথা বলে গেছে। লিফটে করে নামবার সময় সন্দীপা তার গাড়ীর ব্যাপারে দু'একটা কথা বলা ছাড়া সারাক্ষণ চুপ করেই আছে। মৃন্ময় বলল, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।'

'কী করে বুঝলে?' সন্দীপা সহজ হতে চাইল।

মৃন্ময় বলল, 'ইউ লুক সো ডিপ্রেসড্। নিশ্চয়ই শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে।'

'না-না, আমি ঠিক আছি।'

মৃন্ময় আর কিছু বলল না। কয়েক মিনিটের ভেতর তার লিমুজিন পার্ক স্ট্রীটের এক শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামল।

সন্দীপাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ল মৃন্ময়। ক্যাশ কাউণ্টার-কাম-রিসেপশানে এসে জিজ্ঞেস করতেই জানানো হল, দোতলায় তাদের টেবিল সংরক্ষিত রয়েছে।

বৃটিশ আমলের প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে এই রেস্তোরাঁ। ফ্লোরগুলো তিরিশ ফুটের মতো উঁচু। নীচে তো বটেই, ফ্লোরের মাঝামাঝি জায়গায় ব্যালকনির মতো বার করে সেখানেও টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে।

এয়ার-কণ্ডিশানড্ এই রেস্তোরাঁয় আলোর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে চারদিক স্বপ্নময় আর ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এই লাঞ্চ টাইমে একটা টেবিলও ফাকা নেই। একধারে উঁচু ডায়াসে একটা দুর্ধর্ষ চেহারার ভলাপচুয়াস যুবতী হাতে মাইক নিয়ে পপ সঙ গেয়ে চলেছে; ঘাড় পর্যন্ত চুলওলা, বেলবটম আর জীনস পরা একদল যুবক ব্যাঞ্জো থেকে বঙ্গো ম্যাণ্ডারিন বাজিয়ে চলেছে। বেয়ারারা খাবার এবং ড্রিংক্সের ট্রে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে অনবরত এধারে ওধারে ছুটছে।

নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে মৃন্ময় আর সন্দীপা ব্যালকনির মুখে চলে এল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠল। একটা নকশা করা ট্রাঙ্গুলার পিলারের পাশে যে টেবিলটা রয়েছে, তার ওপর ওদের নাম লেখা রয়েছে। পাশে একটা বোর্ডে লেখা 'রিজার্ভড'।

পিলারের আড়াল থাকার জন্য সহজে কেউ তাদের দেখতে পাবে না, তাদের কথা-টথা শুনতে পাবে না। অথচ তারা সবাইকে দেখতে পাবে। এখান থেকে নীচের দৃশ্যটা পুরো চোখে পড়ে।

টেবিলটা দেখে খুবই খুশি মৃন্ময়। উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'ফাইন। বোসো।'

দু'জনে মুখোমুখি বসল। সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার একজন স্টুয়ার্ড দৌড়ে এল। সুদৃশ্য বইয়ের মতো ছাপানো মেনু মৃন্ময়দের টেবিলে রেখে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আরাম করে বসবার জন্য মৃন্ময়দের একটু সময় দিচ্ছে। মিনিট পাঁচ সাতেক বাদে এসে অর্ডার নিয়ে যাবে।

টেবিলের ওপর ন্যাপকিন, খাবার জলের গেলাস, ফর্ক-চামচ, সব কিছু সাজানো রয়েছে।

নীচের ডায়াসে শরীরে দুর্দান্ত যৌবন নিয়ে যে মেয়েটা উদ্দাম প্রেমের গান গাইছে, তার গলায় উগ্র নেশার মতো ঝাঁঝালো একটা ব্যাপার আছে। সে গাইছিল :

'লাভ লাভ লাভ
লাভ ইজ নারকোটিক, লাভ ইজ ম্যাজিক,
মাই ডার্লিং কামস ডাউন ফ্রম হনলুলু।
লাভ লাভ লাভ।'

ঘাড় বাঁকিয়ে নীচে তাকাল মৃন্ময়। ভাল করে কয়েক সেকেন্ড গানটা শুনে সুদীপার দিকে ফিরে বলল, 'দারুণ গাইছে মেয়েটা।'

আধফোটা গলায় সুদীপা কী বলল বোঝা গেল না।

মৃন্ময় ফের বলল, ' গলাটা একটু হাস্কি। কিন্তু দুরন্ত সেক্স অ্যাপীল রয়েছে তাই না?'

সুদীপা উত্তর দিল না।

এলোমেলো দু'একটা কথার পর মৃন্ময় জিজ্ঞেস করল, 'আগে কী খাবে বল জীন না বীয়ার?'

সুদীপার যে টাইপের কাজ, তাতে তাকে নানা ধরনের পার্টিতে যেতে হয়। ম্যানার্সের জন্য একটু-আধটু ড্রিংকও করতে হয়। তবে হুইস্কি-টুইস্ক নয় জীন বা বীয়ার। ড্রিংকের ব্যাপারে তার কোন রকম শুচিবাই নেই।

প্রথম প্রথম পার্টিতে গিয়ে খুবই অসুবিধা হত। সবাই যখন ড্রিংকের জন্য রিকোয়েস্ট করত, সে হাত গুটিয়ে রাখত। বাবাকে সে কথা জানাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের যা বিজনেস, তাতে ড্রিংকটা এসেই যায়। ভদ্রতা আর সঙ্গ দেবার জন্য যেটুকু দরকার, ঠিক সেইটুকুই করবে, নইলে ব্যবসা বড় করা আজকের ওয়ার্ল্ডে সম্ভব না। তবে কখনও অ্যাডিক্ট হয়ে যেও না।,

কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই ভাল লাগছে না সুদীপার। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'যা ইচ্ছা।'

কী ধরনের পানীয় সুদীপার পছন্দ, মৃন্ময় তা জানে। স্টুয়ার্ডকে ডেকে সে বীয়ার দিতে বলল।

বেয়ারাকে দিয়ে বীয়ার আনিয়ে দিল স্টুয়ার্ড। ফেনিল গেলাসে একটা চুমুক ..., মৃন্ময় বলল, 'খাবারের অর্ডারটা দিয়ে দিই। তৈরি করতেও তো সময় লাগবে। যা খাবে মেনু দেখে বলে দাও।'

'তুমিই বল।'

'এখানে চিকেন-তন্দুরি আর ক্রীম-বেকটিটা চমৎকার বানায়। ওটা বলে দিই। সেই সঙ্গে সুইট-সাওয়ার ফিশ, ফ্রায়েড প্রন, স্যালাড আর সুইট ডিশ।'

অর্ডার নিয়ে সেই সঙ্গে স্টুয়ার্ড চলে গেল। নীচের ডায়াসে মাইক হাতে গাইয়ে

মেয়েটা গানের সঙ্গে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে এখন নাচতেও শুরু করেছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের বেগে অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছে।

উদ্দাম নাচ গান এবং বাজনা এত বড় রেস্তোরাঁটায় আশ্চর্য এক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে যেন। কেউ পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে। আর যাদের পাকস্থলীতে হুইস্কিটা একটু বেশি পরিমাণে ঢুকে গেছে তারা জড়ানো গলায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে উঠছে। এগুলো যুগপৎ নেশা এবং উচ্ছ্বাসের প্রকাশ।

চারপাশে এত শব্দ কিন্তু কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না সুদীপা। এই বিশাল রেস্তোরাঁ, লাঞ্চ টাইমে প্রচণ্ড ভিড়—কিছুই যেন তার চোখে পড়ছে না। সেই মারাত্মক চিঠিটা চোখের সামনে সিনেমা স্লাইডের মতো ফুটে উঠছে।

এত আওয়াজের মধ্যেও আবছাভাবে সুদীপা টের পাচ্ছে টেবিলের ওধার থেকে অনেকখানি ঝুঁকে অনবরত কিছু বলে যাচ্ছে মৃন্ময়। কিন্তু তার একটি বর্ণও সে শুনতে বা বুঝতে পারছে না।

এমন সময় নীচে গান-টান বন্ধ হল। লাঞ্চের জন্য এটা সাময়িক বিরতি। আর ঠিক তখনই একটা বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। গরম লোভনীয় সব খাদ্য প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

মৃন্ময় বলল, 'এসো শুরু করা যাক।' বলে চিকেন তন্দুরির একটা টুকরো মুখে পুরে দিল।

কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সুদীপার কোনরকম উৎসাহ দেখা গেল না। বুকের ভেতরকার সেই পাপবোধটা তাকে যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার শ্বাস আটকে আসতে লাগল।

মৃন্ময় খাওয়া থামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড সুদীপাকে লক্ষ্য করল। বলল, 'এ কী, চুপ করে বসে আছ! খাও।'

চমকে সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ, খাচ্ছি।' টেবিল থেকে একটা চামচ আর ফর্ক তুলে নিল সে। তারপর ক্রিম-বেকটি থেকে খানিকটা কেটে মুখে দিল। কিন্তু অনেক দিন জ্বরে ভোগার পর যেমন হয়, মুখের ভেতরটা অবিকল সেই রকম হয়ে গেছে। কী খাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না। মাছের টুকরোটা বিস্বাদ শুকনো রবারের মতো মনে হচ্ছে।

একটু পর মৃন্ময় ডাকল 'রঞ্জু—'

'বল।'

'একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই আজ মার্ক করছি। তুমি ভীষণ আনমাইণ্ডফুল। তখন বললে শরীর খারাপ হয় নি। তবে কি অন্য কোনরকম প্রবলেম হয়েছে?'

'কই, না—' আস্তে মাথা নাড়ল সুদীপা, 'কোন প্রবলেম হয় নি।'

'তা হলে এত চুপচাপ কেন? তুমি তো কত লাইফলি ফুল অফ এনার্জি।

কিন্তু আজ নিজের থেকে একটা কথাও বলছ না। সারাক্ষণ কী ভাবছ?'

বেনামী চিঠিটা পাবার পর তার মধ্যে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে, তা কি সবার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে? সন্দীপা বলল, 'না না, কী আর ভাবব?'

'তোমার বাবার শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠাকুমা?'

'ঠিক আছেন।'

'বিজনেসের দিক থেকে কোন খারাপ খবর নেই তো?'

'না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর একসময় মৃন্ময় খুব আস্তে করে ডাকল 'রঞ্জু—'

সন্দীপা আবছা গলায় সাড়া দিল।

'মৃন্ময় বলল, 'এবার বল।'

'কী বলব?' সুদীপা মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকাল।

'যা শোনার জন্যে পাঁচটা বছর অপেক্ষা করে আছি।'

মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সন্দীপা।

একেবারে হকচকিয়ে গেল মৃন্ময়। বলল, 'কী হল রঞ্জু, কী হল তোমার?'

সুদীপা বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর মৃন্ময়। আজ তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না—' বলে আর দাঁড়াল না, নিশে-পাওয়া মানুষের মতো টেবিলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে একরকম দৌড়েই সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

মৃন্ময় পেছন থেকে ডাকল 'রঞ্জু, রঞ্জু—'

সুদীপা ফিরেও তাকাল না। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নীচে নেমে গেল; তারপর সোজা বাইরের দরজার দিকে ছুটল। চারদিকের টেবিল থেকে সবাই যে অবাক চোখে লক্ষ্য করছে, সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

মৃন্ময় ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু সন্দীপাকে ধরা গেল না। ততক্ষণে বাইরে চলে গেছে সে।

পাঁচ

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল সুদীপা। হাত তুলে থামিয়ে ভেতরে উঠতে উঠতে বলল, 'ম্যান্ডেভিল গার্ডেন।'

পার্ক স্ট্রীট পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সিটা ক্যামাক স্ট্রীটে এসে পড়ল।

তারপর সাকু'লার রোড, গুরুসদয় রোড হয়ে সোজা ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের কাছে এসে ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল, 'আভি কীধর যায়েগা ?

আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল সুদীপা। চমকে উঠে বলল, 'বাঁ দিকে যান, তারপর ডাইনে।'

নির্দেশ অনুযায়ী ট্যাক্সিটা দু'তিন মিনিটের মধ্যে বাড়ীর সামনে এসে থামল। বিশাল গেটটার ওধারে দারোয়ান বসে ছিল। সুদীপাকে এই দুপুর বেলা ট্যাক্সি করে ফিরতে দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। কেন না, এ সময় কখনও সুদীপা ফেরে না ; তা ছাড়া ট্যাক্সিতে চলাফেরার অভ্যাসও তার নেই। বিস্ময় একটু থিতিয়ে এলে লাফ দিয়ে উঠে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

সুদীপা ট্যাক্সিটা আর ভেতরে নিয়ে গেল না। ওখানেই ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে লন এবং বাগানের মাঝখানে নুড়ির রাস্তাটা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তেতালায় এসে শাড়ি-টাড়ি সুদ্ধু নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিল।

এই দুপুর বেলায় বাড়িটা একেবারে নিঝুম। সুদীপা জানে, খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা আর ঠাকুমা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোন। দারোয়ান আর মালীরা ছাড়া বাড়ীর অন্য সব কাজের লোকেরা কেউ ঘুমোয়, কেউ বাইরে আড্ডা-টাড্ডা দিতে যায়।

মাঝে মধ্যে বাগানের গাছপালার মাথা থেকে পাখীদের ডাক ভেসে আসছে। রাস্তায় কচিৎ দু'একটা গাড়ীর আওয়াজ। কলকাতার মতো আশি লক্ষ মানুষের বিশাল মেট্রোপলিস জুড়ে যখন দিনরাত শুধু শব্দ আর শব্দ, টগবগে উত্তেজনা আর টেনশান, সেখানে এই অভিজাত পাড়াটাতে দুপুরবেলায় কেউ যেন আশ্চর্য কোন ম্যাজিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

বালিশে মুখ গুঁজে কতক্ষণ পড়ে ছিল, সুদীপার খেয়াল নেই। শুধু টের পাচ্ছিল চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

একসময় মাথায় কার হাতের ছোঁয়া পেতেই চমকে উঠল সুদীপা। দেখল, হেমনলিনী খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে বাবা ;

দুটো স্ট্রোকের পর উমাপ্রসাদের সিঁড়ি ভাঙা বারণ। গত পাঁচ-ছ বছরে একবারও তিনি তেতালায় ওঠেন নি। দ্রুত চোখ-টোখ মুছে সুদীপা বলল, 'এ কি বাবা, তুমি তেতালায় উঠলে যে। সিঁড়ি ভেঙে একটা কাণ্ড বাধাতে চাও!'

উত্তর না দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, 'তুই এ সময় বাড়িতে চলে এলি যে ?'

সুদীপা উত্তর দিল না।

উমাপ্রসাদ ফের বললেন, 'দারোয়ান এসে ঘুম থেকে আমাদের তুলে খবর দিল, তুই নাকি ট্যাক্সি করে চলে এসেছিস।'

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ।'

উদ্বিগ্ন মুখে উমাপ্রসাদ বললেন, 'কী হয়েছে।'

সুদীপা চুপ।

হেমনলিনী অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, 'কী হইছে ক রঞ্জু। চুপ কইরা থাকিস না।

উমাপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃন্ময় কি লাগ্নে আসে নি ?'

'এসেছিল।'

'বিয়েব ব্যাপারে কি পিছিয়ে যেতে চাইছে ? কিন্তু ওর আগ্রহই তো বেশী ছিল।'

'না-না--' শ্বাসরুদ্ধের মতো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুদীপা। বলল. 'মৃন্ময় ঠিক আছে। ও খুবই অনেস্ট ছেলে।'

'তা হলে ?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সুদীপা। তারপর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে টাইপ-করা সেই কাগজটা বার করে উমাপ্রসাদের হাতে দিতে দিতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এটা দেখ।'

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা ?'

'পড়লেই বুঝতে পারবে।'

হেমনলিনী অস্থিরভাবে একবার ছেলে, আরেকবার নাতনীকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কী ঐটা ?'

কেউ উত্তর দিল না।

চিঠিটা পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক আতঙ্কে সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল উমাপ্রসাদের। অসহ্য কোন যন্ত্রণায় তাঁর হাত-পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে নতুন করে আরেকটা স্ট্রোক হয়ে যাবে। দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো মেয়ের বিছানার একধারে বসে পড়লেন। ভাঙাচোরা জড়ানো গলায় বললেন, 'এত বড় শত্রুতা কে করল ?

রুদ্ধশ্বাস গলায় হেমনলিনী বললেন, 'কিসের চিঠি, আঁ, কি রে নান্টু ?' নান্টু উমাপ্রসাদের ডাকনাম।

কেউ উত্তর দিল না।

গভীর উৎকণ্ঠায় হেমনলিনী বলে যেতে লাগলেন, 'তোরা চুপ কইরা থাকিস না। কী হইছে ক।'

অনেকক্ষণ পর রুদ্ধশ্বাসে চিঠিটায় যা লেখা আছে, জানিয়ে দিলেন উমাপ্রসাদ। সব শুনে হেমনলিনী কেঁদেই ফেললেন. 'কে এমুন ক্ষতিটা করল ! এত বড় শত্তুর কে ?'

'জানি না মা।'

'এতকাল মাইয়াটা বিয়াতে রাজী হয় নাই। যদিও হইল, তার ভিতরে এই বিপদ। অখন কী করবি নান্টু ?'

উমাপ্রসাদ বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু ভেবে দেখি।'

হেমনলিনী সুদীপার পাশে বসে গভীর স্নেহের গলায় বললেন, 'মনে সাহস আন দাদ। সব ঠিক হইয়া যাইব।'

ঠাকুমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে দিল সুদীপা। কিছু বলল না।

হেমনলিনী খানিকটা ঝুঁকে নাতনীকে লক্ষ্য করতে করতে এবার বললেন, 'ইস, মুখখান শুকাইয়া এতটুক হইয়া গেছে। মৃন্ময়ের লগে (সঙ্গে) দুফইরে (দুপুরে) তো হোটেলে খাওনের কথা আছিল। নিচ্চয় খাওয়া হয় নাই।'

'না।' খুব আস্তে আধফোটা গলায় বলল সুদীপা।

হেমনলিনী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'আহা রে, ওঠ ওঠ। খাইতে চল।'

উমাপ্রসাদও খাওয়ার কথা বার বার বললেন।

সুদীপা বলল, 'আমার কিছু ভাল লাগছে না। তোমরা নীচে গিয়ে রেস্ট নাও। আমি একটু একলা থাকি।'

॥ ছয় ॥

কিছুক্ষণ আগে উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনী নীচে নেমে গেছেন। বিছানা থেকে এখনও ওঠে নি সুদীপা। বালিশে চিবুক রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

আকাশের ঢালু গা বেয়ে বেয়ে আশ্বিনের সূর্য এখন পশ্চিমে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদ ক্রমশঃ হলুদ হয়ে আসছে। নীচের বাগানে পাখিদের ওড়াউড়ি আর ডাকাডাকি অনেক বেড়ে গেছে। দূরে যে রাস্তাটা এতক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে ছিল, সেখানে বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে। দু'একটা ফেরিওলা গলায় অদ্ভুত আওয়াজ করে করে ঘুমন্ত পাড়াটাকে যেন জাগিয়ে তুলছে। আইসক্রিমওলা আর ইজিচার-ওলারা তাদের গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলছে। সব মিলিয়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের এই রাস্তা জুড়ে এখন বিচিত্র অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছে।

চারপাশের এত শব্দ বা দৃশ্য, কিছুই সুদীপাকে যেন ছুঁতে পারছিল না। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা সতের-আঠার বছর পেছনে চলে গেল। তখন ক্লাস নাইনে বা টেনে পড়ে সে।

সেই সময় বাবার স্বাস্থ্য ছিল দুর্দান্ত। দিনে সতের-আঠার ঘণ্টা খাটতেন। 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে''র বিজনেস লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। বাড়িতে গাড়ি ছিল দুটো। কিন্তু সুদীপাকে বাসে-ট্রামে করেই একা একা স্কুলে যেতে হত। এই নিয়ে হেমনলিনী ছেলেকে যথেষ্ট বকাবকি করতেন। কিন্তু বাবা কিছুতেই সুদীপাকে গাড়ি পাঠাতেন না।

আসলে উমাপ্রসাদ মেয়েকে মোমের পুতুল বানাতে চান নি। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ট্রামে-বাসে ঘুরে পৃথিবীকে চিনতে শিখুক সে। সব রকম অবস্থার উপযোগী করে প্রথম থেকেই নিজেকে তৈরি করে নিক। জীবন তো সরলরেখা নয়। চিরকাল একভাবে এক নিয়মে কারো নাও কাটতে পারে। কম বয়স থেকে সব রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকলে পরে আর কষ্ট পেতে হয় না। তাঁর মতে স্কুলবাস আর বাড়ির গাড়িতে তফাত খুব একটা নেই। কাজেই স্কুল ইউনিফর্ম পরা সুদীপা রোজই কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে দক্ষিণ দিকের ঐ রাস্তাটা দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে বড় রাস্তায় চলে যেত। সেখান থেকে ট্রাম বা বাস ধরত।

ষোল-সতের বছর আগেও এদিকে এত বাড়ি টাড়ি হয় নি। সুদীপাদের এই জায়গাটুকু বাদ দিলে চারপাশের ইদানীং হাই-রাইজ বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। তখন কিন্তু ফাঁকা জায়গা ছিল আরো বেশি। দু'চারটে বস্তি টাইপের টিনের বাড়িও চোখে পড়ত।

সুদীপাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা যেখানে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, সেখানে ছিল টিনের চালের পুরানো ক'টা বাড়ি। পাঁচ ইঞ্চি পুরু ইঁটের দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে গিয়েছিল। সামনের ফালি বারান্দাগুলোর সিমেণ্ট ফেটে কনেই চৌচির। বাড়িগুলোর উল্টো দিকে ছিল একটা ছোট চায়ের দোকান। পুরনো অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় দু-তিনটে বেঞ্চ পেতে খদ্দেরদের বসবার ব্যবস্থা ছিল। একধারে উনুন, তার পাশে চা তৈরির নানারকম সরঞ্জাম। এ সবের গা ঘেঁষে একটা কাঠের র‍্যাকে সারি সারি বোয়মে বিস্কুট সাজানো থাকত। তারের বাস্কেটে থাকত ডিম।

স্কুলে যাতায়াতের সময় প্রায় রোজই সুদীপা দেখত, একটা বাইশ তেইশ বছরের যুবক তার সমবয়সী একদল ছেলে নিয়ে হয় টিনের বাড়ির রোয়াকে, নইলে চায়ের দোকানে বসে আছে।

পাতলা ধারালো চেহারা যুবকটার কাটাকাটা মুখ, তীক্ষ্ম থুতনি, ঘন ভুরু, মাঝারি ধরনের চোখে উগ্র চাউনি। চুলগুলো সর্বক্ষণই অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। গালে তিন-চার দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে আধময়লা টাইট ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। শার্টের দু-একটা বোতাম কখনই থাকত না।

ছেলেটার নাম রণবীর। নামটা কার কাছে সুদীপা শুনেছিল, এতদিন বাদে মনে নেই। নামই না, তার সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু শুনেছিল সে। মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ বেপরোয়া এবং চোয়াড়ে। কথায় কথায় মারদাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। কারণে-অকারণে হল্লা করে। তাদের এই অভিজাত এলাকায় অনেকেই তাকে অ্যাণ্টি-সোস্যাল এলিমেণ্ট বলত।

সুদীপা বেশ সাহসী মেয়ে। অল্প বয়স থেকেই তার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। রণবীর সম্পর্কে নানারকমের বাজে মিথ' শুনেও তাকে যে সে ভয়

পেত তা ঠিক নয়। তবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি তার মধ্যে কাজ করত। স্কুলে যাওয়া-আসার সময় কখনও রণবীরদের দিকে তাকাত না সুদীপা। সোজা সামনে চোখ রেখে চায়ের দোকানের ঐ জায়গাটা পেরিয়ে যেত।

রণবীর সম্পর্কে নানারকম ব্যাপার শোনা গেলেও, মেয়েদের পেছনে লাগার কথা কখনও শোনা যায় নি। সুদীপা একাই না, ও পাড়ার অনেক মেয়েই ঐ রাস্তা দিয়ে স্কুল-কলেজে যেত কিন্তু কোনদিন সে কাউকে বিরক্ত তো করেই নি, কারো দিকে তাকিয়ে দ্যাখে নি পর্যন্ত।

যাই হোক, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আর কেয়ার জন্যই রণবীরের সঙ্গে যোগাযোগ। কিন্তু রণবীরের কথা পরে।

কেয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তার মুখটা সুদীপার চেনা। ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের রাস্তায়-টাস্তায় আগেই তাকে দেখেছে। স্মার্ট ঝকঝকে চেহারার মেয়ে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

কলেজে একই দিনে একই সময়ে কেয়া আর সে বি. এস-সিতে ভর্তি হয়েছিল দু'জনেরই এক কম্বিনেশন। অনার্সও তাদের এক—ফিজিক্স।

অফিসে ফীয়ের টাকা জমা দিয়ে বাইরে আসতেই সুদীপা দেখল কেয়া করিডরে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আগেই টাকা জমা দিয়েছে।

সুদীপাকে দেখে একটু হেসে কেয়া বলেছিল, 'তোমার জন্যেই ওয়েট করছি।'

কিছুটা অবাক হয়ে কেয়ার দিকে তাকিয়েছিল সুদীপা।

সুদীপার বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে পেরে কেয়া এবার বলেছিল, 'আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম সুদীপা। পার্কের কর্নারে তেতলা বাড়িটা তোমাদের।'

আস্তে মাথা নেড়েছিল সুদীপা।

একটা ইংলিশ-মিডিয়াম মিশনারি স্কুলের নাম করে কেয়া আবার বলেছিল, 'তুমি তো ওখান থেকে পাস করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'স্টার পেয়েছ?'

সুদীপার বিস্ময়টা ক্রমাগত বাড়ছিলই। সে বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?'

কেয়া বলেছিল, 'তোমার মতো ভালো মেয়েদের কথা জানতে অসুবিধা হয় নাকি?'

সুদীপার এবার খুব লজ্জা হচ্ছিল। তার সম্বন্ধে এত খবর জানে মেয়েটা অথচ ওর বিষয়ে সব কিছুই তার অজানা। সে বলেছিল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?'

সুদীপার মনের কথা বুঝে নিয়ে কেয়া এবার বলেছিল; 'তুমি কী বলবে, আমি

জানি। আমার সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানো না—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কেয়া। তোমাদের পাড়াতেই থাকি।'

'কোন্ স্কুল থেকে পাস করেছ?'

একটা নামকরা বাংলা-মিডিয়াম স্কুলের নাম করেছিল কেয়া।

সন্দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার টোটাল কত হয়েছে?'

'তোমার মতো নয়। সাতশো সাতচল্লিশ।'

'মোটে তিন নম্বরের জন্যে স্টারটা পেলে না! ভেরি স্যাড।'

কেয়া হেসেছিল. 'কী আর করা যাবে। এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

সন্দীপা বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'চল. একসঙ্গে যাওয়া যাক। আমিও বাড়ি ফিরব।'

বাসে ম্যান্ডেভিল গার্ডেনের কাছে নেমে মেইন রোড থেকে সরু রাস্তায় ঢুকে সেই টিনের ঘরগুলো আর চায়ের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেয়া।

সন্দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখানে দাঁড়ালে যে?'

কেয়া বলেছিল, 'এখানেই তো থাকি।' বলে টিনের ঘরগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিল, 'ঐ যে আমাদের বাড়ি।'

রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সন্দীপা। সেই সঙ্গে এক ধরনের অস্বস্তিও হচ্ছিল তার। যে বাড়িতে রণবীরের মতো অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট থাকে সেখানে কেয়ার মতো ব্রাইট ঝকঝকে মেয়ে কী করে থাকতে পারে, এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে। আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বলেছিল, 'চলি।'

এরপর সেসন শুরু হলে প্রায় রোজই দু'জনে একসঙ্গে কলেজ যেত, ফিরতও একই সঙ্গে। কেননা, দু'জনের কম্বিনেশন এক হওয়ায় তাদের ক্লাস থাকত একই সময়, ছুটিও তাই।

কলেজে গল্প করার সময়-টময় পাওয়া যেত না। রোজই পাঁচ-ছ'টা করে ক্লাস, তারপরও অনার্সের মেয়েদের জন্য টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা। ফাঁকে ফাঁকে দু' একটা অফ পীরিয়ড থাকলে দু'জনে লাইব্রেরিতে চলে যেত। রেফারেন্সের বই-টই খুলে নোট নিত। কেয়া আর সন্দীপা পড়াশোনার ব্যাপারে ছিল ভীষণ সীরিয়াস। একেবারে গোড়া থেকেই ফাস্ট' ক্লাসের জন্য তৈরী হতে শুরু করেছিল ওরা।

কলেজে একটা সেকেন্ডও নষ্ট না করুক, ফেরার সময় কিন্তু প্রচুর গল্প করতে করতে আসত তারা।

কোনদিন কেয়া বলত, 'তুমি তো দারুণ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাও, তাই না?'

সন্দীপা অবাক হয়ে বলত, 'দারুণ-টারুণ না, তবে গাই।' মানে শিখছি।'

একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ের নাম করে কেয়া বলেছিল, 'তুমি তো এঁর কাছে গান শেখো?'

'হ্যাঁ।'

'সপ্তাহে তিন দিন এসে উনি তোমাকে শেখান ?'

'হ্যাঁ।'

কোনদিন কেয়া বলত, 'তুমি তো খুব ভালো আঁকতে পার।'

সুদীপা বলেছে, 'ভালো আর কোথায়। চেষ্টা করি।'

'একজন ফেমাস আর্টিস্ট উইকে দু'দিন এসে তোমাকে আঁকা শিখিয়ে যান।'

অবাক বিস্ময়ে সুদীপা বলেছে, 'আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি কী করে জানলে ?'

'জানি।' কেয়া রহস্যময় গলায় বলেছে, 'জানাবার লোক আছে।'

'শার্লক হোমস কি হারকিউল পয়রোর মতো কোন ডিটেকটিভকে আমার পেছনে লাগিয়ে রেখেছ নাকি ?'

উত্তর না দিয়ে মজা করে কেয়া বলেছে, 'আমি লাগাই নি। নিজেই সে লেগে রয়েছে।'

'কে সে ?'

'জানতে পারবে। তবে এখন না।'

গল্প করতে করতে কেয়াদের বাড়ির কাছাকাছি এসে আর দাঁড়াত না সুদীপা, সোজা এগিয়ে যেত। বেশির ভাগ দিনই চোখে পড়ত টিনের বাড়ির রোয়াকে বা চায়ের দোকানে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বসে আছে রণবীর। কোন কোন দিন আবার তাকে দেখা যেত না।

সুদীপা লক্ষ্য করেছে, রণবীর রোয়াকে টোয়াকে থাকলে তার দিকে ফিরেও তাকাত না। এমন কি কেয়ার সঙ্গেও তার আচরণ ছিল অপরিচিতের মতো। একই বাড়িতে থাকে অথচ সে যেন তাকে চেনেই না এমন একটা ভাব নিয়ে বসে থাকে। কেয়ার সঙ্গে রণবীরের কী সম্পর্ক, আদৌ কিছু আছে কিনা, জানবার জন্য কৌতূহল ছিল সুদীপার। কিন্তু কখনও তা জিজ্ঞেস করত না। সব আগ্রহই তো মুখ ফুটে জানাবার নয়। শোভনতা অশোভনতার একটা প্রশ্নও তো আছে।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় বাসস্টপে নেমে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ কেয়া বলেছিল, 'একটা কথা বলব সুদীপা ?'

সুদীপা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

'রোজই ভাবি কিন্তু বলতে সাহস হয় না।'

'কী আশ্চর্য, বলেই ফেল না।'

'আমার একটা রিকোয়েস্ট তোমাকে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, রাখব। রিকোয়েস্টটা না জেনেই তোমাকে কথা দিলাম।'

'আমাদের বাড়িতে তোমাকে আজ একটু যেতে হবে। মাকে তোমার কথা অনেক বলেছি। ক'দিন ধরেই মা তোমাকে নিয়ে যেতে বলছেন কিন্তু কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না।'

সন্দীপা চমকে উঠেছিল। কেয়াদের বাড়ি যাবার কথা কোনদিন সে ভাবে নি। তা ছাড়া অ্যান্টি-সোসাল রণবীরকে নিয়ে যে বিশ্রী 'মিথ'টা রয়েছে, সেটা তার মধ্যে অনেকদিন ধরেই একটা বিরূপতা তৈরি করে রেখেছে।

কেয়া আবার বলেছিল, 'আসলে তোমার এত বড় লোক আর আমরা এত গরিব—'

সন্দীপা এবার দ্বিধা কাটিয়ে বলেছে, 'প্লীজ ওরকম বাজে কমপ্লেক্স ছাড়ো তো। চল, মাসীমার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

খুশিতে মুখ আলো হয়ে উঠেছিল কেয়ার। সন্দীপার একটা হাত ধরে গভীর গলায় বলেছিল, 'এসো ভাই।'

কেয়াদের বাড়িতে সব মিলিয়ে তিনটে ঘর। ইংরেজি 'এল' শেপের মতো বাড়িটা। সামনে রাস্তার দিক পাশাপাশি দুটো ঘর, বাকি ঘরটা ভেতরে ডান দিকে। এ ছাড়া বাথরুম, কিচেন ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। ছোট্ট চৌকো মতো ফাঁকা একটুকরো জমিও আছে। সেখানে দু'চারটে ফুলের গাছ।

বাড়ির বাইরের দিকটা ভাঙাচোরা হতচ্ছাড়া চেহারার হলেও ভেতরটা তেমন নয়। ঘরগুলো তকতকে। এক কণা ধুলো কোথাও পড়ে নেই।

কেয়া প্রায় চিৎকার করতে করতেই বাড়িতে ঢুকেছিল, দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি।'

একটা ঘর থেকে গোলগাল আদুরে চেহারার এক বর্ষীয়সী মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন। লালপাড় মিলের শাড়ি, পরনে সামান্য ঘোমটা টানা, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। হাতে ধবধবে শাঁখা, রুপো বাঁধানো লোহা, গলায় পাতলা জিলজিলে সোনার হার আর কানে দুটো পাথর-বসানো কানফুল। বড় বড় ভাসা ভাসা দুটি চোখ আর মুখ স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, এই মানুষটি কারো ওপর রাগ করতে জানেন না, কাউকে বকতে পারেন না। সর্বাঙ্গে অসীম কোমলতা নিয়ে এই পৃথিবীতে তিনি বেঁচে আছেন।

স্নিগ্ধ হেসে কেয়ার মা বলেছিলেন, 'তুমি সন্দীপা! কী সুন্দর মেয়ে! সব সময় রুনকির মুখে তোমার কথা।' কেয়ার ডাকনাম রুনকি।

সন্দীপা পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই কেয়ার মা তার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে মেয়েকে বলেছিলেন, 'বন্ধুকে তোর ঘরে নিয়ে যা।'

সন্দীপা বলেছিল, 'আজ আর বসব না মাসীমা। বাড়িতে তো আর বলে আসি নি। দেরি হলে ঠাকুমা ভাববেন।'

'তাই কখনও হয়। প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টি-টিষ্টি না খেয়ে গেলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।'

এর পর আর কিছু বলার নেই। কেয়ার সঙ্গে তার ঘরে যেতে হয়েছিল।

ঘরটা চমৎকার। দামী আসবাব-টাসবাব অবশ্য নেই। একধারে তক্তাপোশে ধপধপে বিছানা পাতা। আরেক ধারে সস্তা টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর কেয়ার পড়ার বই-টই আর খাতা যত্ন করে সাজানো। বাঁ দিকে একটা কাচের আলমারিতে প্রচুর বই। রবীন্দ্র রচনাবলী, সেক্সপীয়ারের নাটকের সেট, বিখ্যাত সব বিদেশী ক্লাসিক।

কেয়ার বিছানায় বসে চারদিক দেখতে দেখতে সুদীপা বলেছিল, 'তোমার ঘরটা ভারী সুন্দর।'

কেয়া হেসে বলেছিল, 'সার্টিফিকেটটা মায়ের পাওনা। মা-ই সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দেয়।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই প্লেটে করে সুদীপা এবং কেয়ার জন্য ঘরে তৈরি নারকেলের চন্দ্রপুলি নিয়ে এসেছিলেন কেয়ার মা। বলেছিলেন, 'খাও মা।'

চন্দ্রপুলি দেখে লজ্জা পেয়েছিল কেয়া। খুঁতখুঁতে গলায় বলেছিল, 'সুদীপাকে এসব দিলে!'

'ও তোর বন্ধু, বলতে গেলে আমার মেয়েই। ওর সঙ্গে ভদ্রতা করব নাকি! ঘরে যা আছে তা-ই খাবে।' বলে হেসে হেসে সুদীপার দিকে ফিরেছিলেন কেয়ার মা, 'তাই না রে মা?'

তাঁর সহজ আন্তরিক ব্যবহার এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুদীপা। ব্যস্তভাবে বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বলেই চামচে দিয়ে চন্দ্রপুলির একটা টুকরো কেটে মুখে পুরে দিয়েছিল।

খেতে খেতে নানারকম কথা হয়েছিল। সুদীপাদের বাড়ীতে কে কে আছেন, বাবা কী করেন, দেশ কোথায় ছিল ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন কেয়ার মা। তারপর এক সময় উঠতে উঠতে বলেছিলেন, 'তোরা দুই বন্ধু গল্প কর। অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে। আমি এখন যাই রে সুদীপা।'

সুদীপা বলেছিল, 'আমিও এবার যাব মাসীমা।'

কিন্তু তক্ষুণি তাকে যেতে দেয় নি কেয়া। আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে সুদীপা যখন উঠতে যাবে, সেই সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে কে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মুখ ফিরিয়েই চমকে উঠেছিল সুদীপা—রণবীর।

গভীর চোখে কয়েক সেকেণ্ড সুদীপাকে দেখেছিল রণবীর। তারপর কেয়াকে বলেছিল, 'ও, তোরা—' বলে আর দাঁড়ায় নি। বারান্দা দিয়ে ডাইনে চলে গিয়েছিল।

কেয়া বলেছিল, 'কিছু বলবি?'

বারান্দার ওধার থেকে রণবীর বলেছিল, 'তেমন কিছু না। পরে শুনিস।'

এ বাড়ীতে আসার পর কেয়ার মায়ের আন্তরিকতা এবং সাবলীল ব্যবহারে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল সুদীপা। মহিলা তার মধ্যেকার জড়তা এবং সংকোচ মুছে দিয়েছিলেন। কিন্তু রণবীরকে দেখেই অনেক কালের সেই পুরনো অস্বস্তিটা

আবার যেন টের পেতে শুরু করেছিল।

এই সময় কেয়া বলেছিল, 'আমার দাদা।'

ও রকম একটা সমাজবিরোধী টাইপের ছেলে কেয়ার মতো মেয়ের দাদা হতে পারে, এটা ভাবতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল সন্দীপার। তার কথায় উত্তর না দিয়ে দ্রুত উঠে পড়েছিল সে, বই-টইয়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরুতে বেরুতে বলেছিল, 'চলি কেয়া।'

'আরেকটু বসবি না ?'

'না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

কেয়া সন্দীপার সঙ্গে তাদের বাড়ির কাছাকাছি সেই পার্কটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। রণবীরকে দেখার পর থেকে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা বুঝতে পারে নি কেয়া। সে বলেছিল, আমার দাদাকে আগে দেখেছিস নিশ্চয়ই।'

রুক্ষ গলায় সন্দীপা বলেছিল, 'দেখেছি। রাস্তায়, না হলে চায়ের দোকানে বসে থাকে।'

'তখন শার্লক হোমস আর হারকিউল পয়রোর কথা বলছিলি না ? আমার দাদা হল তাই। তোর সঙ্গে আলাপ-টালাপ হবার আগে দাদার কাছে তোর সব খবর পেয়েছি।'

এটা ভাবতে পারে নি সন্দীপা। তার মুখ-চোখ ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করেছিল। কেয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সন্দীপা প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'প্লীজ স্টপ—'

কেয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'কি হল সন্দীপা ?'

'আমার সম্পর্কে কোন অ্যান্টিসোশাল এলিমেন্ট খোঁজখবর রাখুক, এটা আমি একেবারেই চাই না।'

কেয়া চমকে উঠেছিল, 'কী বলছিস সন্দীপা, দাদা অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট !

সন্দীপা বলেছিল, 'আমি একাই বলছি না। সবাই বলে। একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবি।'

'প্লীজ সন্দীপা, দাদার কথা যদি সব শুনিস—'

'শুনবার দরকার নেই। এরকম বাজে টাইপের ছেলেদের আমি ঘৃণা করি। আই হেট—' বলে আর দাঁড়ায় নি সন্দীপা। প্রায় ছুটতে ছুটতেই নিজেদের বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

এর পর ক'দিন কেয়া ভীষণ গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কলেজে যাবার সময় বাস স্টপে তার সঙ্গে দেখা হত না। অনেক আগে আগেই সে বেরিয়ে পড়ত। ক্লাসে এমনভাবে বসে থাকত, যেন সন্দীপাকে দেখতেই পায় নি। ছুটির পরও একসঙ্গে আসত না। ইচ্ছে করেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকত, কিংবা অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প-টল্প করে দেরি করত। সন্দীপা চলে যাবার পর সে বাড়ি ফিরত।

খুব খারাপ লাগছিল সুদীপার। বুঝতে পারছিল, সেদিন ওভাবে রণবীর সম্পর্কে বলাটা ঠিক হয় নি। রণবীর যে টাইপেরই ছেলে হোক, তাকে কখনও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বিরক্ত করে নি বা পেছন থেকে বাজে নোংরা কমেন্টও ছুঁড়ে দেয় নি। তা ছাড়া সে কেয়ার দাদা। ভাই সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে তার দুঃখ পাওয়ারই কথা।

দিন সাতেক বাদে সুদীপা নিজের থেকেই সব মিটিয়ে নিয়েছিল। একটা অফ-পীরিয়ডে কেয়া যখন একা কলেজ লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে সে তার হাত ধরেছিল। ভারী গলায় বলেছিল, 'আই অ্যাম স্যরি কেয়া। সেদিনকার কথা তুই মনে রাখিস না।'

কেয়া উত্তর দেয় নি, ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুদীপা আবার বলেছিল, 'তুই আমাকে অ্যাভয়েড করছিস, আমার সঙ্গে কথা বলিস না। এ ক'টা দিন আমার কী বিশ্রী যে লাগছিল, বলে বোঝাতে পারব না।'

কেয়া চুপ।

সুদীপা বলেই যাচ্ছিল, 'তোর দাদার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না কিন্তু অনেকের কাছে শুনে শুনে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল। এক ধরনের কমপ্লেক্সও।'

কেয়া এবার বলেছিল, 'শুধু শুনে শুনে কারো সম্বন্ধে ধারণা করা ঠিক না।'

'নিশ্চয়ই। এখন বল, আমার ওপর আর রাগ করে থাকবি না। বল, বল—' কেয়ার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছিল সুদীপা।

কেয়া ভারি সরল মেয়ে। রাগ দুঃখ অভিমান—কোন কিছুই পুষে রাখতে জানে না। সে হেসে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে—'

'কী?'

'দাদার সম্বন্ধে তোকে সব শুনতেই হবে। না হলে তোর সেই ধারণাটা থেকেই যাবে।'

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলেছিল, 'আচ্ছা শুনব।

কেয়ার সঙ্গে সন্ধি হবার পর মাঝে-মধ্যে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় ওদের বাড়ি যেত সুদীপা। কোন কোন দিন কেয়াকেও নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসত। ঠাকুমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। হেমনলিনী ওকে খুব পছন্দ করতেন। তবে বাবার সঙ্গে ওর আলাপ করানো যায় নি। কেননা, তিনি তখন 'নবজীবন হাউসিং-'এর অফিসে থাকতেন।

যাতায়াতের ফলে কেয়াদের সব খবরই জেনে ফেলেছিল সুদীপা। সব মিলিয়ে ওরা চারজন। কেয়া, রণবীর, ওদের মা এবং বাবা।

কেয়ার বাবা প্রিয়নাথ মুখার্জী ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। দু'একদিন তাঁকে দেখেছেও সুদীপা। কোলকুঁজো-মার্কা চেহারা, বাঁকানো পিঠ, ঘোলাটে চোখে

বাইফোকাল লেন্সের গোল চশমা। একদিকে নিকেলের ডাঁটি ভেঙে গিয়েছিল সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সেটা জুড়ে নিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। পরনে মোটা ধুতি সস্তা লংক্লথের পাঞ্জাবি, জুতোতে বেশ ক'টা তালি।

সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যেতেন প্রিয়নাথ, ফিরতেন রাত দুটোয়। অফিসের পর এক মারোয়াড়ির গদিতে গিয়ে খাতা লিখতেন। দু'জায়গার কাজ করেও সংসার চালাতে তাঁর জিভ বেরিয়ে যেত। বাড়িভাড়া, চারটে মানুষের খাওয়া-পরা এবং ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ—এসব টানতে তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছিল।

রিটায়ারমেন্টের খুব বেশি দেরি ছিল না। তারপর কী করে চলবে, ভাবতেই প্রিয়নাথের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সারাক্ষণ যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। তাঁর দিকে তাকালে একটা সন্ত্রস্ত ভারবাহী পশুর কথা মনে পড়ে যেত।

অথচ ছেলেমেয়েকে ঘিরে তাঁর উচ্চাশা ছিল বিশাল। টিফিন খেতেন না খানিকটা সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে, খানিকটা হেঁটে অফিসে যেতেন। এভাবে পয়সা বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে, ভাল কলেজে পড়াতে চেষ্টা করেছেন। কেয়ার দিক থেকে তাঁর আক্ষেপ নেই। কিন্তু রণবীর সম্পর্কে তাঁর প্রচুর দুঃখ। ইচ্ছা ছিল, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি-টিগ্রি নিয়ে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে ছেলে তাঁর পেছনে দাঁড়াক। তা হলে শেষ বয়সে তিনি একটু আরাম পান। কিন্তু প্রিয়নাথ যা ভেবেছিলেন, ঘটল তার উল্টো।

রণবীর সম্পর্কে কেয়া আর তার মায়ের কাছে টুকরো টুকরো ভাবে সুদীপা যা শুনেছে তা এইরকম।

রণবীর পড়াশোনায় দারুণ ভাল। শুধু তাই না, খেলাধুলা, গানবাজনা, ব্যবহার, ভদ্রতা—সব দিক থেকেই সে ছিল ব্রিলিয়ান্ট। স্পোর্টস আর মিউজিকে প্রচুর কাপ মেডেল আর ট্রফি পেয়েছে। কেয়া সেসব তাকে দেখিয়েও ছিল।

হায়ার সেকেন্ডারীতে এইটি-টু পারসেন্ট মার্কস পেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিল রণবীর। কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই পার্টিতে ঢুকল সে। সে চোখের সামনে তখন তার আইডিয়ালিজমের স্বপ্ন। পড়াশোনার দিকে আর নজর রইল না। দিনরাত হয় পোস্টার লিখছে, নয়তো মিছিল বার করছে কিংবা স্ট্রীট কর্ণার মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছে। এসব করতে থার্ড ইয়ারে আর ওঠা হল না। কিন্তু তীব্র নেশার মতো রাজনীতি তখন তার রক্তের ভেতর ঢুকে গেছে। সে বুঝতে পারছিল, ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ভাল রেজাল্ট করতে হলে লেখাপড়ায় যে সময় দিতে হবে সেটা তার হাতে নেই। পলিটিক্স আর পার্টি তার সব কিছু তখন ছিনিয়ে নিয়েছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে বি. এস. সিতে ভর্তি হয়েছিল রণবীর এ নিয়ে প্রিয়নাথ খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা তুই কী করলি খোকন?'

রণবীর বলেছিল, 'ভেবে দেখলাম ইঞ্জিনীয়ার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

ভয়ে ভয়ে প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'একটা কথা বলব ?'

'কী ?'

'লেখাপড়াটা কমপ্লীট করে পার্টি-টার্টি করলে ভাল হত না ?'

'তুমি যেভাবে বলছ, সেভাবে হয় না বাবা।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বি. এস-সিটাও পাস করা হল না। যত দিন যাচ্ছিল, নেতাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে সে বুঝতে পারছিল ক্ষমতা দখলই আসল কথা। এম. এল. এ., এম. পি. বা মিনিস্টার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। দেশ বা মানুষ তার পরে। স্বপ্নভঙ্গ যখন হল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার রণবীর বাড়ির দিকে নজর দিল। এতদিন লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বাবার শরীরটা সংসার টেনে টেনে বেঁকে দুমড়ে গেছে। তাঁর দিকে আর তাকানো যায় না। সে ঠিক করে ফেলল, যে ভাবেই হোক একটা চাকরি-টাকরি তাকে যোগাড় করতেই হবে। অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছে। এখন গ্র্যাজুয়েট-ফ্রাজুয়েট হতে গেলে চাকরি পাবার বয়স পার হয়ে যাবে। বাবাকে খানিকটা রিলিফ দেওয়া দরকার। রণবীর অফিসে অফিসে ঘুরতে লাগল, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গাদা গাদা অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে লাগল, কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গা থেকেই প্রাপ্তি-স্বীকারটুকুও আসে না। দু'একটা ইন্টারভিউ যাও এল, তাতে কিছুই হল না। বোঝা গেল, গোটা ব্যাপারটাই একটা শো। আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ ক্যান্ডিডেটের জন্য ভেতরে ভেতরে সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। বার বার সে খারিজ হয়ে যেতে লাগল।

অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে একেবারেই সিনিক হয়ে গেল রণবীর। জীবন সম্পর্কে পেসিমিস্ট হতে হতে সে বুঝতে পারছিল, তার সামনে কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ পুরোপুরি ঝাপসা।

যে মানুষের কোন কাজ নেই, সম্পূর্ণ বেকার যে, তার হাতে আর কিছু না থাক, অফুরন্ত সময় থাকে। পেসিমিস্ট রণবীর সময় কাটাবার জন্য বাড়ির রোয়াকে বা সামনের চায়ের দোকানে বসতে লাগল। পশ্চিমবাঙলায় সে একাই বেকার নয়। সরকারী স্ট্যাটিসটিক্সে যে কয়েক লাখ বেকারের উল্লেখ আছে, তাদের কেউ কেউ এ পাড়াতেই থাকে। আস্তে আস্তে তারাও এসে রণবীরের চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল।

অকুপেশন আর রোজগার না থাকলে যা হয়, রণবীররা মাঝে মাঝেই হল্লা করতে শুরু করল, মারদাঙ্গা বাধাতে লাগল। সাউথ ক্যালকাটার এই অভিজাত এলাকায় সবাই তাদের গায়ে অদৃশ্য স্ট্যাম্প মেরে দিল—অ্যান্টি-সোসাল।

যত শুনেছে ততই এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করেছে সুদীপা। মনে হয়েছে, কারো সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করার আগে তার সব কিছু জানা দরকার। আগের অস্বস্তি কেটে যেতে শুরু করেছিল সুদীপার।

যাই হোক, প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সুদীপা। কতবারই তো

সে কেয়াদের বাড়ি গেছে, রণবীরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাও হয়েছে, কিন্তু আগের মতোই নিজে থেকে সে কখনও কথা বলে নি। তবে তার সম্বন্ধে সুদীপা এই প্রথম কিছুটা কৌতূহল বোধ করেছিল। এক ধরনের দুর্বোধ্য আকর্ষণও।

তারপর কবে যেন একদিন সুদীপাই রণবীরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল।

সে বলেছিল, 'এভাবে নিজেকে নষ্ট করছেন কেন?' ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল কিনা, মনে পড়ে না। তবে এরকমই কিছু বলে থাকবে।

রণবীর চমকে উঠেছিল। সুদীপা যে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে, এটা সে ভাবতে পারে নি। বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

'মানে?'

'আমার মতো একটা অ্যান্টি-সোসাল সম্পর্কে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন?'

সেদিন তার সম্বন্ধে সুদীপা কেয়াকে যা বলেছিল, নিশ্চয়ই রণবীর তা জেনে ফেলেছে। একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সুদীপা। তবে সে দারুণ স্মার্ট ঝকঝকে মেয়ে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'আপনি হয়ত কেয়ার কাছে কিছু শুনে থাকবেন। আপনার সম্বন্ধে না জেনেই কমেণ্ট করেছিলাম। আই অ্যাম স্যরি।'

রণবীর বলেছিল, 'লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমি যা, তা-ই তো আমাকে বলেছেন।'

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলেছিল, 'ওসব কথা মনে করে রাখবেন না।'

সত্যিকার স্পোর্টসম্যানের মতো ভঙ্গি করে রণবীর বলেছিল, 'ও কে, রাখব না।' বলে অল্প হেসেছিল।

'আমার কথার উত্তরটা কিন্তু এখনও পাই নি।'

'ও, নিজেকে নষ্ট করছি কেন—তাই তো?'

আস্তে মাথা নেড়েছিল সুদীপা।

রণবীর হেসে হেসে বলেছিল, 'নষ্ট করা ছাড়া আমার কাছে আর কোন অলটারনেটিভ নেই। ^লস্ট জেনারেশন বলে একটা কথা আছে- শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'আমি তাদেরই একজন।'

'কী বলছেন!'

ঠিকই বলছি। কখনও কখনও সত্যি কথা শুনতে ভীষণ খারাপ লাগে—তাই না? ট্রুথ ইজ ভেরি রুড।'

সুদীপা এবার বলেছিল, 'কেয়ার কাছে শুনছি, ভীষণ ভাল রেজাল্ট করেছিলেন হায়ার সেকেণ্ডারিতে। নতুন করে পড়াশোনাটা শুরু করে দিন?'

চোখ কুঁচকে অদ্ভুত হেসেছিল রণবীর, 'কী হবে তাতে?'

'মানুষ পড়াশোনা করে কেন?'

'ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি-ফিগ্রি বাগিয়ে চাকরি জোটাবার জন্যে। তবে

'তবে কি ?'

'এদেশে যা সিস্টেম তাতে আমাদের মতো ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের চাকরি হয় না।'

'আপনি একেবারে পেসিমিস্ট হয়ে গেছেন।'

কেয়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলেছে, 'বাবা, মা, আমি কত বুঝিয়েছি কিন্তু কারো কথাই শোনে না। সেই যে ওর মাথায় ঢুকেছে, কিছু হবে না—সেটা আর বার করা যাচ্ছে না।'

বোনের 'না'কে আলতো করে একটা টুসকি মেরে রণবীর বলেছিল, 'সেটা কোনদিনই বেরুবে না।'

সেদিন আর কিছু বলে নি সুদীপা। কিন্তু এর পর থেকে প্রায়ই কলেজ ছুটির পর নিজের অজান্তেই যেন কেয়াদের বাড়ি আসতে লাগল সুদীপা। এলেই যে রণবীরের সঙ্গে দেখা হত তা নয়। তবে দেখলেই পড়াশোনার কথা বলত, নতুন করে জীবন শুরু করার কথা বলত।

রণবীর হাসত, মজা করে বলত, 'আপনি একেবারে সোসাল রিফর্মারের মতো আমার পেছনে লেগেছেন দেখছি।'

সুদীপা বলত, 'শুরু করে দেখুন না। এই সিস্টেমের মধ্যেই কিছু একটা হয়ে যাবে।'

রণবীর উত্তর দিত না।

মনে পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল। দিন কয়েক কলেজে যেতে পারে নি। একটু সুস্থ হয়ে বিকেলের দিকে কেয়াদের বাড়ি গিয়েছিল সুদীপা। ইচ্ছে ছিল এর মধ্যে প্রফেসররা যে ক্লাসনোট দিয়েছেন সেগুলো টুকে আনা।

কিন্তু গিয়ে দেখা গেল, কেয়া তখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। কেয়ার মা তাকে মেয়ের ঘরে বসিয়ে কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে বলেছিলেন, 'কেয়া এখনই এসে পড়বে। তুমি একটু একলা থাকো। আমি হাতের কাজটা সেরে আসি।'

কেয়ার মা চলে গেলে সামনের টেবিল থেকে একটা পুরনো ম্যাগাজিন তুলে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুদীপা। হঠাৎ টুংটাং শব্দে মুখ তুলে চাইল। গীটারের বাজনা। মাঝে মাঝে থামছে। আবার বেজে উঠছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল, কাছেই কোথাও রেডিও চলছে। কিছু রেডিও প্রোগ্রাম তো এভাবে থেমে হয় না। নিশ্চয়ই কেউ বাজাচ্ছে। কে হতে পারে ? কেয়ার মা অবশ্যই না। বাড়িতে আর কেউ আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে উঠে পড়েছিল সুদীপা। বাইরে আসতেই মনে হল, কোণাকুণি বাঁ দিকের ঘরটা থেকে শব্দটা আসছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে

আসতেই চোখে পড়ল, তক্তপোশের ময়লা বিছানায় পা ঝুলিয়ে গীটার বাজাচ্ছে রণবীর।

অনেকদিন এ বাড়িতে এসেছে সুদীপা। কেয়ার ঘর ছাড়া আর কোথাও যায় নি। এটা যে রণবীরের ঘর, সে জানত না।

কেয়া যখন নেই, তার মা যখন অন্যদিকে কাজকর্মে ব্যস্ত, সেই সময় প্রায় ফাঁকা বাড়িতে রণবীরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই খারাপ দেখায়। সুদীপা যখন কেয়ার ঘরে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাবে, তক্ষুণি বাজনাটা থেমে গেল। অবাক বিস্ময়ে রণবীর বলল, 'আপনি!'

ফিরে যাওয়া হল না। সুদীপা বলেছিল, 'কেয়ার কাছে এসেছিলাম।'

'ও তো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি।'

'জানি, মাসীমা বলেছেন।' বলে কিছুক্ষণ থেমে সুদীপা আবার শুরু করেছে, 'কেয়ার ঘরে বসেছিলাম। বাজনা শুনে বেরিয়ে এলাম। আপনি বাজাচ্ছিলেন, বুঝতে পারি নি।'

'বুঝলে নিশ্চয়ই এখানে আসতেন না।'

ব্যস্তভাবে সুদীপা বলে উঠেছে, 'না না, তা কেন?'

রণবীর বলেছিল, 'একজন সমাজবিরোধীর হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন।'

সমাজবিরোধী বা অ্যান্টি-সোসাল শব্দটা একেবারে মাথায় বসে গিয়েছিল রণবীরের। কিছুতেই সেটা ভুলতে পারছিল না সে। রণবীরের কথার উত্তর না দিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'আপনি তো ফাইন বাজান।'

'কম বয়সে যখন একটু আধটু স্বপ্ন দেখতাম, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্লাইট আশা-টাশা ছিল তখন গীটারটা শিখেছিলাম। যাক গে, একটা অনুরোধ করব?'

'কী?'

'বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। যদি গা ঘিনঘিন না করে আর ভয় না পান, ঘরে এসে বসুন। প্লীজ—'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করেছিল সুদীপা। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

রণবীরের ঘরটা কেয়ার ঘরের একেবারে উল্টো। যেমন অগোছালো তেমনি নোংরা। তেলচিটে বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। বিছানায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। এখানে ওখানে দড়িতে আধময়লা পাজামা, পাঞ্জাবি আর শার্ট-ফার্ট ঝুলছে। একটা সস্তা টেবিলের ওপর ছেঁড়াখোড়া কিছু রাজনীতির বই, প্যামফ্লেট। পাশেই হাতল-ভাঙা চেয়ার। একটা ভাঙা আলমারিতে প্রচুর কাপ, মেডেল, শীল্ড-টীল্ড ডাঁই করা হয়েছে। কেয়া বলেছিল, তার দাদা ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল এককালে। কাপটাপগুলো সেই পুরানো দিনের স্মৃতিচিহ্ন। মেমারি অফ দা গোল্ডেন পাস্ট।

রণবীর বলেছিল, 'ঘরে তো ইনভাইট করে আনলাম। কোথায় যে আপনাকে বসাই'

তার কথা শেষ হবার আগেই ভাঙা চেয়ারে বসে পড়েছিল সন্দীপা। বলেছিল, 'আপনি ভীষণ কমপ্লেক্সে ভোগেন।'

'হয়তো। ঠিক বুঝতে পারি না।' বলে গীটারটা একটা পুরনো খাপের ভেতর পুরতে লাগল রণবীর।

'আমি এসে আপনাকে বোধ হয় ডিসটার্ব করলাম।'

'কি রকম?'

'বাজাচ্ছিলেন। আমি আসতে বন্ধ হল।'

'আরে না না, গীটারটা ঝেড়ে দেবার জন্যে বাড়ি এসেছিলাম। খাপটা খুলে ভাবলাম, শেষবারের মতো একটু বাজিয়ে নিই।'

ঝেড়ে দেবেন মানে!' বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল সন্দীপা। কথাটার অর্থ সে বুঝতে পারে নি।

রণবীর হেসে ফেলেছে, 'ওটা আমাদের মতো অ্যান্টি-সোসালদের ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে বেচে দেব।'

'বেচবেন কেন?'

দুই আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে রণবীর বলেছিল, 'পকেট ক্যাশ নেই। সিগারেট-ফিগারেট কেনা যাচ্ছে না।'

'সিগারেট খাবার জন্যে গীটারটা বেচে দেবেন!'

'শুধু কি সিগারেট, আরো অনেক কিছু খাব। কী খাব তা অবশ্য আপনাকে বলা যাবে না। আপনি আরো 'হেট' করবেন।'

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে রণবীরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রণবীর এবার একটু থতিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে, তাই না? ও, কে, আপনার অনারে বেচব না। তবে ওটার কোন ইউটিলিটি নেই জঞ্জালের মতো ঘরে পড়ে আছে।'

সন্দীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে কেয়ার গলা শোনা গিয়েছিল। রণবীর বলে উঠেছিল, 'আপনার ফ্রেণ্ড কলেজ থেকে এসে গেছে। যান—'

একটা ছেলে—যার কেরিয়ার ব্রিলিয়াণ্ট হতে পারত, একটু করে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সন্দীপা। দেখা হলেই সে রণবীরকে বলত, 'ক্রিমিন্যাল ছাড়া নিজের এত এনার্জি আর কোয়ালিটি কেউ নষ্ট করে না।'

রণবীর রাগ করত না, হাসত।

সন্দীপা ক্ষেপে উঠত, 'ডোণ্ট লাফ। একটা কথা ভেবে দেখেছেন?'

'কী?'

'আমাদের দেশের মানুষের অ্যাভারেজ লঞ্জিভিটি পঁয়ষট্টি বছর। আপনার বয়স কত?'

রণবীর বলেছিল, 'চব্বিশ।'

'বাকী একচল্লিশ বছর রোয়াকে আড্ডা দিয়ে স্ট্রীট রাফায়েনদের মতো কাটিয়ে দিতে পারবেন?'

রণবীর চমকে উঠেছিল। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় নি।

এর কয়েকদিন বাদে কলেজ ছুটির পর বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিল সুদীপা। আজ সে একাই এসেছে। বাড়ীর কী একটা দরকারী কাজে কেয়া কলেজে আসতে পারে নি।

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সুদীপার চোখে পড়েছিল, খানিকটা দূরে যে পার্কটা রয়েছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে রণবীর। সুদীপার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। রণবীর কি তার জন্যই কলেজ পর্যন্ত চলে এসেছে? নানারকম দুর্নাম শোনা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের শ্রদ্ধাই ছিল সুদীপার। অন্তত এতদিন পর্যন্ত সে এমন কোন আচরণ করে নি যা অশোভন। লুব্ধ নোংরা চোখে কখনও সে তার দিকে তাকায় নি। কিন্তু কলেজের কাছে রণবীরকে দেখে ভীষণ খারাপ লেগেছিল। রাগে এবং উত্তেজনায় সুদীপার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে লম্বা লম্বা পা ফেলে রণবীরের কাছে চলে গেছে সে। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'এর মানে কী?'

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই রণবীর বলেছে, 'কীসের?'

'যদি সৎ সাহস থাকে, একটা কথার উত্তর দিন।'

'কী কথা?'

'আপনি এখানে কী জন্যে এসেছেন?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে।' বলে নিষ্পাপ হেসেছিল রণবীর।

এই উত্তরটা আশা করে নি সুদীপা। ভেবেছিল, রণবীর ঘাবড়ে গিয়ে আজেবাজে কিছু একটা বলবে। এখানে আসার মিথ্যা অজুহাত দেখাবে। তা ছাড়া এই প্রথম সে তাকে 'তুমি' বলেছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'একটা খবর দিতে। কেয়ার সামনে বলতে পারতাম না। ও আজ কলেজে আসে নি বলে চান্সটা নিয়েছি। এক ঘণ্টার মতো ঐ পার্কটায় বসে ছিলাম। তোমাকে দেখে বেরিয়ে এলাম।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করতে করতে সুদীপা বলেছিল, 'কী খবর?'

'অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। বাকী লাইফটা হল্লা করে, রোয়াকে আড্ডা দিয়ে, বাবার ধর্মশালায় ফ্রী-তে খেয়ে কাটানো যাবে না। এবার পজিটিভ কিছু করব।'

একটা ছেলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে যেতে তারই কথায় সে জীবনের নেগেটিভ দিক থেকে ফিরে আসতে চাইছে, এটা খুবই ভাল লেগেছিল সন্দীপার। কিন্তু ভাল লাগাটা মুখেচোখে ফুটে উঠতে দেয় নি। স্থির চোখে শুধু একবার রণবীরের দিকে তাকিয়েছিল সন্দীপা।

রণবীর আবার বলেছিল, 'ভাবছি দু-একদিনের মধ্যে নাইট ক্লাসে অ্যাডমিশন নেব। সেই সঙ্গে নতুন করে চাকরি-টাকরির চেষ্টা করব। বাবার রিটায়ারমেন্টের বেশি দেরি নেই। ফ্যামিলির বার্ডেন টেনে টেনে শরীরটাও ভেঙে গেছে। বাবাকে হেল্প করতেই হবে।'

আধফোটা গলায় সন্দীপা বলেছিল, 'এবার আমাকে যেতে হবে। ফিরতে দেরি হলে বাড়িতে ভাববে।'

রণবীর ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'তোমাকে আর আটকাবো না। বাস স্টপে চল।'

সন্দীপার ভয় ছিল, রণবীর হয়ত তার সঙ্গে ফিরবে। কিন্তু না, তাকে বাসে তুলে দিয়ে সে নীচেই দাঁড়িয়ে ছিল।

রণবীর তার সঙ্গে একই বাসে ফিরুক, সন্দীপা মনে মনে তা চায় নি। তবু ভদ্রতা দেখাতে সে বলেছিল, 'আপনি যাবেন না?'

সন্দীপা তখনও ফুটবোর্ডে। রণবীর নীচু চাপা গলায় বলেছিল, 'আমার মতো হুলিগানের সঙ্গে তোমাকে বাস থেকে নামতে দেখলে পাড়ার লোকেরা কিছু ভাবতে পারে। আমার জন্য তোমার এতটুকু অসম্মান হয়, এ আমি চাই না।'

সন্দীপা আর কিছু বলে নি। সেই মুহূর্তে রণবীর সম্পর্কে এক ধরনের শ্রদ্ধাই হয়েছিল তার।

এর পর থেকে মাঝে-মধ্যে কেয়াকে লুকিয়ে কলেজের সামনের সেই পার্কটায় সন্দীপার সঙ্গে দেখা করত রণবীর। কবে আসবে, সেটা অবশ্য আগেই জানিয়ে দিত। এ ছাড়া কলেজ ছুটির পর প্রায় রোজই সে কেয়াদের বাড়ি যেত এবং অবধারিত নিয়মে রণবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

এর মধ্যে নাইট ক্লাসে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল রণবীর। চাকরির জন্য নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে শুরু করেছিল। বাড়ির সামনের রোয়াকে, চায়ের দোকানে বা রাস্তায় তখন তাকে দেখা যেত না।

সন্দীপাকে আলাদা পেলে রণবীর বলত, 'আমি অনেক চেঞ্জ করে গেছি, তাই না?'

সন্দীপা বলত, 'লোকে তাই বলছে। একেবারে গুড বয়।'

'কে কী বলছে, আই ডোন্ট কেয়ার। তুমি কী বলছ?'

'দেখি আর কিছুদিন।'

ছেলেমানুষের মতো জোরজার করত রণবীর, 'প্লীজ, বলো না—'

সন্দীপা হেসে ফেলত। বলত, 'বদলে গেছ, বদলে গেছ, বদলে গেছ। হলো তো?' কবে থেকে রণবীরকে 'তুমি' শুরু করেছিল, এতকাল বাদে আর মনেও পড়ে না তার।

গভীর গলায় রণবীর বলত, 'এ সবই তোমার জন্যে। তোমার হাতে আমার রি-বার্থ হচ্ছে।'

সন্দীপা চুপ করে থাকত।

খানিকটা ঝুঁকে রণবীর বলতে থাকত, 'তুমি আমার গড। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি ফিনিশড হয়ে যেতাম।'

সন্দীপা এবার বলত, 'কী যে বল!'

একটি যুবককে ভেঙেচুরে নিজের ইচ্ছামতো আকার দিতে কী যে সুখ আর উত্তেজনা তা বোঝানো যায় না। সেই সময়টা আশ্চর্য এক নেশার ঘোরে যেন কেটে যেত সন্দীপার।

তার সঙ্গে রণবীরের কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, পুরো না জানলেও কেয়া কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারত। প্রায়ই বলত, 'তুই ভাই ম্যাজিক জানিস। তোর জন্যে দাদাটাকে আমরা ফিরে পাচ্ছি। মা বাবা রোজই বলে, তোর ঋণ শোধ করতে পারবো না।' বলতে বলতে তার গলায় কৃতজ্ঞতার সুর ফুটে উঠত।

এইভাবেই চলছিল। আচমকা একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেই সন্দীপা দেখে, দোতলার বালকনিতে উমাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময়টা কোনদিনই বাবা বাড়ি থাকেন না। সন্দীপা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে কি বাবার শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে?

ওপর থেকে উমাপ্রসাদ ভীষণ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'দোতলায় ঠাকুমার ঘরে এসো।'

বাবার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠেছিল সন্দীপা। এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে এবং তক্ষুণি মুখ নামিয়ে লন আর গার্ডেনের মধ্যবর্তী নুড়ির রাস্তাটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতর চলে গিয়েছিল।

তখন দোতলার একদিকে থাকতেন উমাপ্রসাদ, আরেক দিকে হেমনলিনী। আর এখনকার মতো তেতলাতেই থাকত সন্দীপা।

ঠাকুমার ঘরে যেতেই চোখে পড়েছিল, থমথমে মুখ করে বসে আছেন উমাপ্রসাদ। হেমনলিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখও গম্ভীর, তবে সেখানে কিছুটা উদ্বেগও ফুটে উঠেছে।

বাবা বলেছিলেন, 'ওখানে বোসো—' বলে আঙুল বাড়িয়ে হেমনলিনীর খাটটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

ভয়ে ভয়ে বসে পড়েছে সন্দীপা।

হেমনলিনী ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'অরে (ওকে) বেশি বকাবকি করিস না নাণ্টু। বুঝাইয়া ক'।'

মেয়ের দিকে চোখ রেখেই বিরক্ত গলায় উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'মা, তুমি চুপ কর।' তারপর সন্দীপাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি ভেবেছ? যথেষ্ট সাবালিকা হয়ে উঠেছ!'

খুব ছেলেবেলায় মা মরে গিয়েছিল বলে বাবা কখনও তাকে বকতেন না, গায়ে হাতে তুলতেন না। বাবার কাছ থেকে এতকাল সে যা পেয়ে এসেছিল তা হল গাঢ় মমতা, অঢেল স্নেহ এবং আদর! কিন্তু সেদিন তাঁর চেহারা একেবারে অন্যরকম। সন্দীপার বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছিল। টের পাচ্ছিল, ঘামে জামা ভিজে যাচ্ছে।

বাবা এবার বলেছিলেন, 'তোমাকে খানিকটা স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। একা একা স্কুল-কলেজে যেতে দিতাম। সেই ফ্রীডমটা এইভাবে মিসইউজ করলে?'

উমাপ্রসাদ কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে কাঁপা গলায় সন্দীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কীসের স্বাধীনতা? কীসের মিসইউজ?'

'বুঝতে পারছ না?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল সন্দীপা অর্থাৎ পারছি না।

উমাপ্রসাদ চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'হু ইজ দ্যাট বাস্টার্ড? কে সে?' তাঁর কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল যেন।

বাবার প্রচণ্ড রাগ এবং উত্তেজনার কারণ কী, এতক্ষণে খানিকটা ধরতে পেরেছিল সন্দীপা। তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত যেন ছুটে যাচ্ছিল। শ্বাস রুদ্ধের মতো সে বলেছে, 'কার কথা বলছ তুমি?'

'সেটা তোমার ভালো করেই জানা আছে।'

সন্দীপা চুপ।

উমাপ্রসাদ আবার বলেছিলেন, 'ক'দিন ধরেই আমার কাছে রিপোর্ট আসছে, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজের সামনের পার্কে একটা ছোকরার সঙ্গে তুমি প্রায়ই আড্ডা দিচ্ছ।'

সন্দীপা বলেছিল, 'আমি একদিনও ক্লাস ফাঁকি দিই নি। তুমি কলেজে খোঁজ নিতে পার।'

উমাপ্রসাদ একটুও দমে যান নি। বলেছেন, 'খোঁজ নেবার দরকার নেই। সেটা তোমার বা আমার পক্ষে সম্মানজনক নয়। ক্লাস ফাঁকি না দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই অফ-পীরিয়ডে গেছ।'

সন্দীপা উত্তর দেয় নি।

উমাপ্রসাদ গমগমে ভয়ঙ্কর গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'এখন বল ছোকরাটা কে? কী নাম?'

সন্দীপা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নি। মুখ নামিয়ে বলেছে, 'রণবীর—আমার এক বন্ধুর দাদা।

'কোথায় থাকে ?'

রণবীরদের রাস্তার নাম জানিয়েছিল সন্দীপা।

সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল শরীরের সব রক্ত দ্রুত উমাপ্রসাদের মুখে উঠে আসছে। তীব্র চাপা গলায় বলেছিলেন, ঐ রাসকেল অ্যান্টি-সোসালটা !'

ঠাকুমা পাশ থেকে বলে উঠেছিলেন, 'এইটা তুই কী করলি দিদি !'

উমাপ্রসাদ আবার বলেছিলেন, 'ছি ছি, এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তোমার এ রকম রুচি কী করে হল ! এ আমি ভাবতেও পারি না।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'আমার কাছে আরো রিপোর্ট আছে। ছুটির পর তুমি ঐ রাসকেলটার পাড়ায় একটা বস্তিতে যাও। নিশ্চয়ই সেটা ওদের বাড়ি।'

'হ্যাঁ।'

স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছেন উমাপ্রসাদ। তারপর বলেছেন, 'লোকের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কী করে যে তুমি ওরকম বাজে ছেলের পাল্লায় পড়লে ! এত দিনের শিক্ষা, কালচার, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড—এ সব কি করে ভুলে গেলে ! ছি-ছি—'

কোন রকমের বুকের ভেতর একটু সাহস জড়ো করে সন্দীপা বলেছিল, 'বাবা, কেউ তোমাকে ভুল খবর দিয়েছে। রণবীর অ্যান্টি-সোসাল রাফায়েন না। চাকরি-টাকরি না পেয়ে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে গিয়েছিল। তাই—'

'স্টপ, স্টপ, স্টপ। একটা থার্ড ক্লাস ছোকরার হয়ে প্লীড করতে তোমার লজ্জা করছে না ! এতই শেমলেস হয়ে গেছ !'

সন্দীপা আর কিছু বলে নি।

উমাপ্রসাদ আবার বলেছেন, 'এখন থেকে তুমি আর বাসে-ট্রামে কলেজে যাবে না।'

সন্দীপা মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'তা হলে কী ভাবে যাব ?'

'মহেশ্বর গাড়ি করে তোমাকে পেঁছে দেবে, ছুটির পর নিয়ে আসবে।'

সন্দীপা চুপ।

উমাপ্রসাদ থামেন নি, 'এখন থেকে কলেজ ছাড়া একা বাইরে বেরুবে না। যদি কোথাও যেতে হয়, আমি নিয়ে যাব।'

ছেলেবেলা থেকে যে স্বাধীনতাটুকু তার ছিল, বাবার একটি কথায় তা নাকচ হয়ে গিয়েছিল।

মহেশ্বর ছিল তাদের দু'জন ড্রাইভারের একজন। পরের দিন থেকে উমাপ্রসাদের হুকুম মতো সে কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

আগে টের পায় নি কিন্তু দু'চার দিন মহেশ্বরের সঙ্গে যাতায়াত করতে সন্দীপা বুঝতে পারল, কবে কখন যেন তার ভাবনায় অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছে

রণবীর। বাবা যা ব্যবস্থা করেছেন, তাতে ওদের বাড়ি যাওয়া সম্ভব ছিল না অথচ ওকে দেখতে ইচ্ছা করত। অফ-পীরিয়ডে কলেজের সামনের পার্কটায় রণবীর এলে অবশ্য দেখা হত। কিন্তু ক'দিন ধরে আসছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভেতর এক ধরনের চাপা কষ্ট হতে থাকত সুদীপার।

রণবীরের বাড়ি যেতে না পারলেও কেয়ার সঙ্গে রোজই কলেজে দেখা হত। মাঝে মাঝে ভাবত, রণবীরের কথা জিজ্ঞেস করবে। সামনের পার্কে তাকে আসতে বলবে। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারত না। অদ্ভুত এক লজ্জা তাকে পেয়ে বসত।

এদিকে কেয়া কিন্তু ট্রাম-বাসের বদলে হঠাৎ গাড়িতে করে কলেজে আসা-যাওয়ার কারণটা জানতে চাইত। কোনদিন সুদীপা বলত, দেরি হওয়ার জন্য গাড়িতে এসেছে। কখনও বলত, শরীরটা খারাপ বলে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে আসতে কষ্ট হয়। তাই বাড়ির গাড়িতে আসা।

দুজনের ছুটি একই সঙ্গে। ফেরার সময় ভারী মুশকিল হত সুদীপার। কেয়াকে নিয়ে ফিরলে মহেশ্বর উমাপ্রসাদকে জানিয়ে দেবে। তাই কোনদিন বলত, 'আজ বাবার অফিস হয়ে বাড়ি ফিরব। তুই চলে যা।' কোনদিন বলত, 'বড় মাসীর খুব অসুখ, তাঁকে দেখতে যাব' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম কেয়া বিশ্বাস করত। ভারি সরল ছিল মেয়েটা। তবে বলত, 'আমাদের বাড়ি অনেকদিন যাস না। মা তোর কথা খুব বলে—'.

সুদীপা বলত, মাসীমাকে বলিস, যাব একদিন।' একটা না একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে সে এড়িয়ে যেত।

কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে কত আর মিথ্যে বলা যায়? শেষ পর্যন্ত একদিন ধরা পড়তেই হল। বিশাল কলেজ-কমপাউণ্ডের ভেতর অনেকটা জায়গা জুড়ে মেয়েদের আউটডোর গেমের মাঠ। একধারে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা কৃষ্ণচূড়া গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। অফ-পীরিয়ডে কেয়া তাকে সেখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সুদীপা চমকে উঠেছিল। কিছু একটা আন্দাজ করে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?'

'তুই আমাদের অ্যাভয়েড করছিস কেন?'

'না-না, অ্যাভয়েড করব কেন? প্লীজ, শুধু শুধু মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করিস না ভাই।'

কেয়া রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'আমি দু'বছরের বাচ্চা নই যে, যা বলবি তাই মেনে নেব। আসলে—'

সুদীপা বলেছিল, 'আসলে কী?'

'আমরা গরিব, বস্তিতে থাকি—'

কেয়ার কথা শেষ হতে-না-হতেই চেঁচিয়ে উঠেছিল সুদীপা, 'না-না, ওরকম কথা বলিস না পাই। ভীষণ কষ্ট পাব। তোর মতো বন্ধু আমার আর কেউ নেই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে থেকেছে কেয়া।

আর এড়ানো যায় নি। ত ছাড়া মিথ্যে বলে বলে সুদীপা নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হুড়হুড় করে এবার বাবার কথাগুলো বলে গিয়েছিল সে।

সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে কেয়া। তারপর বলেছে, 'তোর বাবা ঠিকই বলেছেন হয়ত। আমাদের কোন স্ট্যাটাস নেই, ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই। তোরা আমরা একেবারে আলাদা সোসাইটির মানুষ। আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে কমপ্লিকেশনই হবে। কিন্তু'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল সুদীপা।

কী হয়েছে?'

তোর কথা খুব জিজ্ঞেস করছিল। একদিন তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করেছিল কেয়া, 'আমি দাদাকে বলেই দেব, তা আর হয় না। ইমপসিবল।'

হঠাৎ কী যেন হয়ে গিয়েছিল সুদীপার। বলেছিল, 'তোর দাদাকে কাল আসতে বলিস।'

কিন্তু—'

গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সুদীপা বলেছিল, আমি যা বললাম তাই করবি। কাল যেন ডেফিনিটলি তোর দাদা আসে।'

কেয়া খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, 'তোর বাবা জানতে পারলে—

'সে আমি বুঝব।'

পরের দিন রণবীর এসেছিল ছুটির সময়। কলেজ-গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপা তার সঙ্গে সবে দুটো কি একটা কথা বলেছে, মহেশ্বর গাড়ি নিয়ে হাজির। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে সে রোজ চলে আসত।

মহেশ্বর অনেকদিন তাদের গাড়ি চালাচ্ছে। অত্যন্ত সৎ এবং বিশ্বাসী মানুষ। বাবা তার ওপর নানা ব্যাপারে নির্ভর করতেন। সেও ছিল তাদের খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী কোন কারণে সুদীপাদের পরিবারের মর্যাদা নষ্ট না হয় সেদিকে ছিল তার তীক্ষ্ম নজর। এই কারণেই সুদীপাকে কলেজে নিয়ে যাবার এবং ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ।

স্থির চোখে একটুক্ষণ রণবীরকে দেখে মহেশ্বর গাড়ির পেছন দিকের দরজাটা খুলে দিয়েছে। খুব শান্ত গলায় বলেছে, 'উঠে এসো দিদি।' রণবীরকে সে চিনত তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করার জন্যই যে গাড়ি করে সুদীপাকে কলেজে পাঠানো হচ্ছে, উমাপ্রসাদ হয়তো তা মহেশ্বরকে জানিয়ে থাকবেন। মহেশ্বর বুঝতে পেরেছি

এই ব্যাপারটার সঙ্গে উমাপ্রসাদের পারিবারিক সুনাম এবং সম্মান জড়িয়ে আছে।

সুদীপা বলেছিল, 'একটু দাঁড়াও মহেশ্বরদা।'

ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'বড়বাবুর অর্ডার নেই। উঠে এসো।'

তখন কলেজ থেকে আরো মেয়ে বেরিয়ে আসছে। সবাই তাদের লক্ষ্য করছিল। সুদীপা ওখানে কোন নাটক করতে চায় নি। বিপন্ন মুখে রণবীরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কাল দুপুরে একবার এসো। সিওর আসবে!' বলেই গাড়িতে উঠেছিল।

রণবীর বলেছিল, 'আসব।'

আর কিছু বলার সুযোগ পায় নি সুদীপা। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল, অ্যাকসিলেটরে চাপ দিতেই সেটা অ্যাসফাল্টের রাস্তা দিয়ে দারুণ স্পীডে ছুটতে শুরু করেছিল।

ইচ্ছা করেই সুদীপা মহেশ্বরকে শুনিয়ে রণবীরকে কাল আসার কথা বলেছিল। সে জানত, ব্যাপারটা উমাপ্রসাদের কানে উঠবেই। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মহেশ্বর জানিয়ে দেবে। জানাক। আসলে সুদীপার মধ্যে ভয়ের বদলে একটা জেদ যেন ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নানাদিক থেকে ভেবে দেখেছে, সে বা রণবীর কোন অন্যায় করে নি। আসলে বাবার মাথায় সোসাল স্ট্যাটাস, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড, ইত্যাদি শেকড় গেড়ে আছে। অনেকটা আজন্মের সংস্কারের মতো। অথচ চিন্তা করে দেখলে এমন কিছুই না। একটা ছেলেকে নেগেটিভ দিক থেকে ফিরিয়ে আনতে সে চেষ্টা করেছে। এর ভেতর আর কী থাকতে পারে! উমাপ্রসাদ যদি এ নিয়ে আবার কিছু বলেন, শিরদাঁড়া শক্ত করে সে মুখোমুখি দাঁড়াবে।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। সেদিন রাত্তিরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাবা চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আবার সেই রাফায়েনটার সঙ্গে মিশতে শুরু করেছ! নিশ্চয়ই তোমার কাছে প্রশ্রয় পাচ্ছে। নইলে তার এতখানি সাহস হয় কী করে?

বুকের ভেতরটা কাঁপছিল ঠিকই। সোজা দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপা বলেছিল, 'রণবীর রাফায়েন না বাবা। তুমি ভীষণ ভুল করছ।'

দাঁতে দাঁতে চেপে উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি যে ধরনের কথা বলছ, সে সব ড্রামা-ট্রামায় শোনা যায়। লাইফ ইজ এ ডিফারেণ্ট থিং। তুমি যেভাবে চলেছ, সেটা বাবা হয়ে আমি এনকারেজ করব না।'

'বাবা—'

সুদীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই উমাপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'তুমি কি আমার এগেনস্টে রিভোল্ট করতে চাও?'

সুদীপা অবাক হয়ে গিয়েছিল. 'কী বলছ তুমি বাবা!'

উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তা হলে চাও না। গুড। কিন্তু তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'তোমার ঠাকুমার বয়েস হয়েছে, তাঁর পক্ষে তোমাকে কনট্রোল করা সম্ভব না। আমার পক্ষেও তোমাকে আগলে বসে থাকা ইমপসিবল। তোমার মা বেঁচে থাকলে এই প্রবলেমটা হয় না। এনি-ওয়ে, কাল থেকে তুমি কলেজে যাবে না।'

সুদীপা চমকে উঠেছিল, 'আমি আর পড়ব না!'

'নিশ্চয়ই পড়বে। কলেজেও যাবে। তবে ওই কলেজে আর নয়।'

'কোথায় তা হলে?'

'পরে জানতে পারবে।'

মনে আছে, এর পর দিন সাতেক বাড়িতেই কেটে গিয়েছিল। তেতলায় নিজের ঘরটা থেকে বেরুত না সুদীপা। জানালার ধারে চুপচাপ বসে থাকত। ঠাকুমা অবশ্য দু'এক ঘণ্টা পর-পরই এসে তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন, 'মন খারাপ করিস না দিদি। বাবায় যা করছে, সব তার ভালর লেইগা। বাপ-মায়ের থিকা বড় কেউ নাই।'

বাবাও কাজে বেরুবার আগে একবার এবং রাত্তিরে ফিরে আরেকবার ঘরে আসতেন। নরম গলায় বলতেন, 'আমার চাইতে বড় ওয়েল-উইশার তোর আর কেউ আছে? বল না মা, বল—'

সুদীপা কিছুই বলত না।

এর মধ্যে কেয়া কোত্থেকে যেন একবার ফোন করেছিল, 'কী রে, কলেজে আসছিস না কেন? শরীর খারাপ হয়েছে?'

সুদীপা বলেছিল, 'না।'

'তা হলে?'

'ঐ কলেজে আমার আর পড়া হবে না।'

'কোন্ কলেজে পড়বি?'

'জানি না। এখন জেলখানায় আটকে আছি। বাবা পরে কী ডিসাইড করেন, দেখা যাক।'

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় কেয়া বলেছিল, 'বিশ্রী লাগছে। কেন যে আমার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল।'

মনে পড়ে, কলেজ বন্ধ হবার দশ দিন বাদে জানলার কাছে সে বসে ছিল। তখন সকাল। সাটটা-টটটা বাজে। সূর্যটা আকাশের ঢালু গা বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে আসছে। অঢেল রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। নীচে তাদের বাগানের গাছগুলোর মাথায় অনবরত পাখি ডাকছিল।

হঠাৎ সুদীপার চোখে পড়েছিল, সামনের রাস্তা দিয়ে রণবীর এদিকে আসছে। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মাথার দিয়ে কি যেন বয়ে গিয়েছিল।

কোথায় যাচ্ছে রণবীর? পলকহীন তাকিয়ে ছিল সন্দীপা। একসময় রাস্তার বাঁক ঘুরে রণবীর সোজা তাদের গেট খুলে বাড়ীর কমপাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল। সেই মুহূর্তে সন্দীপার মনে হয়েছিল নিঃশ্বাস পতন বন্ধ হয়ে গেছে!

নুড়ি রাস্তা মাড়িয়ে একটু পর সে পোর্টিকোর তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

বাবা তখন বাড়িতেই। রণবীরকে দেখামাত্র তাঁর রিঅ্যাকশন কী হতে পারে, ভাবতেই সন্দীপার মাথার ভেতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তও সে আর বসে থাকে নি। ঘর থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি পেরুতে নীচে নেমে এসেছিল।

একতলায় যে বিশাল ড্রইংরুমটা আছে, সেখানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সন্দীপাকে। ভেতরে তখন বাবার গমগমে গলা শোনা যাচ্ছিল, 'আমার পারমিশান ছাড়া এ বাড়িতে তোমাকে কে ঢুকতে দিল?'

বোঝা যাচ্ছিল, সন্দীপা ওপর থেকে নামার আগেই উমাপ্রসাদের সঙ্গে রণবীরের কিছু কথা হয়েছে। হয়ত নিজের পরিচয় সে এর মধ্যেই দিয়েছে।

রণবীর বলেছিল, 'কেউ না। গেট খুলে আমি নিজেই ঢুকেছি।'

দেয়ালের আড়াল থেকে দেখা না গেলেও সন্দীপা বুঝতে পারছিল, বাবার শরীরের রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে। দাঁতে দাঁতে চেপে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।'

'আপনাকে ভয় পাবার তো কারণ নেই। আমি চুরিও করি নি, মার্ডারও করি নি।'

'কী চাও তুমি? হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?'

'তার আগে বলুন, সন্দীপাকে ঘরে আটকে রেখেছেন কেন? শুনলাম কলেজে আর পাঠাবেন না। কেন?'

'সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?'

'না, আমি শুধু জানতে চাইছি।'

'আমি জানাতে বাধ্য নই।'

'বেশ জানাবেন না। তবে জানতে আমি পারবই।'

দেয়ালের পাশ থেকে খানিকটা সরে এসে মুখটা সামনে বাড়িয়ে দরজায় উঁকি দিয়েছিল সন্দীপা। বাবা একটা সোফায় বসে, সামনের সেণ্টার টেবিলের ওপারে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল রণবীর। বাবার চোখমুখ উত্তেজনায় রাগে গনগনে আগুনের মতো মনে হচ্ছিল। রণবীরকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল, সে খুবই শান্ত ধীর এবং উত্তেজনাশূন্য।

উমাপ্রসাদ এবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী কর তুমি?'

রনবীর বলেছিল, 'আপনি তা জানেন। আমার সম্বন্ধে সব 'ডাটা'ই তো কালেক্ট করেছেন, তাই না?'

'তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।'

'ঠিক আছে। এতদিন কিছুই করছিলাম না। রোয়াকে আড্ডা মেরে, হল্লা-বাজি করে টাইম কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, ওয়াগন-ব্রেকারদের দলে ভিড়ে যাব। নইলে চুল্লু স্মাগলিং করব।'

মনে হচ্ছিল, শুনতে শুনতে যে কোন মুহূর্তে উমাপ্রসাদের চোখ দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। নিজের অজান্তেই যেন তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'চুল্লু কী?'

'চোলাই মাল। কান্ট্রি লিকার।'

'তোমার বাবা কী করে?'

'করে না, করেন বলুন। আমার বাবা সম্বন্ধে এমন 'ভাব' শুনতে চাই না যাতে অশ্রদ্ধা আছে। ভদ্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করুন।'

কর্কশ গলায় বিদ্রুপের ভঙ্গিতে উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'অল রাইট, কী করেন?'

'কেরানীগিরি।'

'মাইনে?'

'সাড়ে ছশো।'

'যে বাড়িতে থাকো, সেটা তোমাদের?'

'না। ভাড়া বাড়ি। স্লাম টাইপের।' বলে রণবীর জিজ্ঞেস করেছিল, 'অপোনেন্ট পার্টির উকিলদের মতো উল্টোপাল্টা জেরা করে কী জেনেতে চাইছেন?'

উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। তুমি আমাদের বাড়ীটা দেখেছ?'

'বাইরে থেকে যেটুকু চোখে পড়ে, দেখেছি।'

'এটার দাম দশ লাখ টাকা।'

'হতে পারে।'

'আমাদের ক'টা গাড়ি আছে জানো?'

'না।'

'তিনখানা। আমি বছরে কত টাকা ইনকাম-ট্যাক্স আর ওয়েলথ ট্যাক্স দিই, তোমার আইডিয়া আছে?'

'না, তার দরকার নেই। এক লাখ, দু লাখ, বিশ লাখ, এক কোটি - যত ইচ্ছা আপনি দিন, সো হোয়াট? এসব শোনার মত সময় বা ইন্টারেস্ট কোনটাই আমার নেই।

'আছে আছে, নিশ্চয়ই আছে।' বলতে বলতে হঠাৎ ফেটে পড়েছিলেন, 'এই বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের জন্যে একটা সরল ভালো মেয়েকে ট্র্যাপে ফেলবার চেষ্টা করছ। কিন্তু তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। একটা রাসকেল, স্ট্রীট ডগ, চালাচুলো নেই, বাড়িঘর নেই। তোমার লোভ আর স্পর্ধা দেখে মাথা ঘুরে যায়!'

'কী আজেবাজে বলছেন ?'

'আজে বাজে !'

'নিশ্চয়ই। আপনার বাড়ি, গাড়ি বা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে পেচ্ছাব করার ইচ্ছেও আমার নেই।'

'শাট আপ স্কাউন্ড্রেল। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। স্ল্যাং ইউজ করবে না।'

'তার দরকাব কী ? আপনি একটু ডিসেন্ট হোন, অটোমেটিক্যালি আমিও তাই হয়ে যাব।'

আবাব চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন উমাপ্রসাদ। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, 'নাউ গেট আউট।'

রণবীর নিরুত্তেজ শান্ত গলায় বলেছিল, 'আপনি বললেও আমি এখন যেতে পারছি না।'

'মানে ?'

'সন্দীপার সঙ্গে একবার দেখা করব। তারপর যাব। সেইজন্যে এসেছি।'

'তার কাছে কী দরকার ?'

'গড ?'

'রাইট। সে আমাকে যা দিয়েছে, আপনার বাড়ী-ফাড়ির দাম তার কাছে ফুটো পয়সাও না। দয়া করে তাকে একটু ডাকান।'

'বায়োস্কোপের ডায়লগ শুনবার মতো ধৈর্য আমার নেই। তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।'

'কেন ?'

'ডোণ্ট ডিসটার্ব আস। আমার মেয়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দেবার যোগ্যতা তোমার নেই। তার সঙ্গে লাইফে আর তোমার দেখা হোক, এটা আমি চাই না। প্লীজ গেট আউট।'

'দেখা না করে আমি যাব না।'

'তোমাকে আমি পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করব।'

'সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে না মিস্টার মিত্র। একটা লোফার অ্যাণ্টি-সোসালের সঙ্গে সন্দীপার নাম জড়িয়ে ঝামেলা পাকিয়ে যাবে। কোর্টে কেস উঠলে খবরের কাগজেও তার রিপোর্ট বেরুবে। বী কোয়ায়েট স্যার।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! চাবকে তোমার চামড়া গুটিয়ে দেব।'

'নিজের বাড়িতে আমাকে পেয়ে গেলেও সেটা অত সহজ হবে না।'

'শুয়োরের বাচ্চা—'

'আমাকে যা খুশি বলুন কিন্তু আমার বাবাকে কিছু বললে তার রেজাল্ট ভাল হবে না। টেক কেয়ার।'

'ও. কে.। কিন্তু এ রকম ছেলের জন্ম দিলে বাপ আনটাচড থাকতে পারে না।

এনিওয়ে ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁীছে গেছি। আর এক সেকেন্ড দেরি করলে তোমাকে জুতিয়ে বার করে দেব। মহাবীর, বাহাদুর—' বাড়ির চাকরবাকরদের ডাকতে শুরু করেছিলেন উমাপ্রসাদ।

স্থির চোখে তাঁকে দেখতে দেখতে রণবীর বলেছিল, 'আপনি আমার সঙ্গে আজ যা ব্যবহার করলেন, হোল লাইফ মনে রাখব। এর জন্যে পরে আপনাকে কাঁদতে হবে।' বলে আর দাঁড়ায় নি রণবীর, ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কয়েকদিন বাদে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতার পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে একটা মিশনারী কলেজে সন্দীপাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। ঠিক হয়েছিল, ওখানে হোস্টেলে থাকবে সে। ছুটিছাটায় উমাপ্রসাদ নিজে গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসবেন। মেয়েকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, সব সময় সে যেন নিজেদের স্ট্যাটাস, পারিবারিক স্ট্যান্ডার্ড—এ সবের কথা মনে রাখে এবং মাথা থেকে রণবীরের মতো একটা থার্ড ক্লাস রাসকেলের চিন্তা বার করে পড়াশোনা করে যায়। উমাপ্রসাদ হয়ত ভেবেছিলেন, মেয়েকে কলকাতার বাইরে সরিয়ে দিলে রণবীরের মত ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

নতুন কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দিন দশেক কেটে গেছে। একদিন পর পর চারটে থিওরেটিক্যাল আর একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার পর হোস্টেলে ফিরে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সন্দীপা। ভিজিটর্স রুমে একজন মাঝবয়সী মহিলা বসে আছেন। চেনা মুখ, কেয়াদের বাড়িতে দু'একবার তাঁকে আগেই দেখেছে সন্দীপা। সম্পর্কে ওদের কীরকম আত্মীয়-টাত্মীয় হন।

মহিলাটির গোলগাল নিরীহ টাইপের চেহারা। চোখেমুখে কেমন যেন উদ্বেগ এবং ভয়ের ছাপ ছিল তাঁর। সন্দীপাকে দেখে একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'আমাকে চিনতে পারছ ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসুন—' মহিলাকে বসিয়ে নিজে তাঁর মুখোমুখি বসতে বসতে সন্দীপা বলেছিল, 'আপনি এখানে!'

'তোমার কাছেই এসেছিলাম। একটু দরকার আছে। মানে—' বলতে বলতে বারকয়েক ঢোক গিলেছিলেন মহিলা।

সন্দীপা বলেছিল, 'দরকারের কথাটা পরে শুনছি। আগে একটু চা দিতে বলি।'

মহিলা বলেছিলেন, 'না-না, চা দিতে হবে না। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।'

সন্দীপা শোনে নি। হোস্টেলের রান্নার লোককে দিয়ে চা করিয়ে মিষ্টি আনিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে হতে বলেছে, 'আপনি কি এখন কলকাতা থেকে আসছেন ?'

খেতে খেতে মুখ তুলে আস্তে মাথা নেড়েছেন, 'হ্যাঁ।'

এই টাইপের মহিলারা এমনিতে একা একা একটা রাস্তায় বেরোন না। অথচ

এঁর সঙ্গে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সন্দীপা জিজ্ঞেস করেছে, 'একলাই এসেছেন?'

ভীরু গলায় মহিলা বলেছেন, 'না।'

'তবে?'

গলায় সন্দেশ আটকে গিয়েছিল মহিলার। কাঁপা গলায় বলেছিলেন, 'রণ—রণবীর আমাকে নিয়ে এসেছে।'

মহিলাটিকে দেখার পর থেকে অস্পষ্টভাবে এই রকমই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছিল সন্দীপার। তবু সে চমকে উঠেছে, বলেছে, 'রণবীর কোথায়?'

'বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।' বলে একটু থেমেছেন মহিলা। তারপর কাঁপা ভীরু গলায় বলেছেন, 'ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ওই হোস্টেলে মেয়েদের আইনসম্মত অভিভাবক ছাড়া অন্য কোন অনাত্মীয় পুরুষের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। সন্দীপা বুঝতে পেরেছিল, সেই কারণেই মহিলাটিকে সঙ্গে করে এনেছে রণবীর।

কী করবে, প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারে নি সন্দীপা। একবার ভেবেছিল, রণবীরের সঙ্গে দেখা করবে না। নতুন করে জটিলতা না বাড়ানোই ভাল। পরক্ষণেই সে মনঃস্থির করে ফেলেছিল। মহিলার চা খাওয়া শেষ হতেই বলেছিল, 'চলুন।'

মহিলা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেছিল, 'দেখ মা, তোমার সঙ্গে যে দেখা করতে আসছে, রণবীর আমাকে আগে কিছু বলে নি। এখানে ট্রেন থেকে নামার পর বলেছে। তখন তোমার কাছে না এসে উপায় ছিল না।'

সন্দীপা উত্তর দেয় নি।

মহিলা আবার বলেছেন, 'তোমার আর রণবীরের ব্যাপার কিছু কিছু শুনেছি। এ সব গোলমালের ভেতর আমি থাকতে চাই না। কিন্তু—'

সন্দীপা এবার বলেছে, 'আপনার কোন ভয় নেই। একটু দাঁড়ান, হোস্টেলে সুপারিনটেনডেন্টকে বলে আসি।' কলেজের সময় ছাড়া বাইরে বেরুতে হলে সুপারিনটেনডেন্টের পারমিশান লাগত। সন্দীপা তাঁকে মিথ্যে বলেছিল। বলেছিল, তার এক মাসীমা দেখা করতে এসেছেন, এখনই চলে যাবেন। তাঁকে রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে যাচ্ছে। সুপারিনটেনডেন্ট আপত্তি করেন নি।

হোস্টেলের বাইরে আসতেই, বাঁ দিকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছের তলায় রণবীরকে দেখতে পেয়েছিল সন্দীপা।

মহিলা সন্দীপার সঙ্গে রণবীরের কাছে যান নি। কয়েক পা এগিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি রণবীরের সঙ্গে কথা বল গে।'

রণবীরকে দেখে অদ্ভুত একটা ফীলিং হয়েছিল সন্দীপার। সেটা আনন্দ, উত্তেজনা না বিরূপতা, কিংবা এ সব মিলিয়ে অন্য কিছু—সে বোঝাতে পারবে না। বলেছিল, 'কী ব্যাপার, তুমি!'

রণবীর অল্প হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমিই।'

'এখানকার খবর কী করে পেলে!'

'পেয়ে গেলাম। কলকাতা থেকে এ জায়গাটা তো মোটে পঁয়তাল্লিশ কিলো-মিটার দূরে। তোমার বাবা যদি ওয়ার্ল্ডের শেষ মাথায় নিয়ে তোমাকে লুকিয়ে রাখতেন, খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম।

সুদীপা একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বিব্রতভাবে বলেছে, 'সেদিন বাবা তোমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন। আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। আমি—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে রণবীর। বলেছে, 'ওসব থাক। আমি কালও এসেছিলাম। মহিলা আর লীগ্যাল গার্জেন ছাড়া আর কাউকে তোমাদের হোস্টেলে ঢুকতে দেয় না বলে আজ মাসীমাকে সঙ্গে আনতে হল।'

সুদীপা আগেই তা বুঝেছে। বলেছে, 'আমার কাছে কী দরকার তাড়াতাড়ি বল। বেশিক্ষণ হোস্টেলের বাইরে থাকতে পারব না।'

'আজ না ; কাল বিকেলে কষ্ট করে এই গাছটার তলায় চলে এসো। তখন বলব। প্লীজ আসবে কিন্তু—'

'আজ সুপারিনটেনডেন্টকে মিথ্যে বলে বেরিয়ে এসেছি। কাল কী বলব? রোজ রোজ এভাবে বেরুনো যায় না।'

'কালই শুধু, আর তোমাকে ডিসটার্ব করব না। প্লীজ প্লীজ, কাল আসবে—

'দরকারী কথাটা আজই বলে ফেল না।'

'আজ বলা যাবে না। কাল, কাল—'

'দেখি—'

পরের দিন ছুটির পর আগে হোস্টেলে যায় নি সুদীপা। সোজা পিপুল গাছটার তলায় চলে এসেছিল। তার ভয় ছিল, আগে হোস্টেলে গেলে তার পক্ষে বেরুনো সম্ভব হবে না।

আজ আর সেই মহিলাটিকে সঙ্গে আনে নি রণবীর। গাছতলায় সে একাই দাঁড়িয়ে ছিল।

সুদীপা বলেছিল, 'অনেক রিস্ক নিয়ে চলে এলাম। বুঝতেই পারছ, জানাজানি হলে –' হঠাৎ থেমে বলেছে, 'কী দরকার বল ?'

রণবীর বলেছিল, 'আমার সঙ্গে একটা জায়গায় তোমাকে যেতে হবে।'

সুদীপা চমকে উঠেছে, 'কোথায় ?'

'কাছেই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। পনের মিনিটের ভেতর তোমাকে দিয়ে যাব।'।

'গাড়ি কোথায় ?'

রণবীর ডানদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিল। সামনের বাঁকের মুখে সত্যিই একটা সবুজ প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

সুদীপা বিমূঢ়ের মতো বলেছে, 'কী ব্যাপার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'গেলেই বুঝতে পারবে। এসো এসো।'

দ্বিধান্বিতভাবে সুদীপা বলেছে, 'কিন্তু—'

রণবীর এবার বলেছিল, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

আগেও অনেকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু কখনও রণবীর এমন কোন আচরণ করে নি যাতে তাকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করা যায়। সুদীপা বলেছে, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। তুমি বোধ হয় জানো না, এখানকার হোস্টেলের মেয়েদের কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হয়। তাদের চলা-ফেরা ওঠা-নামা—সব কিছুর ওপর সারাক্ষণ ওয়াচ রাখা হচ্ছে।'

'মোটে পনের মিনিট। প্লীজ—'

কখনও জোরজার, কখনও কাকুতি-মিনতি করে শেষ পর্যন্ত সবুজ প্রাইভেট কারে সুদীপাকে তুলে ফেলেছিল রণবীর। গাড়ীতে মধ্যবয়সী ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুদীপারা উঠতে সে স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তে স্পীড তুলে ফেলেছিল।

সেই মফঃস্বল শহরটা ছিল খুবই ছোট। দু মিনিটের ভেতর গাড়িটা তার বাউন্ডারি ছাড়িয়ে বাইরের খোলা জায়গায় এসে পড়েছিল। সেখানে দুধারে ধানের ক্ষেত। দূরে দূরে এক-আধটা গ্রাম। রাস্তাতেও লোকজন নেই; ক্বচিৎ কখনো দু-একটা গাড়ি হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিনিট বারো পরও গাড়িটা যখন একই রকম স্পীডে ছুটতে লাগল তখন কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সুদীপা। বলেছিল, 'ছুটির পর সব মেয়ে হোস্টেলে ফিরে গেছে। আমার পক্ষে আর বাইরে থাকা সম্ভব না। ফিরে চল।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে খুব নিস্পৃহ গলায় রণবীর বলেছিল, 'এখন ফেরা যাবে না।'

'কেন?'

দরকারী কাজটা এখনও হয় নি, তাই।'

'কখন কাজটা শেষ হবে?'

'এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না।'

'তার মানে! গলার স্বরটা কেঁপে গিয়েছিল সুদীপার।'

রণবীর উত্তর দেয় নি।

সুদীপা বলেছিল, 'তুমি না বলেছিলে পনের মিনিটের ভেতর আমাকে হোস্টেলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে!'

রণবীর বলেছিল, 'না বললে তুমি গাড়ীতে উঠতে না।'

'তোমার মোটিভটা কী?'

রণবীর চুপ।

সুদীপা কিন্তু থামে নি। তাকে হোস্টেলে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনবরত অনুরোধ আর কাকুতি-মিনতি করে গেছে।

মিনিট পঁচিশেক বাদে গাড়িটা একটা গ্রামে ঢুকে একেবারে শেষ মাথায় পুরনো আমলের ভাঙাচোরা একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেকগুলো ছোকরা, সবাই রণবীরের সমবয়সী বাড়িটার সামনের উঁচু বারান্দায় বসে ছিল। সবারই মুখ চেনা। কলকাতায় রণবীরের বাড়ির রোয়াকে বা উল্টো দিকের চায়ের দোকানে দিনরাত ওরা আড্ডা মারত। দু-চারজনের নাম এখনও মনে আছে সুদীপার নেপাল, হরেন, রমেশ ইত্যাদি।

ছোকরাগুলো হৈ-হৈ করে বারান্দা থেকে লাফিয়ে গাড়িটার কাছে দৌড়ে এসেছিল। কোরাসে চেঁচাতে শুরু করেছিল, 'গুরু আ গিয়া, গুরু আ গিয়া। উরি ব্বাস, সঙ্গে করে বৌদিকেও নিয়ে এসেছে রে!'

ভিড়ের ভেতর গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে কে যেন বলেছিল, 'রণা, তুই যা করছিস হিন্দী ফিলিমের হীরোরা ফোর্টিন জেনারেশনেও তা করতে পারবে না।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল সুদীপা।

এদিকে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল রণবীর। নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের থামিয়ে সুদীপাকে বলেছে, 'নেমে এসো।'

রণবীরের ঐ সব বাজে টাইপের সঙ্গীদের দেখে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল সুদীপার। সেই সঙ্গে বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা ভয়ও টের পাচ্ছিল। সে বলেছে, 'না, আমি নামব না।'

রণবীর বলেছে, 'নামো —' বলে সোজা সুদীপার চোখের দিকে তাকিয়েছে।

সুদীপা এবার ভয়টাকে প্রবল শক্তিতে সরিয়ে নেমেই পড়েছিল। আচমকা এক দুর্জয় সাহস তাকে যেন বেপরোয়া করে তুলেছিল। তখনও দিন ফুরিয়ে যায় নি, আকাশে রোদ রয়েছে। দেখাই যাক, রণবীররা কতদূর যেতে পারে।

রণবীর বলেছিল, 'ভেতরে চলো।'

তখনও সুদীপা জানত না, ওই গ্রামটা রণবীরের সারাক্ষণের সঙ্গী নেপালদের। বাড়িটাও তাদেরই তবে ওখানে কেউ থাকত না। ভাঙাচোরা পুরনো নড়বড়ে বাড়িটা রাজ্যের জঞ্জাল আর আগাছা নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো সেই সাহসটুকু মুছে গিয়েছিল সুদীপার। সে বুঝতে পারছিল মারাত্মক এক ফাঁদে পড়ে গেছে। তার হাত-পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যেতে শুরু করেছিল।

ভেতরের উঠোনে জঞ্জাল আর আগাছা সাফ করে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। একটা বুড়ো থুত্থুড়ে পুরুত একধারে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

বোঝা যাচ্ছিল, তাকে ভয়টয় দেখিয়ে আনা হয়েছে। কোন মহিলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। হোস্টেল থেকে তাকে নিয়ে আসার কারণটা এতক্ষণে সন্দীপার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তারপর কী হয়েছিল, মনে নেই। অদ্ভুত এক ঘোরের ভেতর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানই বোধ হয় হয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় পুরুতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ সন্দীপার কানে সৌরজগতের ওপারের কোন দুর্বোধ্য শব্দের মতো মনে হচ্ছিল।

একসময় নিজেকে একটা ঘরের ভেতর আবিষ্কার করেছিল সন্দীপা। তখন অন্ধকার। কখন সন্ধ্যে নেমেছিল সে জানে না। দুধারে দুটো বড় লণ্ঠন জ্বলছিল মেঝের একধারে ফুলটুল দিয়ে সাজানো একটা নতুন বিছানা। তার তিন ফুট দূরে রণবীর দাঁড়িয়ে।

এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপার কারো জীবনে কখনও ঘটেছে বলে সন্দীপা শোনেনি। সেই মুহূর্তে তার কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিল না সন্দীপা। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছিল সে।

আর তখনই রণবীরের বজ্জাত বন্ধুরা বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করতে করতে বলেছিল, রণা, শেকল তুলে দিলাম। এবার হোল নাইট হানড্রেড মাইল স্পীডে ফুর্তি চালিয়ে যা।' বলে হল্লা বাধিয়ে হেসে উঠেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সন্দীপা। মুখ থেকে হাত সরাতেই চোখে পড়েছিল আঙুলে সিঁদুর লেগে আছে। সমস্ত অস্তিত্ব দুমড়ে ফাটিয়ে একটা কান্না বেরিয়ে এসেছিল তার, 'এ তুমি কী করলে?'

রণবীর বলেছিল, 'আমার এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সন্দীপা বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও হোস্টেলে ফিরে গেলে -'

'তা আর হয় না।'

সেই সাহসটাকে প্রাণপণে ফিরে এনে সন্দীপা এবার বলেছিল, 'না ছাড়লে আমি চিৎকার করব।'

রণবীর বলল, 'কোন লাভ নেই। আসবার সময় নিশ্চয়ই দেখেছ, আসল গ্রামটা এখান থেকে অনেক দূরে। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না।'

'আমার বাবা তোমাকে অপমান করেছিলেন বলে এভাবে রিভেঞ্জ নিলে?'

'রিভেঞ্জ না।' বলে একটু চুপ করে থেকে রণবীর বলেছে, 'তোমার বাবার কাছে আমি গ্রেটফুল। তিনি তোমাকে এই মফঃস্বল টাউনে পাঠিয়ে দেবার পরই টের পেলাম তোমাকে ছাড়া আমার জীবন ইনকমপ্লীট। তোমাকে আমার চাই-ই। তাই—'

'এর রেজাল্ট কী হবে জানো?'

'খুব খারাপ হবারই সম্ভাবনা। তবু একটু রিস্ক নিয়ে তোমাকে দাগী করে

দিলাম। কেন করলাম, সেটা তুমি পরে বুঝতে পারবে।'

যতদূর মনে আছে, সেই বাড়িটায় তিনটে দিন রণবীররা তাকে আটকে রেখেছিল। তারপর চতুর্থ দিন এসেছিল পুলিশ, তাদের সঙ্গে উমাপ্রসাদ।

এমনিতে বাবা ছিলেন সাহেবী মেজাজের মানুষ। দারুণ ফিটফাট। তাঁর ট্রাউজার্স বা শার্টের প্রতিটি ক্রীজ থাকত অটুট, টাইয়ের 'নট' নিখুঁত, গাল মসৃণভাবে কামানো, সিঁথির রেখাটি একচুল এধার ওধার হবার উপায় ছিল না। সেই উমাপ্রসাদকে তখন আর চেনা যাচ্ছিল না। চুল উস্কখুস্ক, খাপচা খাপচা দাড়ি চোখ দুটো টকটকে লাল, তার নীচে কালির পোঁচ। দেখেই বোঝা যায়, কয়েক রাত তিনি ঘুমোন নি। পরনে আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি।

বাবাকে দেখেই দৌড়ে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুদীপা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। আর বাবা রণবীরের দিকে আঙুল তুলে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'অ্যারেস্ট দ্যাট বাস্টার্ড।'

রণবীর বাধা দেয় নি বা পালাবারও চেষ্টা করে নি। গভীর চোখে কয়েক পলক সুদীপার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে পুলিশ অফিসারের কাছে এসে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু সে-ই না, তার বন্ধুদের কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। বাকী সবাই পুলিশ ভ্যান দেখেই পালিয়ে গেছে।

এরপর সমস্ত ব্যাপারটা চলে গিয়েছিল কোর্টে। বেশ কয়েক বছর বাদে উমাপ্রসাদ আবার গাউন পরে আদালতে গিয়েছিলেন। জীবনে এটাই তাঁর শেষ কেস। একগুঁয়ে একটা জেদ আর প্রতিহিংসা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। রণবীর তাঁর মানমর্যাদা, পারিবারিক সুনাম এবং সুদীপার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি তাকে ছাড়বেন না, যেভাবেই হোক ধ্বংস করে দেবেন।

আশ্চর্য রণবীরের তরফে কোন ল ইয়ার ছিল না। সুদীপা শুনেছে, তাদের বাড়ি থেকে উকিল দিতে চেয়েছিল, রণবীর রাজী হয় নি। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তার মা বাবা, এমন কি কেয়া সুদীপাদের বাড়ি দৌড়ে এসেছিল। উমাপ্রসাদ তাদের ভেতরে ঢুকতে দেন নি।

কেসটা দু মাসের মতো চলেছিল। প্রায়ই সুদীপার ডাক পড়ত কোর্টে। বাবা বাড়িতে যা যা শিখিয়ে পড়িয়ে দিতেন, কোর্টে গিয়ে সে গড়গড় করে করে মুখস্থ বলে যেত। উল্টো দিকে আসামীর কাঠগড়ায় তখন দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর। পারতপক্ষে সে তার দিকে চোখ ফেরাত না। তবু বুঝতে পারত, রণবীর পলকহীন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

একতরফা এই কেসে সাক্ষীদের জেরা-টেরা হয়ে যাবার পর উমাপ্রসাদ রণবীরকে নিয়ে পড়েছিলেন। রণবীর তাঁর বেশীর ভাগ কথারই উত্তর দেয় নি বা নিজেকে বাঁচাবারও চেষ্টা করে নি। ফলে দু মাস বাদে যে রায় বেরিয়েছিল তাতে সুদীপাকে কিডন্যাপ করা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেআইনি একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করে তার সঙ্গে

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস ইত্যাদি মারাত্মক সব কারণে রণবীরের পাঁচ বছর জেল হয়ে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে সাহায্য করার অপরাধে তার বন্ধুদের কারো ছ মাস, কারো তিন মাস, কারো বা এক মাস জেল হয়েছিল।

ইচ্ছা করলে রণবীর হায়ার কোর্টে আপীল করতে পারত; করে নি। সে যেন গোড়া থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, জেল খাটবেই।

সন্দীপার মনে পড়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সেই সময় তার শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে যা বয়ে গিয়েছিল তার জের চলেছিল অনেকদিন। প্রায় সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে শুয়ে বা বসে থাকত সে। পৃথিবী তার কাছে একেবারেই বিস্বাদ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত এক শূন্যতা আর অন্ধকারের ভেতর ক্রমশঃ সে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। অনুভূতির ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছুই ভাল লাগত না। বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে তাকে খেতে হত, স্নানও করতে হত, একটু-আধটু ঘুমোতেও হত। কিন্তু কোনটাই নিজের ইচ্ছায় না, বাবা মা ঠাকুমার অনবরত তাগাদায়।

মনে আছে কেসের রায় বেরুবার পর বেশ কয়েকদিন বাবা অফিসে বেরুতেন না। তার কাছে কাছেই থাকতেন। আর ঠাকুমা তো তাকে মা-পাখির মতো সারাদিন আগলে আগলেই রাখতেন।

বাবা বলতেন, 'বী স্টেডি। মনে করো ওটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট বা নাইটমেয়ার। ট্রাই টু ফরগেট দ্যাট। লাইফ একটা আশ্চর্য ব্যাপার রঞ্জু; যখন ইচ্ছা নতুন করে শুরু করা যায়।'

ঠাকুমাও তাকে রণবীরের কথা ভুলে যেতে বলতেন। বোঝাতেন, 'মনে শক্তি আন দিদি। সামনে পুরা জীবন পইড়া আছে। এইভাবে ভাইঙ্গা পড়লে তো চলব না।'

সন্দীপা বিমূঢ়ের মতো শুধু বাবা আর ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকত।

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেছে। তারপর হঠাৎ একদিন বাথরুমে যেতে গিয়ে শরীরের ভেতর কী বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। মাথা ঘুরে টলে পড়তে পড়তে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলেছিল সে।

ঠাকুমা পাশেই বসে ছিলেন। দৌড়ে এসে তাকে তুলে অদ্ভুত তীক্ষ্ম চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই বমি হতো সন্দীপার; আর সমস্ত শরীরে কিরকম যেন একটা আলোড়ন অনুভব করত। এই সময়টা প্রায় সারাক্ষণই ঠাকুরমার চোখ তার ওপর আটকে থাকত।

দিনকয়েক লক্ষ্য করার পর হেমনলিনী উদ্বেগের গলায় উমাপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু ভাল বুঝি না। তুই ডাক্তার ডাক নান্টু। চিনা (চেনা) ডাক্তার না—'

বাবা তাদের বাড়ির ফিজিসিয়ানকে ডাকেন নি, নর্থ ক্যালকাটা থেকে অন্য ডাক্তার

'কল' দিয়ে এনেছিলেন। পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিলেন 'শী ইজ ক্যারিয়িং। তিন চার মাসের বাচ্চা রয়েছে পেটে।'

ঠাকুমার সতর্কতার কারণ বোঝা গিয়েছিল। প্রেগনান্সির ব্যাপারটা জানাজানি হোক, এটা তিনি চান নি। তাঁদের পারিবারিক ডাক্তার কাছেই থাকেন তাঁর মুখ থেকে কোনভাবে খবরটা বেরিয়ে গেলে এ পাড়ায় মুখ দেখানো যাবে না।

ডাক্তার চলে যাবার পর হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি; বাজপড়া মানুষের মতো বসে ছিলেন তারপর একসময় চাপা অবরুদ্ধ গলায় বাবাই বলেছিলেন, 'এই পাপের চিহ্ন রাখব না। যেভাবে হোক ফ্রি করিয়ে নিতে হবে।'

পুরনো কালের মানুষ হলেও ছেলের এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল হেমনলিনীকে। সামান্য একটা অপারেশনের ব্যাপার। তা হলেই সব লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে সন্দীপা। যে ধাপ্পাবাজ দুশ্চরিত্র রাফায়েল জেল খাটছে, তার বাচ্চার মা হবার মত গ্লানিকর এবং অসম্মানজনক ঘটনা আর কী থাকতে পারে?

কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, আসলে তা নয়। ডাক্তাররা সন্দীপাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, অ্যাবরশান তার স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে তাছাড়া সন্দীপার শরীরে এমন কিছু গোলমাল রয়েছে যাতে এই সন্তান নষ্ট করার ফলে ভবিষ্যতে আর হয়ত কোন বাচ্চাই হবে না।

প্রবল মনের জোর উমাপ্রসাদের। তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন, কলকাতায় থাকবেন না। এখানকার বাড়ি-গাড়ি কয়েক মাসের জন্য ঠাকুর, চাকর, মালি, দারোয়ানদের আর অফিসের দায়িত্ব বিশ্বাসী কর্মচারীদের হাতে দিয়ে সন্দীপা এবং হেমনলিনীকে নিয়ে বম্বে চলে গিয়েছিলেন। বারো শো মাইল দূরে বিশাল সেই মেট্রোপোলিসে লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকার অনেক সুবিধা। সেখানেই সন্দীপার বাচ্চা হয়ে যাবার পর নর্থ বেঙ্গলে এক অরফ্যানেজে তার থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। তারপর মেয়েকে বম্বেরই এক কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে হোস্টেলে থেকে বি এস.-সি. পড়বে।

বি. এস-সি. পাস করার পর তাকে বম্বে থেকেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। আর্কিটেকচারে ডিগ্রি নিয়ে ছ'বছর বাদে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিল সে।

তাকে এভাবে এতগুলো বছর কলকাতা থেকে অনেক দূরে বোম্বাই এবং লণ্ডনে রেখে দেবার মধ্যে উমাপ্রসাদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, রণবীরের সঙ্গে জড়ানো সেই গ্লানিকর অতীতটাকে তার মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা। দুই, ক্রমশঃ তাকে স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। উমাপ্রসাদের ধারণা, সন্দীপা কলকাতায় থাকলে এই দুটোর কোনটাই সম্ভব না। এখানে থাকলে রণবীরকে যেভাবে তার মনে পড়বে, কয়েক হাজার মাইল দূরে লণ্ডনে সেভাবে পড়বে না।

অবশ্য সুদীপাকে আর্কিটেক্ট করিয়ে আনার পেছনে উমাপ্রসাদের আরো একটা পরিকল্পনা ছিল। সে এসে তাঁর হাউসিং কনসার্ণের অনেকটা দায়িত্ব নিতে পারবে।

লণ্ডনে থাকতে রণবীরকে কি তার কখনও মনে পড়ত না? নিশ্চয়ই পড়ত। কিন্তু ঐ বিশাল মেট্রোপলিসের চোখ-ধাঁধানো চমক, নানা দেশের মানুষ, নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব, ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে ইওরোপের নানা দেশে এক্সকার্সান এবং পড়াশোনার চাপ –সব মিলে সেই লজ্জাকর অতীতটাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল আর রণবীর ক্রমশঃ তার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ছ বছর আগে যখন উমাপ্রসাদ সুদীপাকে বোম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন তখন ওর বয়স উনিশ। লণ্ডন ঘুরে আর্কিটেকচারে ডিগ্রি নিয়ে আবার যখন সে কলকাতায় ফিরল তখন পঁচিশ পেরুতে চলেছে। এই ছ বছরে সুদীপা আর বালিকাটি নেই। জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্বও।

কলকাতায় ফিরেই কিন্তু সুদীপা টের পেল, তার স্মৃতি বা ভাবনায় সেই ঘটনার গভীর দাগটা অনেকখানি ফিকে হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায় নি। মনের কোন তলদেশ থেকে অগুনতি স্তর ঠেলে ঠেলে রণবীর উঠে এসেছিল যেন। সুদীপা জানত, তার পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। তার মানে সে দেশে ফেরার আগেই রণবীর ছাড়া পেয়েছে। সে এখন কোথায় আছে, কী করছে, কেয়াই বা কী করছে বা তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা এ সব জানার জন্য হঠাৎ অদম্য এক কৌতূহল তাকে পেয়ে বসেছিল যেন।

লণ্ডনে থাকতে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছিল সুদীপা। একদিন ঠাকুমা বা বাবাকে 'একটু ঘুরে আসি' বলে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ছ বছর আগে এঁরা তাকে একা কোথাও ছাড়তেন না; পাহারাদার হিসেবে বিশ্বাসী ড্রাইভারকে সঙ্গে দিতেন। লণ্ডন থেকে ফেরার পর সে প্রশ্ন আর ওঠে না। বিলেত-ফেরত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পঁচিশ বছরের মেয়েকে আগলে রাখার কথা ভাবা যায় না। তা ছাড়া উমাপ্রসাদ সুদীপা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্তই হয়ে গিয়েছিলেন। সেই বিশ্রী ঘটনাটা নিয়ে নিশ্চয়ই মেয়ে আর মাথা ঘামায় না। দ্যাটস এ ফরগটন চ্যাপ্টার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এধারে-ওধারে খানিকটা ঘুরে কেয়াদের পাড়ায় চলে এসেছিল সুদীপা। এসে অবাক হয়ে গেছে। কেয়াদের সেই বস্তি টাইপের টিনের বাড়িটা আর নেই। সেই জায়গায় একটা হাই-রাইজ বিল্ডিং উঠেছে। উল্টো দিকের চায়ের দোকানটাও দেখা যায় নি; সেখানে একটা চিলড্রেন্স পার্ক হয়েছে। কাউকে জিজ্ঞেস করে যে ওদের কথা জেনে নেবে, তারও উপায় ছিল না। কেননা রণবীরের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অবশ্য দেখা হলেও সুদীপা তাদের সঙ্গে হয়ত কথা বলত না।

ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চিলড্রেন্স পার্কের গায়ে বিউটি স্টোর্সের দিকে চোখ

পড়েছিল সুদীপার। মাঝারি ধরনের এই স্টেশনারি দোকানটা অনেক কালের পুরনো। ছ বছরেও ওখানে কিছুই বদলায় নি। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল-কলেজে যাবার সময় রোজই দোকানটা চোখে পড়ত।

সেই চেনা দোকানদারটাকেও দেখা গেল। উঁচু টুলের ওপর বসে আগেকার মতোই বেচাকেনা করছিলেন। এই ক'বছরে বয়সটা যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে ভদ্রলোকের। চুলগুলো ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

কী ভেবে গাড়ি থেকে নেমে সোজা 'বিউটি স্টোর্সে' চলে গিয়েছিল সুদীপা। খুব একটা ভিড়-টিড় ছিল না। তবু তাকে দেখে দোকানদার ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, আপনাকে কী দেব মা?'

দোকানদার সুদীপাকে চিনতে পারেন নি। ছ বছর আগে রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই তাকে যাতায়াত করতে দেখেছেন। কিন্তু তার চেহারা আগের মতো নেই, অনেকটা বদলে গেছে। তখন তার পরনে জীনস আর শার্ট, চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, চোখে প্রকাণ্ড সান-গ্লাস, বাঁ হাতে ঢাউস ইলেকট্রনিক ঘড়ি। সুদীপা বলেছিল, 'আপনি সবাইকে দিয়ে দিন। তারপর আমি নিচ্ছি।'

দ্রুত অন্য খদ্দেরের বিদায় করে দোকানদার অনেক আশা আর আগ্রহ নিয়ে সুদীপার দিকে তাকিয়েছিলেন।

দরকার ছিল না, তবু একগাদা কসমেটিকস দিতে বলেছিল সুদীপা। তাক এবং আলমারি থেকে নানা ধরনের সুদৃশ্য সব শিশি আর কৌটো নামিয়ে এনে দোকানদার যখন হিসেব করছেন, সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?'

দোকানদার মুখ তুলে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কী খবর?'

উল্টো দিকের হাই-রাইজ বিল্ডিংটা দেখিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'ওখানে ক'বছর আগে একটা টিনের বাড়ি ছিল। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকত। ক বছর কলকাতায় ছিলাম না; এখন দেখছি বাড়িটা নেই—'

কী একটু চিন্তা করে দোকানদার বলেছিলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ওখানে তো রণবীররা থাকত। ছোকরা এমনিতে খারাপ ছিল না পরে অত্যন্ত বজ্জাত আর হারামজাদা হয়ে উঠেছিল।'

সুদীপা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কী উত্তর দেবে যখন ভাবছে, সেই সময় দোকান-দার.ফের বলে উঠেছিলেন, 'অবশ্য ওর মা বাবা বোন, সবাই ছিল বড় ভাল।'

সুদীপা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে, 'ওর বোন কেয়া আমার বন্ধু আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত।'

'আপনি ওদের খবর চান?'

সুদীপা চমকে উঠেছিল। অদ্ভুত এক ঝোঁকের মাথায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রণবীররা যদি এখানে থাকতও, সে দুম করে কি তাদের সামনে গিয়ে

দাঁড়াতে পারত? যে তার জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছিল, তার খোঁজ নেবার জন্য কেন যে সে হঠাৎ ছুটে এসেছিল তার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। সুদীপা বলেছিল, 'মানে ওরা কোথায় থাকে, জানতে পারলে ভালো হতো।'

দোকানদার বলেছিলেন, 'আপনি এক কাজ করুন মা—'

'বলুন।'

'ডান দিকে সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে খানিকটা গেলেই একটা তেতলা বাড়ি পাবেন—উমাপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি। উমাপ্রসাদবাবু হয়ত ওদের খবর দিতে পারবেন।

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কী যেন খেলে গিয়েছিল সুদীপার। বলেছিল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।' বলতে বলতে তার মতো স্মার্ট মেয়েরও গলার স্বর কেঁপে গিয়েছিল।

দোকানদার বলেছিলেন, 'কয়েক বছর আগে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল। উমাপ্রসাদবাবুর মেয়ের সঙ্গে রণবীর কী যেন বাঁদরামি করতে যায়। রেগে উমাবাবু কেন-টেস করে ওকে জেলে পোরেন। রণবীর যখন জেলে, সেই সময় উমাবাবু ওদের বাড়িওয়ালার কাছ থেকে টিনের বাড়িটা কিনে ওর মা-বাবাকে উৎখাত করে দেন। এর জন্য কোর্ট-টোর্ট পুলিশ গুণ্ডা—অনেক কিছু করতে হয়েছে তাঁকে। ওরা যাবার পর উমাবাবু পুরনো বাড়ি ভেঙে একশো ফ্ল্যাটের ঐ মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংটা তৈরি করে একেকটা ফ্ল্যাট একেকজনকে বিক্রি করে দেন। সেই জন্যেই বলছি, রণবীররা কোথায় উঠে গেছে, উমাপ্রসাদবাবু হয়ত জানেন।'

সুদীপা বুঝতে পারছিল, দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য রেখেই বাবা রণবীরদের এ পাড়া থেকে উৎখাত করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন পাঁচ বছর জেল খাটার পর রণবীর এখানেই ফিরে আসবে। আর চিরকাল লণ্ডনে পড়ে থাকবে না সুদীপা। কাছাকাছি থাকলে নতুন করে জটিলতা আর সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই সুদীপা লণ্ডন থেকে ফেরার আগেই তিনি রণবীরদের এ পাড়া থেকে একরকম জোর করেই তুলে দিয়েছিলেন।

সুদীপা দোকানদারকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। দাম-টাম মিটিয়ে কসমেটিকসের প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

দোকানদারের কাছে সব জানলেও বাবাকে রণবীরের কথা জিজ্ঞেস করে নি সুদীপা, ঠাকুমাকেও না। সেটা সম্ভবও ছিল না। তবে হেমনলিনীর কাছে সে অন্য কথা জানতে চেয়েছিল।

বোম্বাই বা লণ্ডনে থাকতে রণবীরের চাইতেও যার কথা অনেক বেশি মনে পড়ত সে হল তার সন্তান। বাচ্চাটাকে নিজের চোখে সে দ্যাখে নি। তার জন্মের সময় সুদীপার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফেরার পর তাকে দেখতে পায় নি। বাবা বলেছিলেন, বাচ্চা ভালো আছে, সুস্থ আছে, তবে তার কথা যেন সুদীপা ভুলে যায়।

কিন্তু তাকে ভোলা যায় নি। দূর বিদেশে অদেখা সেই সন্তানের জন্য প্রায়ই সে অস্থির হয়ে উঠত।

হেমনলিনীকে সুদীপা জিজ্ঞেস করেছে, 'ঠাকুমা, একটা কথা বলব?'

ঠাকুমা বলেছেন, 'কী রে?'

'সে কোথায় আছে?'

হেমনলিনী বুঝতে পেরেছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় বলেছেন, 'তার কথা ভুইলা যা দিদি।'

সুদীপা বলেছে, 'ভোলা কি যায়! তুমিই বলো।'

হেমনলিনীর সত্তর বছরের জীর্ণ হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল। এবার তিনি কিছু বলেন নি।

সুদীপা আবার বলেছে, 'সে কি বেঁচে আছে।'

হেমনলিনী মাথা নেড়েছে, 'আছে।'

কোথায় আছে?'

'তর বাপ জানে।'

'তুমি জানো না?'

'ভাসা ভাসা শুনছি, কার্সিয়াঙের কাছে কই জানি থাকে।'

'তুমি তাকে দেখেছ?'

'না দিদি।'

একটু চুপ। তারপর সুদীপা হেমনলিনীর কোলে মুখ গুজে বলেছে, 'ওকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে।'

গভীর স্নেহে হেমনলিনী তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছেন, 'দেখি তর বাপেরে কইয়া।

হেমনলিনী উমাপ্রসাদকে কিছু বলে থাকবেন। উমাপ্রসাদ একদিন সুদীপাকে বলেছিলেন, 'ডোণ্ট বী ইমোশানাল রঞ্জু। ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আবার যদি নাড়াচাড়া ভাবাভাবি শুরু কর, অনেকরকম প্রবলেম তৈরি হবে।'

ঝাপসা গলায় সুদীপা বলেছিল, 'আমি শুধু একবার দূর থেকে দেখতে চাই বাবা।'

'না—না, ওসব মাথা থেকে বার করে দাও। এক মাস হলো লণ্ডন থেকে এসেছ এবার আমার সঙ্গে তোমাক অফিসে বেরুতে হবে।'

সুদীপা আর কিছু বলে নি।

এর কয়েকদিন বাদেই উমাপ্রসাদ সুদীপাকে নিয়ে অফিসে যেতে শুরু করেছিলেন। প্ল্যানিং আর আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের চার্জে ছিলেন তখন সুবিনয় চ্যাটার্জী। উমাপ্রসাদের বন্ধু এই মানুষটি ছিলেন বিরাট আর্কিটেক্ট। খুবই স্নেহপ্রবণ। বাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'রঞ্জুকে তোমার ডিপার্টমেন্টে দিলাম।

ওকে একটু কাজকর্ম শিখিয়ে দিও।'

সুবিনয়কাকা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। তুমি আমি আর ক'দিন। তারপর রঞ্জুকেই তো এই অফিসের রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে। শুধু আমার ডিপার্টমেন্টেই না, অন্য সব ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মও ওর জানা দরকার।'

'ঠিকই বলেছ। সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করব।'

আর্কিটেকচারের বড় মাপের ফরেন ডিগ্রী সুদীপার ছিল ঠিকই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। খুব যত্ন করে সুবিনয় তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, অন্য ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জরাও সুদীপাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়টা সকালে স্নান-টান করে ব্রেকফাস্ট সেরে বাবার সঙ্গে অফিসে চলে যেতে সুদীপা। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধেয় বাবার সঙ্গেই বাড়ি ফিরত। কোন কোন দিন ফিরতে বেশ রাতও হয়ে যেত। সারাদিন এত খাটতে হত যে বাড়ি ফিরে কোথাও বেরুবার মতো এনার্জি থাকত না। রেডিওগ্রামে দু'একটা গান-টান শুনে রাতের খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ত। পরের দিন আবার সেই একই রুটিন। একটা দিন যেন আরেকটা দিনের হুবহু কার্বন কপি।

ছুটিছাটা বলে কিছু ছিল না সুদীপার। রবিবারও বাবা তাকে সঙ্গে করে অফিসে যেতেন। যত দিন যাচ্ছে, কাজের প্রেসার তত বাড়ছিল। প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টার বদলে পঞ্চাশ ঘণ্টা করে হলে বোধ হয়ে ভাল হত। যাই হোক, ছুটির দিন অন্য এমপ্লয়ীরা অবশ্যই আসেন না। তবে সুবিনয়কাকার মত যে ক'জন তাদের এই কনসার্নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা আসতেন।

এই ট্রেনিং পীরিয়ডের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। অদ্ভুত এক যোগাযোগে নিজের সেই অদেখা সন্তানের অনেক খবর সে জানতে পেরেছিল।

শরীর খারাপের জন্য সেদিন অফিসে যায় নি সুদীপা। দুপুরে বাগানে রঙীন ছাতার তলায় বসে মর্ডান আর্কিটেকচারের একটা বই দেখছিল। ওধারে মালীরা কাজ করছে। এই সময় পিওন একটা রেজিস্টার্ড চিঠি নিয়ে এল।

চিঠিটা উমাপ্রসাদের। সই করে সেটা নিয়ে পাশের একটা চেয়ারে রাখতে গিয়ে দেখল, বাঁ দিকে তলায় লেখা আছে : ইফ আন ডেলিভারড, প্লীজ রিটার্ন টু মাদার মেরি অরফ্যানেজ, কার্সিয়াঙ, ওয়েস্ট বেঙ্গল। বিদ্যুচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সুদীপার। অস্পষ্টভাবে সে শুনেছে, তার অদেখা ছেলে থাকে নর্থ বেঙ্গলের কোন অনাথ আশ্রমে। আশ্রমটার ঠিকানা বা নাম সে এতদিন জানতে পারে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, এই মাদার মেরি অরফ্যানেজই সে আছে, নিশ্চয়ই আছে। অপরিসীম উত্তেজনায় তার রক্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক কাঁপুনি উঠে আসতে শুরু করেছিল। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে প্রবল আলোড়ন চলছিল।

এমনিতে সে অন্যের চিঠি পড়ে না। রুচিতে আটকায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সুদীপা। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে এনভেলাপ খুলে চিঠিটা বার করে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেছে। জানতে পেরেছে তার রক্তের অংশ সেই অজানা সন্তানের নাম দেবাশিস। উমাপ্রসাদ তার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠান। দুমাস পাঠানো হয় নি। যাতে তাড়াতাড়ি পাঠান সেজন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

চিঠিটা খামের ভেতর পুরতে পুরতে সুদীপা স্থির করে ফেলেছিল, যেভাবেই হোক কার্সিয়াঙে যাবে।

রাত্রে উমাপ্রসাদ অফিস থেকে ফিরলে চাকরকে দিয়ে চিঠিটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাঁর ঘরে চলে এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এই চিঠিটা খুলল কে?'

সুদীপা বলেছিল, 'আমি!'

রুক্ষ গলায় উমপ্রসাদ বলেছেন, কেন খুললে?

'ভুল করে খুলে ফেলেছি।'

'ভুল করেও অন্যের চিঠি খোলা উচিত নয়। দ্যাটস ব্যাড। পড়েছ?'

আগে আর কখনও যা করে নি, সেদিন ত-ই করেছিল সুদীপা। মিথ্যাই বলেছিল সে 'না।'

উমাপ্রসাদ হয়ত বিশ্বাস করেছিলেন, হয়ত করেন নি। স্থির চোখে মেয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে নীচে নেমে গিয়েছিলেন।

কার্সিয়াঙে মাদার মেরি অরফ্যানেজে যাবার সুযোগটা এসে গিয়েছিল হঠাৎই। ঐ চিঠিটা আসার মাসখানেক বাদেই।

শিলিগুড়িতে তখন তাদের কনসার্ন একটা বিরাট কোল্ড স্টোরেজ বানাচ্ছে। কীভাবে সাইটে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করতে হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য সুদীপাকে পাঠানো হল। সঙ্গে নিল একজন জুনিয়ার আর্কিটেক্ট আর একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারকে। ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হোটেলে। সবার জন্যই আলাদা আলাদা এয়ার-কুলার বসানো ঘর।

দিন দুয়েক সাইটে ঘুরে কাজকর্ম দেখল সুদীপা। তারপর তৃতীয় দিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কার্সিয়াঙে চলে এসেছিল। ট্যাক্সিওলার সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, সারা দিন কার্সিয়াঙে তাকে থাকতে হবে। তারপর সন্ধেবেলা শিলিগুড়ির হোটেলে ফিরিয়ে আনবে।

কার্সিয়াঙ শহর থেকে একটু দূরে একটা উঁচু টিলার মাথায় মাদার মেরি অরফ্যানেজটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় নি। জায়গাটা চমৎকার। আশেপাশে লোকজনের ভিড় নেই। চারধারে পাহাড়, ছোটখাটো জঙ্গল। ওখানে শুধু নির্জনতা আর অগাধ শান্তি।

অরফ্যানেজের সর্বেসর্বা ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক অসাধারণ মানুষ। সত্তরের মতো বয়স। টান-টান চেহারা। চুলদাড়ি ধবধবে। পরনে সাদা সারপ্লিস, পায়ে সাদা কেডস। চোখমুখ স্নেহের রসে যেন ভাসো-ভাসো। চমৎকার বাংলা এবং নেপালী বলতে পারেন! উত্তর বাংলার মদেসিয়া আর রাজবংশীদের ডায়ালেক্ট সম্ভবতঃ তাদের চাইতেও ভাল বলেন।

অরফ্যানেজের একধারে ছোট চার্চ, তার গায়ে লাল রঙের একতলা ছোট বাড়িটায় ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক থাকেন। অনাথ আশ্রমে লোকেদের জিজ্ঞেস করে করে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল সুদীপা। বলেছিল, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ফাদার।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'কী দরকার মা?'

মুখ নামিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'আপনার অরফ্যানেজে দেবাশিস বলে একটি ছেলে আছে?'

'তোমার কথার উত্তর দেবার আগে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

'বলুন।'

'তোমার পরিচয়টা এখনও আমার জানা হয় নি মা।'

'আমি সুদীপা—সুদীপা মিত্র। একজন আর্কিটেক্ট, কলকাতায় থাকি। একটা কনস্ট্রাকশনের কাজে শিলিগুড়ি এসেছিলাম, সেখান থেকে এখানে এলাম।'

দেবাশিসের কথা তুমি কী করে জানলে মা?'

দয়া করে এই প্রশ্নটা করবেন না! আমার পক্ষে উত্তর দেবার অসুবিধা আছে।'

'বেশ—' বলে একটু কী ভেবে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'দেবাশিস এখানেই থাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সুদীপা। তারপর আস্তে করে বলেছে, 'আমি ওকে একটু দেখতে চাই।'

'তা তো হয় না মা।'

'কেন?'

'অচেনা কারো সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। বারণ আছে।'

'বারণ কেন?'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক সামান্য হেসে বলেছিলেন, 'এর উত্তর আমি দিতে পারব না। যিনি দেবাশিসকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাই ঐরকম।'

আধফোটা গলায় সুদীপা বলেছিল, 'ও। কিন্তু—'

'কী?'

'অনেক আশা নিয়ে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি। ওর কাছে যাব না, ওর সঙ্গে কথাও বলব না। দূর থেকেও ওকে একটু দেখা যায় না?' মুখ তুলে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েছিল সুদীপা।

তার স্বরে এমন এক আকুলতা ছিল যাতে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক এবার আর সোজাসুজি না বলতে পারেন নি। তাঁর মুখে মুহূর্তের জন্য কীসের ছায়া পড়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে। অবশ্য—'

'কী?'

'আমার পক্ষে এটা অন্যায় হচ্ছে। তবু আমি এটা করব এসো—'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক সুদীপাকে সঙ্গে করে চার্চের পেছন দিকে চলে গিয়েছিলেন। ওখানে অরফ্যানেজের স্কুল আর খেলার মাঠ।

তখন টিফিন চলছে। প্রায় পাঁচ-ছ'শো ছেলে সবুজ মাঠে ছোটাছুটি করছিল। দূর থেকে ছ'সাত বছরের একটি ছেলেকে দেখিয়ে আস্তে করে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'ঐ বাচ্চাটা দেবাশিস।'

ফর্সা টুকটুকে চেহারা, মাথায় কোকড়া চুল, বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখ দেবাশিসের। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে ছিল সুদীপা।

এই সময় ঘণ্টা পড়েছিল। টিফিন শেষ। অন্য ছেলেদের সঙ্গে দুদ্দাড় দৌড়ে স্কুলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল দেবাশিস। যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, তাকিয়েই থেকেছে সুদীপা। ক্রমশঃ তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক কিন্তু আর কোন দিকে তাকান নি। একদৃষ্টে দেবাশিসকেই লক্ষ্য করছিলেন। বলেছিলেন, 'চল মা।'

নিঃশব্দে তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিল সুদীপা। যে জন্য এতদূর ছুটে আসা তা হয়ে গেছে। এখন আর তার কিছু বলার নেই।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক হঠাৎ বলেছেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা?

ঝাপসা গলায় সুদীপা বলেছে, 'করুন।'

'অত দূর থেকে একটা অনাথ ছেলেকে দেখতে ছুটে এসেছিলে কেন?

সুদীপা কিছু বলতে চেষ্টা করছিল কিন্তু ঠোঁট দুটো শুধু থরথর করে কেঁপেছে আর দু চোখ জলে ভরে গেছে।

এক পলক তার দিকে তাকিয়ে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক ভারি কোমল গলায় বলেছেন, থাক মা, কিছু বলতে হবে না। যা জানার তা বোধ হয় আমি জেনে গেছি।

আরো খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সির কাছে এসে ফাদার বলেছিলেন, 'একটা কথা মা।'

'বলুন।'

'তুমি যে এখানে এসেছিলে, কাউকে কখনো বলো না।'

'না, বলব না!'

'আমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমিও বলব না। পৃথিবীতে কিছু কিছু

মিথ্যে আছে যা অনেক সত্যের চাইতেও মহৎ, না কি বল ?'

সেই ঋজু সমুন্নত বয়স্ক মানুষটিকে বড় ভাল লেগেছিল সুদীপার। নীচু হয়ে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল সে।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক চোখ বুজে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। একটা কথা বলি মা, যখনই তোমার মনে কষ্ট হবে দেবাশিসকে দেখে যেও।

গভীর কৃতজ্ঞ গলায় সুদীপা বলেছিল, 'আচ্ছা।'

এব পর থেকে প্রতি বছরই ঠাকুমা বা বাবাকে না জানিয়ে বছরে দু'তিন বার করে কার্সিয়াঙের অরফ্যানেজে গেছে সুদীপা। প্রথম প্রথম দূর থেকেই দেবাশিসকে দেখত সে। কবে যেন ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক নিজেই উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ওকে আন্টি ডাকতে বলেছেন। এখানে গেলে সুদীপা তার জন্য প্রচুর টফি লজেন্স চকোলেট ফুটবল বা খেলনা-টেলনা নিয়ে যেত। আব নিত ছবির বই, গল্পের বই, দেশবিদেশের স্ট্যাম্প।

ছেলেটার জন্য সুদীপার কেন যে এত টান, কখনও জানতে চান নি ফাদার ফেয়ার ব্যাঙ্ক। সেও নিজের থেকে তাঁকে কিছু বলে নি।

এদিকে লণ্ডন থেকে তার ফেরার দু বছরের মাথায় উমাপ্রসাদের প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেল, তার ছ মাস পরে আবার একটা স্ট্রোক। পর পর দুটো করোনারী অ্যাটাকে কাজের জগৎ থেকে বাতিল হয়ে গেলেন তিনি। ডাক্তারদের নির্দেশে শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম বন্ধ। কাজেই হাউসিং ফার্মের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ল সুদীপার ওপর।

উমাপ্রসাদের যেবার সেকেণ্ড অ্যাটাকটা হল, সে বছরই মৃন্ময় তাদের কোম্পানির একটা বাড়ি তৈরি করার কনট্রাক্ট দেয় সুদীপাদের। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে সুদীপার আলাপ এবং ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা।

খুব সম্ভব আলাপ-টালাপের বছরখানেক বাদে মৃন্ময় একদিন বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে।'

মৃন্ময় কী বলতে চায় আবছাভাবে বুঝতে পেরেছিল সুদীপা। তবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা ?'

'এভাবে আর ভাল লাগছে না। এবার আমাদের একটা ডিশিসান নিতে হবে।'

'তুমি বিয়ের কথা বলছ নিশ্চয়ই ?

'হ্যাঁ।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।

'ঠিক আছে।'

মৃন্ময়ের সঙ্গে তার মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোথাও কোন গোপনতা ছিল

না। এখন সে অল্পবয়সের কিশোরী নয়। বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল বিদেশবাস তার বয়স যেন অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদকেও মৃন্ময়ের কথা জানিয়েছিল সুদীপা। শুধু তাই না, তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপ করে দুজনেই খুশী। বাবা এবং ঠাকুমার ইচ্ছা, সুদীপার সঙ্গে মৃন্ময়ের বিয়েটা হোক। সেটা তাঁরা আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতেন।

মৃন্ময়ের দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা যেদিন এল, সেদিনই হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদকে জানিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। তখন থেকে তাঁরা এ ব্যাপারে একরকম চাপই দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু সুদীপা মনঃস্থির করতে পারে নি। বহুদিন আগে, হয়ত পূর্বজন্মেই একটা নির্জন পোড়ো বাড়িতে কুৎসিত বিয়ের অনুষ্ঠান আর কার্সিয়াঙের অরফ্যানেজে একটা ছোট্ট ছেলের ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখ তাকে আরো ক'টা বছর দ্বিধান্বিত করে রেখেছিল। এদিকে ঠাকুমা আর বাবার চাপ ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। তাঁরা চাইছিলেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকে যাক। এক-জনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। রোগ আরেক জনের আয়ুকে কেটে-ছেঁটে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কখন কার কী হবে, বলা যায় না। দু'জনেই বেঁচে থাকতে থাকতে সুদীপার বিয়েটা হয়ে যাক, এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য।'

মৃন্ময় অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত এবং সংযত। সে কিন্তু আর একবারও বিয়ের কথা বলে নি। তার ব্যস্ততা নেই। সুদীপা কবে নিজের থেকে এগিয়ে আসবে, সেদিনের আশায় সে অপেক্ষা করে আছে।

শেষ পর্যন্ত সব দ্বিধা কাটিয়ে সুদীপা ফোনে মৃন্ময়কে বলেছিল, 'কাল দুপুরে তোমার সময় হবে?'

মৃন্ময় বলেছিল, 'নিশ্চয়ই। তোমার জন্যে সকাল বিকেল মাঝরাত—যখন বলবে তখনই সময় করে নেব। বল কী হুকুম?'

'দুপুরে, ধরো বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড টু, আমরা আলাদা কোথাও বসতে চাই। তুমি আর আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকবে না।'

'ফাইন। এক কাজ করি বরং। পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্তোরাঁয় একটা টেবিল 'বুক' করে নিই। কোণের দিকে নিরিবিলিতে দিতে বলব। ওখানেই লাঞ্চটা সেরে নেব। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

'আমার আপত্তি নেই।'

এবার গলা নামিয়ে মৃন্ময় বলেছে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সুদীপা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

'জানতে ইচ্ছে করছে হঠাৎ জরুরী তলব কেন?'

'অনেকদিন আগে তুমি একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলে। আমি ভাবার সময় নিয়েছিলাম। মনে পড়ে?'

'অফ কোর্স'।'

'আমার ভাবা শেষ হয়েছে। কাল তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলব।'

'গ্র্যাণ্ড। আজ একটুও হিণ্ট-টিণ্ট দেবে না?'

'নো—'

'কাল দুপুর পর্যন্ত আমাকে সাসপেন্সের ভেতর ফেলে রাখবে? এক্সাইটমেণ্টে আমি মরে যাব।'

'মরবে না। সাসপেন্স আর এক্সাইটমেণ্টটা থাক।' বলেই লাইন কেটে দিয়েছিল সুদীপা।

নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা ঠাকুমা আর বাবাকেও জানিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। তাঁরাও খুব খুশী হয়েছেন।

কিন্তু আজ মৃন্ময়ের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে লাঞ্চ খেতে যাবার আগে সেই মারাত্মক বেনামী চিঠিটা এল। চারদিকে ফেস্টিভ মুড অর্থাৎ উৎসবের আবহাওয়া যখন তৈরি হতে যাচ্ছে তখনই ঝপ করে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। অদৃশ্য কোথাও, হয়ত নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই কোমল সিমফোনি শুরু হয়েছিল; হঠাৎ তার সুর কেটে গেল।

কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল খেয়াল নেই সুদীপার। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। বিছানার পাশেই একটা নীচু স্ট্যাণ্ডে টেলিফোনটা থাকে। চমকে সেটা তুলে 'হ্যালো বলতেই ওধার থেকে লিজার গলা ভেসে এল, 'মিস মিত্র কি বাড়ি এসেছেন?' তার স্বরে রীতিমত উদ্বেগ।

সুদীপা বলল, 'কি ব্যাপার লিজা? অফিসে কিছু গোলমাল-টোলমাল হয়েছে? এনিথিং রং?

'নাথিং ম্যাডাম। লাঞ্চ সেরে আপনার অফিসে ফেরার কথা ছিল। না আসায় আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। তাই বাড়িতে ফোন করে খোঁজ নিলাম।'

'আপনার শরীর কি খারাপ হয়েছে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'না না, আমি ঠিক আছি। পারফেক্টলি অলরাইট। লাঞ্চের পর অফিসে আর ফিরতে ইচ্ছা করল না; সোজা বাড়ি চলে এলাম।' বলেই সুদীপার মনে হল কৈফিয়তটা খুব একটা জোরালো হয় নি। কখনও অফিসের কাজ-টাজ ফেলে সে বাড়ি চলে আসে না।

লিজা হয়ত কিছু বলত, তার আগেই সুদীপা ফের বলল, 'আর কিছু বলবে?'

লিজা বলল, 'রাহা সাহেব বলছিলেন, সাড়ে চারটের সময় কী একটা বিল্ডিং প্ল্যান ফাইনাল করার কথা আছে। সে সম্বন্ধে উনি জানতে চাইছেন—'

'মিস্টার রাহাকে বলে দাও, ও ব্যাপারে কাল অফিসে গিয়ে যা করার করব। এখন ছাড়ছি।'

'আচ্ছা। গুড আফটারনুন ম্যাডাম।'

'গুড আফটারনুন।'

লিজার সঙ্গে কথা বলার পর আরো খানিকটা সময় কেটে গেছে। বাইরে বিকেলের রোদ আরো গাঢ় হয়েছে। বাগানে গাছের ছায়া আরো লম্বা হয়ে গেছে।

শরতের শেষ বেলায় আকাশ বড় মায়াবী। ঝকঝকে নীলাকাশে তুলোর স্তূপের মতো সাদা মেঘ। নরম সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আর আছে পাখি। পাখির ঝাঁক এধার থেকে ওধারে লক্ষ্যহীন ছুটে বেড়াচ্ছে।

বালিশে চিবুক রেখে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিল সুদীপা। কিছুই ভাল লাগছে না তার।

হঠাৎ বাড়িব কাজেব লোক মুনেশ্বর দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে ঢুকল। রীতিমত উত্তেজিত এবং খুশী সে।

মুখ ফিরিয়ে সুদীপা বলল, 'কী হযেছে?'

মুনেশ্বব বলল, 'নয়া সাব আয়া হ্যায়।'

নযা সাব অর্থাৎ মৃন্ময়। সুদীপা চমকে উঠল। মৃন্ময় যে হুট করে বাড়ি চলে আসবে, এটা ভাবতে পারে নি সে। দ্রুত বিছানায় উঠে বসে বলল, 'সাহেব কোথায়?'

'বড়া সাবের কামরায়। বড়া সাব আপনাকে নীচে যেতে বললেন।'

বড়া সাব মানে উমাপ্রসাদ। বোঝা গেল বাবা মৃন্ময়কে নিজের ঘরে বসিয়েছেন।

মৃন্ময় এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। নিয়মিত যাতায়াতের জন্য তার মধ্যে কোন রকম আড়ষ্টতা নেই। তা ছাড়া তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। হেমনলিনী এবং উমাপ্রসাদ তাকে খুবই পছন্দ করেন। হেমনলিনী তো ভাবী নাতজামাইয়ের সঙ্গে দস্তুরমতো ঠাট্টা-টাট্টা করেন। তাঁর কৌতুক এবং মজার মধ্যে সেক্সের গন্ধ মেশানো থাকে।

এক মুহূর্ত কী ভেবে সুদীপা বলল, 'নয়া সাবকে এখানে আসতে বল।'

'জী—' মুনেশ্বর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে লাগল।

মৃন্ময় আগেও সুদীপার এই বেডরুমে কয়েক বার এসেছে। আজও এলে বাবা বা ঠাকুমা খারাপ কিছু ভাববেন না। এখানে তাকে ডাকিয়ে আনার অন্য কারণও আছে। মৃন্ময়ের সঙ্গে তার কিছু খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার। সেখানে অন্য কেউ, বিশেষ করে উমাপ্রসাদ থাকলে খুবই অসুবিধা হবে।

পাঁচ মিনিটও পার হয় নি, মৃন্ময় ওপরে উঠে এল। সুদীপা সামনের সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'বোসো।'

মৃন্ময় বলল, 'আমি এসে হয়ত তোমাকে ডিসটার্ব করলাম। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি যেভাবে রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলে, তাতে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

মৃন্ময়ের চোখে-মুখে, কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ। সেটা যে লোকদেখানো নয়, বরং খুবই আন্তরিক, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুদীপা আবেগহীন গলায় বলল, 'ওভাবে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসা আমার উচিত হয় নি। আই অ্যাম স্যরি। কিছু মনে করো না।'

'না—না, মনে করি নি। আমার জন্য তোমার খাওয়াও নিশ্চয়ই হয় নি।'

'ও ঠিক আছে।'

এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুদীপা। বলল, 'আমি একটা ক্রিমিন্যাল।'

মৃন্ময় বলল, 'ও ব্যাপারটা মাথা থেকে বার করে দাও তো। যত ভাববে ততই মন খারাপ হবে।'

একটু চুপ। তারপর সুদীপা বলল, 'তুমি এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। মনে মনে তাই বোধ হয় চাইছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

'তার আগে কিছু খেয়ে নাও। আমি আনিয়ে দিচ্ছি।'

মৃন্ময় বলল, 'প্লীজ কিছু আনিও না। বিকেলে খেলে শরীর খারাপ হবে। একটু কফি পেলে অবশ্য ভাল হতো।'

মুনেশ্বরকে দিয়ে দু'কাপ কফি আনালো সুদীপা।

হাল্কা চুমুক দিয়ে মৃন্ময় বলল, 'এবার বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না সুদীপা। মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। বোঝা যায়, তার মধ্যে অদ্ভুত এক যুদ্ধ চলছে। এক সময় সে যেন মনঃস্থির করে ফেলে। চোখ তুলে বলে, 'আজ যা বলার জন্যে তোমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে।'

মৃন্ময় বিন্দুমাত্র অস্থিরতা দেখায় না। সে যেন এই রকমই কিছু আশা করেছিল। খুব শান্ত গলায় বলে, 'তুমি কি নিজের ডিসিসন পাল্টাতে চাও?' বলে স্থির চোখে সুদীপার দিকে তাকায়।

'এই মুহূর্তে সে ব্যাপারে কিছু ভাবি নি। তবে—'

'তবে কী?'

'আমার জীবনের একটা দিকের কথা তুমি জানো। কিন্তু আরো একটা দিক আছে যেটা তোমার কাছে টোটালি ডার্ক। অনেক বার তোমাকে বলতে চেষ্টা করেছি, পারি নি।'

মৃন্ময় সামান্য হাসল। বলল, 'এতদিন যখন বল নি তখন আর বলে কী হবে? আমার কাছে দুটোই টেন্স—প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার। পাস্ট নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'তুমি জানো না, আমার লাইফে কত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে। অতীতের স্মৃতি আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার।'

'ফরগেট দ্যাট চ্যাপ্টার। তোমাকে যতটুকু জানি তাতেই আমি হ্যাপি। তার বেশী আর কিছু জানার দরকার নেই।'

'কিন্তু জানাতে না পারলে আমি একেবারেই স্বস্তি পাচ্ছি না। নইলে মনে হবে আমি তোমাকে বিট্রে করছি, ঠকাচ্ছি। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা—এ সবের ওপর রিলেশান গড়ে উঠলে আল্টিমেটলি তা ভাল হয় না।'

মৃন্ময় বলল, 'একটা মেয়ের লাইফে কী অ্যাকসিডেণ্ট আর ঘটতে পারে? কম বয়সে হয়ত অন্য কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করেছিলে—আই মীন কাফ লাভ। হয়ত বিয়ে হয়েছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে। নইলে কিডন্যাপড হয়েছিল। এত বড় সিটিতে যেখানে আট মিলিয়নের ওপর পপুলেশন, হাজার রকম কারেক্টারের মানুষ, সেখানে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

তার শেষ কথাটা শুনতে শুনতে চমকে উঠল সুদীপা।

মৃন্ময় থামে নি, 'এ সব ব্যাপারে আমার কোনোরকম প্রেজুডিস নেই। তোমাকে যেটুকু জেনেছি বা দেখেছি তাতে আমি হ্যাপি। এর মধ্যে ঠকানো বা বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রশ্নই আসে না।'

সুদীপা কী বলবে বুঝতে পারল না।

মৃন্ময় আবার বলল, 'নতুন করে ভাবার কথা বললে না?'

সুদীপা আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

মৃন্ময় বলল, 'বেশ তো, ভাবো। যতদিন না মন স্থির করতে পারছ, আমি অপেক্ষা করব।'

সুদীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মৃন্ময় বলে উঠল, 'একটা খুব আর্জেণ্ট কাজ ফেলে এসেছি, আজ আর বসতে পারছি না। বী স্টেডী, বী লাইভলি অ্যান্ড এভার। মাথা থেকে আজে-বাজে চিন্তাগুলো বার করে দাও। রাত্তিরে ফোন করব। এখন চলি।'

সুদীপা মৃন্ময়ের সঙ্গে নীচে 'লনে'র মাঝখানে নুড়ির রাস্তা পর্যন্ত এল। সেখানে তার নতুন মডেলের ঝকঝকে জাপানী গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল।

॥ সাত ॥

মৃন্ময়ের মধ্যে মিডল ক্লাসের ভ্যাদভেদে কোন ব্যাপার নেই। না কোন প্যানপেনে সেণ্টিমেণ্ট, না কোন পুরানো বাজে সংস্কার। বেশ কয়েক বার গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছে সে। নিজস্ব বিজনেসের কাজে এখনও বছরে দু'একবার ইওরোপ-আমেরিকায় যেতে হয়। নানা দেশের নানা মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাত্রার

প্যাটার্ন লক্ষ্য করে একটা বিরাট লাভ হয়েছে তার। বাঙালীসুলভ ক্ষুদ্রতা আর সংস্কারের দেওয়ালগুলো ভেঙে ফেলতে পেরেছে।

মনের দিক থেকে মৃন্ময় খুবই বলিষ্ঠ মানুষ। শুধু তাই না, তাজা টগবগে আধুনিক এবং উদারও।

যদিও কাল বিকেলে এসে মৃন্ময় তাকে পুরনো ব্যাপার নিয়ে ভাবতে বারণ করে গেছে, তবু সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়ে নি। সর্বক্ষণ তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। মৃন্ময় কাল কিছুতেই শুনতে চাইল না। যত বার বলতে চেয়েছে, তত বারই সে তাকে থামিয়ে দিয়েছে। এখন না পারলেও পরে মৃন্ময়কে বলতেই হবে, নইলে অদ্ভুত এক পাপবোধ সুদীপাকে কিছুতেই স্থির হতে দিচ্ছে না।

কাল রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিল সুদীপা। আজ উঠতে দেরি হয়ে গেল। তবে ভাল ঘুম হাওয়ার জন্য শরীরটা ঝরঝরে লাগছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই বাইরে তাকাল সুদীপা। বেশ রোদ উঠে গেছে। মনে পড়ল, আজ পেঁছুবার আগে একবার সাদার্ন অ্যাভেনিউতে যেতে হবে। তাদের নবজীবন হাউসিং কোম্পানি একটা হাই-রাইজ বিল্ডিং তৈরি করছে। 'পাইল' ড্রাইভিং হয়ে গেছে। এখন 'কলাম' বার করে ওপরের কাজ শুরু হয়েছে। সব ঠিকঠাক চলছে কিনা, সাইটে গিয়ে দেখতে হবে।

কাল পুরানো স্মৃতি যেভাবে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আজ সে ভাবটা আর নেই। মনের ভার এবং অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেছে যেন। বাবা এবং ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন, ভেঙে পড়লে চলবে না। যাই ঘটুক, সে মুখোমুখি দাঁড়াবে। তা ছাড়া এতবড় হাউসিং কনসার্নের সব দায়দায়িত্ব তার। প্রায় শ'খানেক এমপ্লয়ীর একশটা ফ্যামিলি তার ওপর নির্ভর করে আছে। তা ছাড়া সাইটে যারা বাড়ি তৈরি করে, এইরকম আরো কয়েকশ ক্যাজুয়েল ওয়ার্কার রয়েছে। সেই সঙ্গে অসুস্থ বাবা, বয়স্কা ঠাকুমা। সুদীপা যদি মুষড়ে পড়ে, যদি সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, এতগুলো মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

যদিও বেলা হয়েছে, মুনেশ্বর বেড-টিই দিয়ে গেল। এক চুমুকে কাপটা শেষ করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সুদীপা।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা সাদার্ন অ্যাভিনিউতে চলে এল সে। কাল তার পরনে ছিল শাড়ি, দামী গয়না-টয়না। আজ চেনা পোশাকেই তাকে দেখা যাচ্ছে—সেই জীনস, সেই শার্ট, পায়ে পুরু সোলের জুতো। বাঁ হাতে চওড়া স্টীল ব্যান্ডে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ছাড়া অন্য কোন গয়না নেই। কাল সিল্কের শাড়িতে, হীরের গয়নায় সে ছিল এক কমনীয় লাজুক যুবতী। কিন্তু আজ এক

টপ 'বস'—কড়া,গম্ভীর, ব্যক্তিত্বময়ী।

ড্রাইভার গাড়িটা রাস্তার একধারে পার্ক করতেই নেমে সোজা সাইটে চলে গেল সুদীপা।

এধারে ওধারে লোহালক্কড়, সিমেণ্টের বস্তা, বালি, স্টোন চীপস ইত্যাদি ডাঁই হয়ে আছে। 'কলাম' বার করে একতলার ছাদতলার ছাদ ঢালাইয়ের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশটা মজুর এখন পেরেক ঠুকে ঠুকে তক্তা বসাচ্ছে। একধারে দাঁড়িয়ে একজন জুনিয়র সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, নাম বিজন বসু, কাজ তদারক করে যাচ্ছে।

সুদীপা জানে, তার ফার্মের ওয়ার্কাররা কেউ ফাঁকি দেয় না। তারা যেমন কোম্পানীর কথা ভাবে, সেও তেমনি তাদের ইণ্টারেস্টের দিকটা দেখে। কোন কাজ যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর ওয়ার্কাররা কমপ্লীট করতে পারে, মাইনের ওপরও সে তাদের ভাল ইনসেণ্টিভ বোনাস দেয়। যদি শিডিউল্ড টাইমের আগে শেষ হয়ে যায়, সুদীপা এই বোনাসটা দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

সুদীপার একটা হিসেব আছে। তার মতে প্রোফিউজলি পে করলে অর্থাৎ পয়সা বেশি দিলে এবং ব্যবহার ভাল করলে তার রেজাল্ট ভাল হয়। ওয়ার্কাররা খুশী থাকে, কাজটাও দ্রুত শেষ হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা আগে কাজ শেষ হলে লাভ অনেক দিক থেকেই। ওয়ার্কারদের মাইনে বেশি দিন টানতে হয় না। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের দাম ফী মাসেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যত দেরি হবে, কনস্ট্রাকশনের খরচ ততই বেড়ে যাবে। তা ছাড়া বেশি ইণ্টারেস্টে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে বাড়ি করে সুদীপা। ক্লায়েণ্টের কাছ থেকে বিলের টাকা আদায় হলে শোধ দেওয়া হয়। কাজ যত দেরি হবে, ব্যাঙ্কের ইণ্টারেস্টও ততই বেড়ে যাবে। কাজেই ওয়ার্কারদের বাড়তি কিছু দেওয়াটা সব দিক থেকেই লাভজনক।

সাইটে সুদীপার না গেলেও চলে। তবু যে যায় তার কারণ, ওয়ার্কারদের এক্সট্রা উৎসাহ দেওয়া। তা ছাড়া কাজ করতে করতে মেটিরিয়ালের অভাবে বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ অসুবিধা হতে পারে। সুদীপা তক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে কাজ আটকে থাকে না।

সুদীপাকে দেখে বিজন দৌড়ে এল। পঁচিশ-ছাব্বিশের মত বয়স। ধারাল চেহারা। ছেলেটা দারুন স্মার্ট আর ঝকঝকে। তেমনি কাজেরও। সুদীপা তাকে খুবই পছন্দ করে।

বিজন বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

সুদীপা বলল, 'গুড মর্নিং।'

এধার ওধার থেকে ওয়ার্কাররা বলতে লাগল, 'নমস্তে মেমসাব' বা 'নমস্তে দিদিজী' বা 'নমস্তে মাঈজী—'

হাত তুলে তুলে সবাইকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বিজনের দিকে ফিরল সুদীপা।

বলল, 'কাজ কী রকম চলছে ?'

বিজন বলল, 'ভেরি স্মুথ।'

'কোন প্রবেলম ?'

'না।'

'সিমেণ্ট, লোহা, বালি – সব মেটিরিয়াল স্টোর করা আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'এদিকটায় ভালো করে লক্ষ্য রাখবে। কোন মেটিরিয়াল ফুরোবার সাত দিন আগেই জানিয়ে দেবে। জিনিসের জন্য কাজ যেন না আটকায়।'

'আমি লক্ষ্য রেখেছি।'

'গুড।'

বাঁশের ভারায় উঠে কিছুক্ষণ তত্ত্বা মারা দেখল সুদীপা। তারপর সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল। বিজন তার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এল।

অফিসে যখন সুদীপা পেঁছিুল, দশটা বেজে গেছে। এখন সব ডিপার্টমেণ্টেই পুরোদামে কাজ চলছে।

নিজের চেম্বারে ঢুকতেই ওধার থেকে লিজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'গুড মর্নিং—'

'গুড মর্নিং -' নিজের চেয়ারে বসতে বসতে সুদীপা বলল, 'কাল বিকেলে যে চিঠিগুলো এসেছে দেখি।'

লিজা একদৃষ্টে সুদীপার দিকে তাকিয়ে ছিল আর তুলনামূলকভাবে কালকের কথা ভাবছিল। কাল এই মহিলাই কি ঐ রকম ভেঙেচুরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন : কালকের সুদীপা মিত্রের সঙ্গে আজকের এই সুদীপা মিত্রের কোন মিল নেই। এই সুদীপা রীয়াল অফিস বস—গম্ভীর, সীরিয়াস্ এবং প্রবল ব্যক্তিত্বপন্না। লিজা ব্যস্তভাবে বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম—' বলেই চিঠিপত্রের ফাইল নিয়ে সুদীপার টেবিলের কাছে চলে এল।

সুদীপা চিঠির পর চিঠি দেখে যাচ্ছে। লিজা পলকহীন তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। এক সময় হঠাৎ সে বলল, 'ম্যাডাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

সুদীপা বলল, 'কী ?'

'আপনার শরীর আজ ভাল আছে তো ?'

ফাইল থেকে চোখ না তুলে সুদীপা বলল, 'আই অ্যাম অলরাইট। কালও কিছু হয় নি।'

লিজা বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম—'

পুরু সেলের চশমার ভেতর দিয়ে এক পলক তাকিয়েই আবার চিঠি দেখতে লাগল সুদীপা। আবেগহীন ভারী গলায় বলল, 'দিস ইজ অফিস। পার্সোনাল ব্যাপারে

খোঁজখবর নিলে দামী সময় নষ্ট হয়।' বলেই মনে হল, এতটা রূঢ় না হলেই চলত কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

লিজা চমকে উঠল। বলল, 'আই অ্যাম স্যরি ম্যাডাম।'

সুদীপা উত্তর দিল না। কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের ভেতর চিঠিগুলো সম্বন্ধে লিজাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফার্স্ট আওয়ার্সে অফিসে আমার কোন কনফারেন্স আছে?'

রোজকার মতো আজও চিঠির ফাইল আর সেই ছোট ডায়েরি নিয়ে এসেছিল লিজা। ডায়েরীটা সুদীপার প্রতিদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্মের অ্যাডভান্স নোট থাকে। পাতা উল্টে লিজা বলল, 'সাড়ে এগারটায় একটা কনফারেন্স আছে।'

'কীসের?'

'বাড়ি তৈরির ব্যাপারে আমাদের যে সব টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আজ আপনার আলোচনা আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন নিজের জায়গায় যাও।'

লিজা তার টেবিলের দিকে চলে গেল।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারটায় সুদীপা নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা কনফারেন্স রুমের দিকে গেল।

তারপর পাঁচ মিনিটও কাটল না, ফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে কালকের সেই চাপা, মোটা, ঈষৎ ভারী গলা ভেসে আসে, 'চ্যাটার্জী বলছি।'

লিজা দ্রুত দরজার দিকে তাকায়। তারপর খুব নীচু গলায় বলে, 'এখন ফোন করলেন। ভেরি রিস্কি।'

'তোমার 'বস' কি ঘরে আছেন?'

'না। কনফারেন্স রুমে গেছেন।'

'ফাইন। মন খুলে একটু কথা বলা যাক।'

'না স্যার, এখন ওটা ঠিক হবে না। মিস মিত্র যে কোন মোমেন্টে ফিরে আসতে পারেন। লাইনটা ছেড়ে দিন। পরে আমিই আপনাকে ফোন করব।

'ঠিক আছে, বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাবো না। শুধু দু'একটা কথা জানতে চাই।'

'বলুন।'

'কাল তোমার 'বস' তো আপসেট ছিলেন। আজ তাঁকে কী রকম দেখছ?'

'ভেরি স্টেডি। কালকের সেই মুষড়েপড়া ভাবটা নেই। ভীষণ গম্ভীর।

সীরিয়াসলি কাজকর্ম করছেন।'

'আই সী। চিঠিটার ব্যাপারে আজ কিছু বললেন?

'না।'

'কাল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মৃন্ময় দত্তর সঙ্গে তোমার 'বস' যে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলেন তারপর কী হল?'

'জানি না।'

'একটু খোঁজখবর নিও।

'আচ্ছা।'

'এখন এই পর্যন্তই থাক। পরে আবার কথা হবে।'

লিজা ফোন নামিয়ে দিল।

॥ আট ॥

সুদীপা কনফারেন্স রুমে এসে দেখল, সীনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহা, দুই সিভিল ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়ব্রত সান্যাল আর সব্যসাচী তরফদার বসে আছেন।

নিরঞ্জন এবং প্রিয়ব্রতর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। প্রায় ষাটের কাছাকাছি। উমাপ্রসাদের আমল থেকেই ওঁরা এই কনসার্নে আছেন। সব্যসাচী অবশ্য পরে এসেছেন। বয়সও তাঁর অনেক কম। বড় জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। অন্য একটা ফার্ম থেকে তাঁকে বেশি মাইনে দিয়ে সুদীপাই নিয়ে এসেছে।

নিরঞ্জন এবং প্রিয়ব্রতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সুদীপা; কাকা বলে। কোম্পানির সব ব্যাপারেই তাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সুদীপা তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে বলল, 'প্রিয়কাকা, নিরকাকা, আজ কোন্ কোন্ বাড়ির টেণ্ডার নিয়ে ডিসকাসন হবে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'চৌরঙ্গীতে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির হেড কোয়ার্টার বিল্ডিংটা নিয়েই মেইনলি কথা হবে আজই সব ফাইনাল করে পাইল ড্রাইভিং-এর ব্যবস্থা করে ফেলব। ওরা আড়াই বছর সময় দিয়েছে। নেক্সট মান্থে কাজ শুরু করে দিতেই হবে।'

এবার মনে পড়ে গেল সুদীপার। বলল, এ নিয়ে লাস্ট উইকে ডিটেলে আলোচনা হয়ে গেছে। কর্পোরেশন প্ল্যান পাসও করে দিয়েছে।'

'তবু কাজ শুরু করার আগে ব্লু প্রিন্টটা আরেক বার দেখ। লাস্ট মোমেণ্টে যদি কোন গোলমাল ধরা পড়ে' বলে প্রিয়ব্রত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বিরাট হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর বাইরের এবং ভেতরের নকশা সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এই নকশা, ব্লু প্রিণ্ট, সবই সুদীপার জন্য। জটিল নকশাগুলোর কোথায় কী আছে, চোখ বুজে ডিটেলে বলে দিতে পারে সে। আসলে এই হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের পুরো প্ল্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সীনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহাকে। দু'জন জুনিয়র আর্কিটেক্ট সহকারী হিসেবে তাঁকে সাহায্য করেছে। সুদীপাকেও তার অন্যান্য কাজ এবং দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে এ ব্যাপারে হাত লাগাতে হয়েছে। তার সাজেশন অনুযায়ী নিরঞ্জন রাহা নকশায় অনেক কিছু অদলবদলও করেছেন।

টেবিলের উপর ঝুঁকে দ্রুত ব্লু প্রিণ্টগুলো আরো একবার দেখে নিল সুদীপা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে।'

নিরঞ্জন নকশাগুলো ভাঁজ করে বিরাট একটা ফাইলে পুরে ফেললেন। আর সব্যসাচী কিছু কাগজপত্র বার করে সুদীপার সামনে রাখলেন।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কী এগুলো ?'

সব্যসাচী বললেন, 'টেণ্ডার ঐ বাড়িটা তৈরির ব্যাপারে পাইল ড্রাইভ করার জন্য আমরা মাসখানেক আগে যে অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট দিয়েছিলাম, তার রেসপন্সে আটা কোম্পানি টেণ্ডার দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

নেক্সট উইকে কনস্ট্রাকশন শুরু করতে হলে আজই টেণ্ডার ফাইনাল করে ফেলতে হবে।'

মিনিট পনের-কুড়ি আলোচনা করে ওরা একটা টেণ্ডার ফাইনাল করে ফেলল। সুদীপা বলল, তা হলে 'প্র্যাট- মেটার অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস'কে আমাদের ডিসিসান জানিয়ে অফিসিয়াল চিঠি পাঠিয়ে দিন।'

সব্যসাচী বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'এই বাড়িটা ছাড়া আর কোন ব্যাপার আছে ?'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'হ্যাঁ।' একটা ফাইল খুলে কিছু কাগজপত্র বার করে বলতে লাগলেন, রঞ্জু, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, 'ইণ্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্ন', বলে একটা পার্টি আমাদের দিয়ে বাড়ি বানাতে চায়।' খুব ছেলেবেলা থেকে সুদীপাকে দেখেছে প্রিয়ব্রতরা। ওঁরা তাকে উমাপ্রসাদের মতো রঞ্জু বলেই ডাকেন।

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে।'

'ওদের একটা শর্ত ছিল। বাড়ির ফ্রণ্ট ভিউটা কী রকম হবে, ওরা জানিয়ে দেবে। সেই অনুযায়ী নকশা বানাতে হবে। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সময় ম্যাক্সিমাম এক বছর।'

'আমরা তো রাজী হয়েছিলাম। পার্টিকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় নি ?'

'নিশ্চয়ই ।'

'কিন্তু ওঁরা তো এখনও ফ্রণ্ট ভিউর স্কেচ পাঠায় নি ।'

'কাল পাঠিয়েছে । এই যে—'বলে প্রিয়ব্রত বড় মাপের চৌকো একটা আর্ট পেপার সুদীপার হাতে দিলেন ।

সেটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুদীপা । স্কেচ পেন্সিলে আঁকা যে নকশাটা রয়েছে, সেটা হুবহু তাদের বাড়ির ফ্রণ্ট ভিউর মতোই । তবে স্কেচ অনুযায়ী যদি বিল্ডিংটা করা যায়, সেটা হবে তাদের বাড়ির অন্তত তিনগুণ ।

এই কনসার্নের ছোটবড় সব এমপ্লয়ীই সুদীপাদের বাড়ি বহু বার গেছে । বাড়িটার সব কিছু তাদের মুখস্থ । প্রিয়ব্রত বললেন, 'সারপ্রাইজিং । একেবারে তোমাদের বাড়ির রিপ্লিকা । তবে অনেক বড় ।'

সব্যসাচী বললেন, 'একেবারে কার্বন কপি বানালো কী করে কে জানে !

নিরঞ্জন বললেন, 'আমার মনে হয়, রঞ্জুদের বাড়িটা ওরা দেখে থাকবে । দেখে এত পছন্দ হয়েছে যে ঐ রকম একটা বানিয়ে নিতে চায় ।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'সেটাই সম্ভব । রঞ্জুদের বাড়ির মতো ঐ রকম গথিক স্ট্রাকচারের চমৎকার বিল্ডিং কলকাতায় বেশী নেই ।'

প্রিয়ব্রত কথাই হয়ত ঠিক । খুবই যুক্তিসঙ্গত । তবু কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যাচ্ছে । আজকাল কেউ আর মোটা মোটা পিলার দিয়ে এই ধরনের বাড়ি করায় না । এতে জায়গা নষ্ট । এখন সেন্ট পারসেন্ট ক্ষেত্রেই জমি প্রায় না ছেড়ে ফ্রেম স্ট্রাকচারে 'কলাম' বসিয়ে বসিয়ে বাড়ি তোলা হয় । ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ ল্যাণ্ডই এখন উদ্দেশ্য—বিশেষ করে বড় বড় সিটিতে । জমি না ছেড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে উঁচু উঁচু আকাশছোঁয়া বাড়ি উঠছে । ইদানীং স্কাই ইজ দা লিমিট বাগান নেই, ঘাস নেই, ফাঁকা প্লেস নেই । শহর এখন দমবন্ধ, বুকচাপা কংক্রীটের জঙ্গল । অবশ্য উপায়ও নেই । বিগ সিটি, বিশেষ করে কলকাতা বম্বে দিল্লীর মতো শহরগুলোতে জমির দাম হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে । এখানে কেউ এক সেন্টিমিটার জায়গাও নষ্ট করতে চায় না, সবটুকুই লোহায় কংক্রীটে মুড়ে ফেলতে চায় ।

কিন্তু 'ইণ্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্নের' ব্যাপারটা অদ্ভুত । তারা প্রায় দেড় বিঘের মতো জমির বেশির ভাগটাই 'লন' এবং বাগানের জন্য রেখে বাকীটায় গথিক স্ট্রাকচারের বাড়ি তুলতে চায় । ছ'বছরেরও বেশি নিজেদের ফার্মে' বসছে সুদীপা । এরকম বাড়ি সে একটাও তৈরি করে নি । কোন ক্লায়েণ্টের কাছ থেকে এ জাতীয় বাড়ি তৈরির প্রোপোজালও কখনও আসে নি ।

নিরঞ্জন বলছিলেন, তাদের বাড়িটা দেখে 'ইণ্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্ন' ঐ রকম একটা বাড়ি করতে চাইছে । অসম্ভব কিছু নয়, তবু দুর্বোধ্য একটু খট্‌কা থেকেই যাচ্ছে । কেন এই সংশয়, সে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না ।

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তা হলে এই বাড়িটা সম্পর্কে কী ডিসিসান নেওয়া হবে ?'

সন্দীপা বলল, 'আপনারা যা বলবেন তা-ই হবে।'

'ক্লায়েণ্ট বেশ ভালই। টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশানস ঠিকঠাক হয়ে গেলে ওরা কনস্ট্রাকশনের অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স করতে রাজী আছে। বাকী টাকাটা কাজের প্রোগ্রেসের সঙ্গে ইনস্টলমেণ্টে দিয়ে যাবে। বাড়িটা কমপ্লীট করে ক্লায়েণ্টের হাতে যেদিন তুলে দেওয়া হবে, সেদিনই লাস্ট ইনস্টলমেণ্ট পাওয়া যাবে।'

'খুবই রিজনেবল টার্মস। আমাদের রাজী হওয়া উচিত।'

'তা হলে এ ব্যাপারে এগুতে পারি তো ?'

'নিশ্চয়ই। দু'চার দিনের ভেতরেই পার্টির কাছে লোক পাঠান। ওদের আমাদের অফিসে ডাকান। এক বছরের মধ্যে বাড়ি শেষ করতে হলে খুব তাড়াতাড়িই কথাবার্তা বলে সব ফাইনাল করে ফেলুন।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে সন্দীপা বলল, 'প্রিয়কাকা, এই ক্লায়েণ্টের রিপ্রেজেণ্টেটিভ যেই আসুক, আমি যেন একটু জানতে পারি।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তুমি কি পার্সোনালি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাও ?'

'হ্যাঁ। আপনারাও থাকবেন। একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। ওদের কাছে দু'একটা কথা জানতে চাই।'

'কী কথা ?'

'কেন ওরা আমাদের বাড়ির মতো একটা বাড়ি বানাতে চায় ?'

॥ নয় ॥

পুজো এসে গেল। আর চার-পাঁচ দিন বাদেই ছুটি পড়ে যাবে।

সারা বছরের পনেরই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারী—এমনি পাঁচ-সাতটা দিন ছাড়া 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে' বিশেষ ছুটিছাটা থাকে না। তবে এই পুজোর সময়টা পুরো পনের দিন অফিস বন্ধ রাখে সন্দীপা এবং কয়েক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। বাবা ও ঠাকুমাকে বলে, দার্জিলিং যাচ্ছে। আসলে সে যায় শিলিগুড়ি। ওখানেই সব চাইতে দামী হোটেলে দিন কয়েক থাকে। আর রোজ দু'বেলা মাদার মেরি অরফ্যানেজে দেবাশিসকে দেখতে যায়।

বছরের অন্য সময়ও দু'তিনবার শিলিগুড়ি এসে দেবাশিসকে দেখে যায় সন্দীপা। অফিসে এত কাজ যে তখন বেশী দিন থাকতে পারে না। দু'একদিন থেকেই ফিরে যেতে হয়।

এবারও ছুটির আগে অনেক কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে। যে সব বাড়ির প্ল্যানে হাত দেওয়া হয়েছে সেগুলো শেষ করতে হবে। বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লায়ারদের অনেক পেমেণ্ট করতে হবে। ক্লায়েণ্টদের কাছে এক কোটি টাকার মতো পড়ে আছে। সেগুলো আদায় করতে হবে। কর্পোরেশনে অনেকগুলো প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো স্যাংশন করিয়ে নিতে হবে।

আজ অফিসে আসতেই অন্য সব দিনের মতো লিজা কালকের শেষ ডাকের চিঠি নিয়ে এল। ফাইলটা তার সামনে রেখে হাতে নোট-বুক আর প্যাড নিয়ে টেবিলের পাশে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদীপা লিজাকে বসতে বলে চিঠির পর চিঠি উল্টে নোট দিতে লাগল, আর লিজাও শর্টহ্যাণ্ডের প্যাডের পাতায় নোট নিতে লাগল।

দশ-বারোটা চিঠির পর একটা মুখ-আঁটা সাদা খাম দেখতে পেল সুদীপা। এনভেলপটা অবিকল সেদিনকার মতো। তার নাম-ঠিকানা তেমনই টাইপ-করা, এক কোণে 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল' লেখা। বোঝা যায়, এটাও সেই অজানা করেসপণ্ডেন্টের চিঠি। এক মুহূর্তের জন্য সুদীপার রক্তস্রোত থমকে গেল। তারপরই স্বাভাবিক বেগে চলতে শুরু করল।

সুদীপার মনে পড়ল, দিন দশেক আগে এইরকম একটা খাম পাবার পর তার শরীরে এবং মনে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, নার্ভগুলো ছিঁড়ে পড়বে। সেই তুলনায় আজ সে অনেক বেশি স্টেডি, অনেক শান্ত এবং স্থির।

খামটা আস্তে আস্তে তুলে মুখ কেটে চিঠি বার করল সুদীপা। সেদিনকার মতোই টাইপ-করা দশ লাইনের চিঠি। এক পলক তাকিয়েই টের পাওয়া যায়, আগের চিঠিটা এবং এই চিঠিটা একই মেশিন থেকে টাইপ করা হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে পড়তে লাগল।

বক্তব্য এই রকম। আপনাকে আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। আপনার সন্তান কোথায় আছে, ইংরেজী নিউজপেপারের 'পার্সোনাল কলামে' তা জানাবার জন্য অনুরোধ করলাম। দশ দিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আপনি কিছুই জানান নি। আরো একবার আপনাকে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে খবরটা জানান। চিরকাল আপনার কাছে এই কারণে কৃতজ্ঞ থাকব।

নীচে কারো নাম নেই।

আগের বারও নিউজপেপারের 'পার্সোনাল কলামে' দেবাশিসের নাম-ঠিকানা জানায় নি সুদীপা। এবারও ঠিক করল—জানাবে না। চিঠিটা ভাঁজ করে ফের খামে পুরতে পুরতে চোখের কোণ দিয়ে একবার লিজাকে দেখল। লিজার মুখে কোনরকম অভিব্যক্তি নেই; অনুগত ডিউটিফুল একজন এমপ্লয়ীর মতো সুদীপার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। নীচু চাপা গলায় সে বলল, 'এ রোগ, এ ব্ল্যাকমেলার' বলেই আবার ফাইলে ঝুঁকে চিঠি দেখতে দেখতে প্রয়োজনীয় নোট দিতে লাগল।

শেষ চিঠিটা যখন সন্দীপা ফাইল থেকে তুলেছে, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এমনিতে ফোন এলে লিজাই প্রথমে ধরে। অনেক সময় আজেবাজে 'কল' আসে, অবাঞ্ছিত লোকেরা চাকরি-বাকরির জন্য বা অন্য কারণে বিরক্ত করে। তাতে সময় নষ্ট, মেজাজ খারাপ। এ জাতীয় ফোন এলেই লিজা জানিয়ে দেয়—সন্দীপা অফিসে নেই বা কনফারেন্সে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লিজাকে এই রকমই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

আজ কিন্তু ফোনটা নিজেই ধরল সন্দীপা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন অপারেটর অসীমা সেনের গলা ভেসে এল, 'ম্যাডাম, রাহা সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

সিনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহা। ব্যস্তভাবে সন্দীপা বলল, 'দাও।'

অসীমা লাইনটা দিল। ওধার থেকে নিরঞ্জন বললেন, 'রঞ্জু, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের তরফ থেকে একজন এসেছেন।'

সন্দীপা ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, 'কী ব্যাপারে বলুন তো নিরঞ্জন কাকা?'

'সেই যে ওঁরা তোমাদের বাড়ির মতো গথিক স্ট্রাকচারের একটা বাড়ি করাতে চান। তুমি বলেছিলে, ওঁদের কেউ এলে তুমি কথা বলবে।'

মনে পড়ে গেল। দারুণ আগ্রহের গলায় সন্দীপা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক কোথায়?'

'আমার ঘরে। তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সন্দীপা বলল 'দশ মিনিটের ভেতর আমি আপনার ওখানে আসছি।'

'আচ্ছা।'

ফোন নামিয়ে শেষ চিঠিটা পড়ে ঝড়ের গতিতে ডিক্টেশন দিল সন্দীপা। তারপর সোজা নিরঞ্জন রাহার ঘরে চলে গেল।

এক পাশে একটা চেয়ারে মধ্যবয়সী নিরীহ ভালোমানুষ টাইপের এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পরনে ধুতি আর টুইলের শার্ট। হাতে পুরনো ডিজাইনের 'ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচের' গোল ঘড়ি, পায়ে চপ্পল। দেখেই বোঝা যায়, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কর্মচারী-টারী হবেন।

নিরঞ্জন দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কার-টমস্কারের পর সন্দীপা বলল 'আসুন অবিনাশবাবু।' ভদ্রলোকের নাম অবিনাশ সাধুখাঁ।

তাকে নিয়ে সোজা কনফারেন্স রুমে চলে এল সন্দীপা। অন্য কারো সামনে সে অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

দুজনে মুখোমুখি বসল। সন্দীপা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপোর্টের পক্ষ থেকে আসছেন?' এই প্রশ্নটা না করলেও চলত। তবু কথাবার্তা তো কোন একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে।

অবিনাশ খুবই বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী কাজ করেন ?'

'বিল সেকশানের বড়বাবু।'

কথায় কথায় সুদীপা জেনে নিল, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট যে বাড়িটা করতে যাচ্ছে, তার অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছে অবিনাশ সাধুখাঁর ওপর। বাড়িটা যতদিন না হচ্ছে অফিসের ডিউটি আপাতত বন্ধ করে এর পেছনে তাঁকে লেগে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সুদীপাদের সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ রাখবেন।

সুদীপা বলল 'একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। মানে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে আর কি।'

অবিনাশ উৎসুক মুখে তাকালেন, 'কী ?'

'যে বাড়িটা করাতে চাইছেন, সেখানে কি আপনাদের অফিস উঠে যাবে ?'

'আজ্ঞে না। ওটা আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ি হবে। অবশ্য তিনি কোম্পানির মালিকও।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের মালিকের নামটা জানতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই। মিস্টার সাধন চ্যাটার্জী।'

সামান্য হতাশই যেন হল সুদীপা। কিংবা তার উল্টোটাও হতে পারে। সে কি অন্য কোন নাম আশা করেছিল ? মুখ-চোখ দেখে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না।

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলল, 'আচ্ছা, যে নকশাটা আপনারা পাঠিয়েছেন, সেটা কোত্থেকে পেলেন।'

অবিনাশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। দয়া করে '

তাঁকে থামিয়ে সুদীপা বলল, 'মানে বলছিলাম বাড়ির যে স্কেচটা দিয়েছেন সেটা কি অন্য কোন বাড়ি দেখে আঁকা হয়েছে ?'

অবিনাশ কী ভেবে বললেন, 'আমি সেই রকমই শুনেছি। কোথায় যেন একটা বাড়ি দেখে চ্যাটার্জী সাহেবের খুব ভাল লেগে যায়। উনি ভাল আঁকতে পারেন। সেই বাড়িটার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পেন্সিলে স্কেচ করে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আরো ভালো করে এঁকে আমাকে দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।'

এর পর আর কিছু বলবার নেই। তবু সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ বাড়িটা দেখে আপনাদের চ্যাটার্জী সাহেব স্কেচ করেছিলেন, আপনি কি জানেন ?'

'আজ্ঞে না ম্যাডাম।'

সুদীপা এবার বলল, 'অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না প্লীজ। আবার দেখা হবে। আচ্ছা নমস্কার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

অবিনাশও নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন।

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে নিজের চেম্বারের দরজা সামান্য একটু খুলেছে হঠাৎ লিজার গলা কানে এল সুদীপার। টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে। লাইনের ওধারের গলাটা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না, তা সম্ভবও না।

লিজা যা বলছে তা এইরকম। 'হ্যাঁ, আজকের চিঠিটা পেয়েছেন।··· রি-অ্যাকশান? নিশ্চয়ই ভাল না। মুখটা খুব স্টিফ দেখাচ্ছিল। আণ্ডারটোনে গালাগালও দিলেন।···কী বললেন? 'রোগ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকমেলার।'··· সেদিনের মতো ভেঙে পড়েন নি।···ইভনিং-এ আমাদের বাড়ি আসবেন?'

সুদীপার চেম্বারটা যদিও অফিসের এক কোণে, তবু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে নিজের পার্সোনাল সেক্রেটারির কথা শোনা অত্যন্ত অশোভন। তা ছাড়া এই প্যাসেজটা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে। তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তারা কিছু বলবে না ঠিকই, তবে নিশ্চয়ই কিছু ভাববে, সুদীপার পক্ষে তা ভয়ানক অস্বস্তিকর।

কার সঙ্গে কথা বলছে লিজা? তার সম্পর্কেই যে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বেনামী চিঠি পাঠিয়ে যে তার জীবন তোলপাড় করে দিয়েছে, নিশ্চয়ই সেই স্কাউনড্রেলটার সঙ্গে লিজার যোগাযোগ আছে। এমনও হতে পারে, লিজা তার এজেন্ট। এখানে চাকরি নিয়ে সুদীপার প্রতিটি মুভমেন্টের খবর সেই অদৃশ্য অজানা ব্ল্যাকমেলারটার কাছে পাঠাচ্ছে।

চেম্বারে ঢুকে সোজাসুজি এসব বিষয়ে লিজাকে কি প্রশ্ন করবে? পরক্ষণেই কিছু একটা মনে পড়তে ভাবল, না, এখন না। আপাতত ওকে কিছুদিন ওয়াচ করা যাক। লিজাকে দিয়েই অজানা সেই ধূর্ত বদমাশটাকে ধরতে হবে।

সুদীপা চেম্বারে আর ঢুকল না। সোজা টেলিফোন অপারেটর অসীমা সেনের ঘরে চলে গেল।

অসীমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। গায়ের রঙ কালো। তবে ঘন পালকে ঘেরা চোখ, পাতলা নাক, ছোট্ট কপাল, কোঁচকানো কোঁচকানো চুল, তাকাবার স্নিগ্ধ ভঙ্গি — সব মিলিয়ে ভারি মিষ্টি চেহারা।

অসীমারা নানাভাবে সুদীপার কাছে কৃতজ্ঞ। বছর তিনেক আগে এণ্টালী মার্কেটের পেছন দিকে কী একটা দরকারে গিয়েছিল সুদীপা। ফেরার সময় হঠাৎ রাস্তায় কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে গাড়ি থামাতে হয়েছিল। বস্তি টাইপের একটা বাড়ি থেকে গুণ্ডা ধরনের ক'টা লোক মালপত্র টেনে বার করে ফুটপাতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। দু'তিনটে ছেলেমেয়ে এবং এক বয়স্কা মহিলা সমানে কাঁদছেন। মধ্যবয়সী রোগা চেহারার এক ভদ্রলোক, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি—গুণ্ডাগুলোর হাতে-পায়ে ধরে কী বোঝাতে চেষ্টা করছেন আর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছেন। উঠে আবার হাতজোড় করে তাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। একধারে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী, তার চোখে-মুখে দারুণ আতঙ্ক। এই মেয়েটিই অসীমা।

গাড়ি থেকে নেমে অসীমার কাছেই গিয়েছিল সন্দীপা। বলেছিল, 'কী হয়েছে ?

অসীমা জানিয়েছিল, 'ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওলা তাদের নামে কেস করেছিল। কেসে তারা হেরে গেছে। এখন গুন্ডা লাগিয়ে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। আরো জানা গিয়েছিল, অসীমার বাবা সেই মধ্যবয়সী রোগা লোকটি যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন সেখানে দু'বছর লক-আউট চলছে। কলকাতায় তাদের আত্মীয়স্বজন আছে ঠিকই, তবে গরীব বলে সবাই এড়িয়ে যায়, কোন রকম সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই যে বাড়িওয়ালা বার করে দিল, এখন তারা কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই ঠিক নেই।'

কী যেন হয়ে গিয়েছিল সন্দীপার। একটা লরীর ব্যবস্থা করে অসীমাদের প্রথমে নিয়ে এসেছিল নিজেদের বাড়িতে। লনের পাশে ড্রাইভার-মালীদের জন্য অনেকগুলো ঘর আছে। তার কয়েকটা খালি ছিল। অসীমাদের সেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

মাস ছয়েক ওখানেই ছিল অসীমারা। এর মধ্যে তাকে কাজকর্ম শিখিয়ে নিজেদের ফার্মে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি দিয়েছে সন্দীপা। এদিকে অনেক দিন লক-আউট থাকার পর অসীমার বাবার ফ্যাক্টরিও খুলে গিয়েছিল।

চাকরি-টাকরি পাবার পর একদিনও আর সন্দীপাদের বাড়িতে থাকে নি অসীমারা। টালিগঞ্জের দিকে ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় অসীমার মা আর বাবা সন্দীপার দু' হাত ধরে গভীর কৃতজ্ঞ গলায় বলেছিলেন, 'মা, তোমার ঋণ জীবনে আমরা শোধ করতে পারব না।'

টেলিফোনের ঘরে সন্দীপাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অসীমা। তিন-চার বছর এখানে চাকরি করছে কিন্তু আগে কখনও সন্দীপাকে এ ঘরে ঢুকতে দেখে নি। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারা তাকে বসিয়ে দিল সন্দীপা। নীচু গলায় বলল, 'এইমাত্র কি তুমি আমার চেম্বারে লিজাকে লাইন দিয়েছ ?'

অসীমা বলল, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম !' বাইরে সন্দীপাকে সে 'দিদি' বলে, অফিসে ম্যাডাম। অফিসের ব্যাপারে যাবতীয় ডিসিপ্লিন সবাইকে সঠিকভাবে মেনে চলতে হয়।

'এখনও কি লিজা কথা বলছে ?'

'না, ম্যাডাম। এইমাত্র লাইন ছেড়ে দিয়েছে।'

একটু ভেবে অসীমা জিজ্ঞেস করল, 'অফিস ছুটির পর কী করছ ?'

অসীমা বলল, 'বাড়ি চলে যাব।'

'তোমার অন্য কাজ নেই তো ?'

'না।'

'ছুটির পর নিচে নেমে সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকো। আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'ফিরতে দেরি হলে বাড়িতে নিশ্চয়ই ভাববেন। তোমার মাকে কি কোনভাবে খবর দেওয়া যায় ?'

'বাড়িওলাদের টেলিফোন আছে। ওঁদের ফোন করলে মাকে জানিয়ে দেবে।'

'দ্যাটস গুড।'

সন্দীপা কোথায় নিয়ে যাবে, জানার ইচ্ছা হচ্ছিল অসীমার। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

সন্দীপা আর দাঁড়াল না ; সোজা নিজের চেম্বারে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেল।

লাঞ্চের একটু আগে আগে বাড়ি গিয়ে সন্দীপার শোফার তার দুপুরের খাবার এনে লিজার হাতে দিয়ে যায়। লিজা প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে সন্দীপাকে খেতে দেয়, নিজেও তার সঙ্গে খায়। দু'জনের মতো খাবার আসে বাড়ি থেকে।

অফিসে খাওয়ার জন্য একটা মাঝারি ডাইনিং রুম করিয়ে নিয়েছে সন্দীপা। তবে সেখানে খায় না , নিজের চেম্বারে বসেই খেয়ে নেয়।

বাইরে 'এনগেজড' সাইন জ্বালিয়ে আজও খেতে বসলো সন্দীপা, মুখোমুখি লিজা।

খেতে খেতে এলোমেলো কথা হচ্ছে, তবে ফোনের ব্যাপারে কিছুই বলল না সন্দীপা। লিজার সম্পর্কে তার মনে যে সংশয় দেখা দিয়েছে, কোনভাবেই তা বুঝতে দিল না।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। লাঞ্চ টাইমে খুব জরুরী 'কল' না থাকলে লাইন দিতে বারণ করা আছে। বাঁ হাতে টেলিফোনটা তুলতেই মৃন্ময়ের গলা ভেসে এল, 'কী করছ ?'

সন্দীপা বলল, 'লাঞ্চ—'

'আমিও খাচ্ছি। বিকেলে আজ তোমার কি প্রোগ্রাম ?'

'কেন বল তো ?'

'লাইটহাউসে একটা ভালো ছবি এসেছে। তোমার সময় থাকলে দেখা যেত।'

'আজ একটা কাজ পড়ে গেছে। অন্য দিন দেখা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ।'

'বল।'

'পুজোর ছুটি পড়তে তো আর দেরি নেই। তুমি, তোমার বাবা আর ঠাকুমা —আই মীন তোমাদের ফ্যামিলি রাজী থাকলে সাউথ ইণ্ডিয়ায় যাওয়া যেত। কোভালাম বীচে হোটেল 'বুক' করব নাকি ?'

আগেও পুজোর সময় কয়েক বার বাইরে বেড়াতে যাবার কথা বলেছে মৃন্ময় কিন্তু সন্দীপা যায় নি। সে বলল, 'না।'

হালকা ক্ষোভের গলায় মৃন্ময় বলল, 'প্রত্যেক বছর তোমাকে রিকোয়েস্ট করি।

কখনও রাখো না। চলো না এবার, প্লীজ।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, পুজোর ছুটিটা আমাকে একটা জায়গায় যেতে হয়। সেখানে ছাড়া আর কোথাও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।'

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময় বলল, 'একটা অনুরোধ করব ?'

'কী ?'

'আগে বল রাখবে ?'

'না শুনে কী করে কথা দিই ? আমার পক্ষে সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখব।'

'তোমার পক্ষে অসম্ভব না।'

'অনুরোধটা শোনাই যাক।'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমাকে সেখানে নেবে ?

'না-না !' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুদীপা। বলল, 'প্লীজ আমাকে ক্ষমা করো—' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখল।

লাঞ্চের পর আর কনফারেন্স ছিল না আজ। নিজের চেম্বারে বসেই অজস্র ফাইল দেখল সুদীপা, অনেক দরকারী কাগজ-পত্রে সই করল, দু'চারজন ভিজিটরের সঙ্গে কথা-টথা বলল। তারপর ছুটি হলে এক সেকেন্ডও দেরি না করে সোজা নীচে নেমে এল। শোফার বিশাল পোর্টিকোর তলায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সুদীপা উঠতেই ড্রাইভওয়ে দিয়ে সেটাকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে গেল।

আর তখনই সুদীপা দেখতে পেল, ফুটপাথে অসীমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তুলে নিয়ে শোফারকে বলল, 'বাড়ি চল।'

অসীমা এক পলক সুদীপাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। কেন সুদীপা তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে চলেছে, জানার কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করা যায় না। দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

সুদীপা হঠাৎ বলল, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কিছু কথা আছে। অফিসেও বলা যেত কিন্তু সেখানে প্রচুর লোকজন। এমন জায়গায় বসে কথাগুলো বলতে চাই যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না।'

অসীমা এতক্ষণে মুখ খুলল। আস্তে করে বলল, 'কনফিডেন্সিয়াল কথা ?'

'খুব।'

একটু চিন্তা করে সুদীপা ফের বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তবু বলছি, বাড়ি গিয়ে যা বলব তা যেন কেউ জানতে না পারে। ব্যাপারটা তোমার আমার ভেতর থাকবে। কারণ—

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অসীমা।

সন্দীপা বলতে লাগল, 'কারণ আমি একজনকে ফাঁদে ফেলতে চাইছি। জানা-জানি হয়ে গেলে তাকে ধরতে পারব না।'

বাড়ি এসে সোজা তেতলায় নিজের ঘরে অসীমাকে নিয়ে এল সন্দীপা। চা-টা খাওয়ার পর বলল, 'আচ্ছা, ডেইলি লিজার পার্সোনাল ফোন কী রকম আসে?'

অসীমা বলল, 'খুব একটা বেশি না। রোজ ওকে কেউ ফোন করে না। মাঝে মাঝে করে।'

'ভাল করে ভেবে বল।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অসীমা বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ক'দিন ধরে এক ভদ্রলোক লিজাকে রেগুলার ফোন করছেন।'

সন্দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কখন করে?'

'তার কোন ঠিক নেই।'

'ভদ্রলোকের নাম বলতে পারো?'

'নাম কী করে বলব?'

সন্দীপা বলল, 'কে ফোন করছে না জেনেই লাইন দাও নাকি?'

অসীমা বলল, 'আপনার আর রাহা সাহেবের ফোন এলে নাম জিজ্ঞেস করি। আপনারা কথা বলতে চাইলে তবে লাইন দিই। অন্যের বেলা কিছু জিজ্ঞেস করি না।

'ভদ্রলোক লিজাকে কী বলে, কখনও শুনেছ?'

'না।'

'এখন থেকে লিজাকে কেউ ফোন করলে তার নাম জিজ্ঞেস করবে। ওরা কী বলে শুনবে। আর সেগুলো তক্ষুণি নোট করে নেবে। মনে থাকবে?

আস্তে মাথা নাড়ল অসীমা।

সন্দীপা বলল, 'ওদের কথাবার্তায় যে নোট নেবে, আমাকে সেগুলো অফিসে দিও না। ছুটির পর আমাদের বাড়ি এসে দেবে।'

অসীমা বলল, 'আচ্ছা।'

সন্দীপা বলল, তুমি হয়ত ভাবছ, কেন এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের কথা শুনতে বলছি।'

অসীমা উত্তর দিল না।

সন্দীপা বলতে লাগল, 'তুমি আমাকে নিশ্চয়ই অভদ্র, আনকালচারড বলবে—না?

অসীমা বিব্রত মুখে বলে উঠল, না-না, সে কী!'

সন্দীপা বলল, 'লিজা আর ঐ ভদ্রলোক যদি ওঁদের পার্সোনাল ব্যাপারে কথা বলতেন, আমার মাথা ঘামাবার কথা ছিল না। কিন্তু খবর পেয়েছি, ওঁরা এমন সব বিষয়ে কথাবার্তা বলছে, যার সঙ্গে আমার সম্মান, মর্যাদা আর ভবিষ্যৎ জড়িত। আপাতত এটুকু জেনে রাখো।'

অসীমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সুদীপা আবার বলল, আমাকে তুমি দিদি বল তো?

অসীমা বলল, 'আপনি আমার দিদিই তো।'

'তা হলে দিদির মর্যাদা বা সুনাম নষ্ট হয়, এমন কিছু নিশ্চয়ই তুমি চাইবে না।

'কক্ষণো না। আপনি আমার ফ্যামিলিকে বাঁচিয়েছেন। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

সুদীপা অসীমার একটা হাত ধরে গভীর গলায় বলল, 'আমি জানি। দিদির সম্মান তোমার কাছে অনেক বড়।' একটু থেমে বলল, 'জ্যান এ কথা কখনও কাউকেই তুমি বলবে না। শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যেই থাকবে।'

'আমি কাউকে বলব না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

॥ দশ ॥

দু'দিন বাদে অফিস ছুটির পর সার্কুলার রোডের একটা সাইটে গিয়ে একটা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং তৈরীর কাজ দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই সুদীপা দেখতে পেল, নীচের ড্রইংরুমে বসে অসীমা উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনীর সঙ্গে গল্প করেছে। অনেক দিন অসীমারা এ বাড়িতে থেকে গেছে। মিষ্টি ব্যবহার এবং কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য বাবা এবং ঠাকুমা দু'জনেই মেয়েটাকে খুব পছন্দ করেন, সেই সঙ্গে স্নেহও।

সুদীপা বুঝতে পারল, লিজা আর সেই অজানা লোকটার কথা নোট করে নিয়ে এসেছে অসীমা। নিজের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে করতে দ্রুত ড্রইংরুমের দিকে চলে এল সে।

উমাপ্রসাদ দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। তিনিই প্রথম সুদীপাকে দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'তোর আজ এত দেরি হল যে রঞ্জু?'

দেরির কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে সুদীপা অসীমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসেছ?

অসীমা বলল, 'ছুটির পরই।'

হেমনলিনী বললেন, 'সন্ধ্যার আগে আইছে। তর লাগে কী কামের কথা আছে।'

সুদীপা অসীমাকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় নিজের ঘরে অসীমাকে নিয়ে যেতে যেতে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'চা-টা খেয়েছ?

অসীমা বলল, 'হ্যাঁ দিদি। ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই কাছে বসে অনেক খাইয়েছেন।'

ঘরে এসে কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না সুদীপা। ভেতরকার উত্তেজনাটা অসীমাকে বুঝতে দিল না। তাকে বসিয়ে প্রথমে বাথরুমে ঢুকে স্নান-টান করে, পোশাক বদলে অসীমার মুখোমুখি বসতে না বসতেই মুনেশ্বর চা এবং খাবার-টাবার দিয়ে গেল। চা বা খাবারের কথা বলতে হয় না। সে বাড়ি ফিরলেই ঠাকুমা পাঠিয়ে দেন।

সুদীপা একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ তুলে অসীমার দিকে বাড়িয়ে দিল, খাও—'

অসীমা করুণ মুখে বলল, 'দিদি, আমার গলা পর্যন্ত বোঝাই হয়ে আছে। আর খেতে হলে মরে যাব।'

প্লেটটা নামিয়ে রেখে সুদীপা বলল, 'আমি খাব আর তুমি বসে থাকবে, ইট লুকস অড।

'আচ্ছা—'

'তা হলে একটু কষ্ট করে তোমার আর আমার জন্যে বানিয়ে নাও।'

ট্রে-তে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে। পট থেকে দুটো কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে তাতে চিনি মিশিয়ে অসীমা একটা দিল সুদীপাকে, একটা নিজে নিল।

দ্রুত সামান্য কিছু খেয়ে, চায়ে আলতো চুমুক দিতে সুদীপা বলল, ঐ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু খবর আছে, তাই না?'

সুদীপা কোন ব্যাপারের কথা বলছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। আস্তে মাথা নেড়ে অসীমা বলল. 'হ্যাঁ দিদি। সেই জন্যেই তো আপনাদের এখানে এসেছি।' ভদ্রলোক আজ ফোন করেছিলেন

'সব টুকে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, এই যে—' বড় হ্যান্ডব্যাগের মুখ খুলে ভাঁজ-করা কাগজ বার করে সুদীপার হাতে দিল অসীমা।

ভাঁজ খুলে সুদীপা পড়তে লাগল।

'বেলা সাড়ে দশটায় লিজাকে এক ভদ্রলোক ফোন করেন। তখন সুদীপাদি কনফারেন্স রুমে ছিলেন। সুদীপাদির ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী নাম জিজ্ঞেস করতে ভদ্রলোক জানান তিনি মিস্টার দত্ত। লিজাকে লাইন দিয়ে আমি দু'জনের কথাবার্তা শুনতে থাকি। তাঁদের কথাবার্তা এখানে দেওয়া হল।

মিস্টার দত্ত: কী হল, সেই ছেলেটির খবর কিছু জানতে পারলে?

লিজা: না।

দত্ত: খবরটা যেভাবেই হোক আমার চাই।

লিজা: চেষ্টা তো করে যাচ্ছি।

দত্ত: চেষ্টার কথা অনেকবার বলেছ। দু' মাসের ওপর তুমি ওখানে কাজ করছ। একটা সামান্য খবর বার করতে এত সময় লাগার কথা নয়। তিন দিন পর তোমাদের অ্যাএস ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতর খবরটা আমার চাই।

লিজা ঃ আচ্ছা।

বিকেল তিনটে দশে আরেক ভদ্রলোক লিজাকে ফোন করেন। তখনও সন্দীপাদি কনফারেন্স রুমে ছিলেন। ইনস্ট্রাকশান অনুযায়ী ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করতে জানা গেল তিনি মিস্টার পাকড়াশী। দুজনের কথাবার্তা হুবহু এখানে দেওয়া হল।

পাকড়াশী ঃ আবার তোমাকে ফোন করলাম।

লিজা ঃ বলুন।

ঃ আজই আমি একটা খবর পেয়েছি তোমার 'বস' মিস মিত্র পুজোর ছুটিতে নর্থ বেঙ্গলে বেড়াতে যান। সঙ্গে কাউকে নেন না। শুধু পুজোর সময়ই না, বছরের অন্য সময়ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওখানে যান। আমার কী মনে হয় জানো?

ঃ কী?

ঃ ঐ বাচ্চাটা নর্থ বেঙ্গলের কোথাও রয়েছে।

লিজা উত্তর দেয় নি।

পাকড়াশী আবার বললেন ঃ তুমি কি জানো এবার তোমার 'বস' বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন কিনা?

লিজা ঃ সেদিন মৃন্ময়বাবুকে ফোনে বলছিলেন কোথায় যেন যাবেন।

পাকড়াশী ঃ মৃন্ময়বাবু? ও তোমার 'বসের' সেই প্রেমিকটি?

ঃ হ্যাঁ। মৃন্ময়বাবুও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন।

ঃ তারপর?

ঃ মিস মিত্র কিছুতেই রাজী নন। অনেক বার ভদ্রলোক রিকোয়েস্ট করলেন। মিস মিত্রের এক কথা, তাঁকে সঙ্গে নেবেন না। শেষ পর্যন্ত দুম করে লাইনটা কেটে দিলেন।

ঃ লিজা, আর আমার কোন রকম সন্দেহ নেই—ছেলেটি নর্থ বেঙ্গলের কোথাও আছে। মৃন্ময়কে মিস মিত্র কেন নিতে চান নি জানো?

ঃ কেন?

ঃ যার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে তাকে কেউ নিজের জীবনের গোপন লজ্জার কথা জানায় না। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

ঃ বলুন।

ঃ যেমন করে পার মিস মিত্রের সঙ্গে তোমাকে নর্থ বেঙ্গলে যেতে হবে।

ঃ তা কী করে সম্ভব? উনি তো কাউকেই সঙ্গে নিতে চাইছে না।

ঃ অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব তোমার। সেই রকম কনট্রাক্টই তোমার সঙ্গে আমার হয়েছিল। সেই শর্তেই তুমি ওখানে চাকরি নিয়ে গেছ।

ঃ কিন্তু—

ঃ কোন কিন্তু শুনতে চাই না।

লিজা উত্তর দিল না।

পাকড়াশী : যদি মিস মিত্র তোমাকে না নেন, একটা কাজ করবে।

লিজা : কী কাজ?

: উনি কখন কোন ট্রেনে বা প্লেনে যান, গোপনে খবর নেবে। তারপর সেই ট্রেন বা প্লেনের টিকেট কেটে 'ফলো' করে যাবে। যদি টিকেট না পাও আমাকে জানাবে। ব্যবস্থা করে দেব।

: আচ্ছা।

এরপর পাকড়াশী লাইন কেটে দিলেন।

এই সব কথাবার্তার তলায় অসীমা তার মন্তব্য এইভাবে লিখেছে : আমার কোন রকম সংশয় নেই যে মিস্টার দত্ত এবং মিস্টার পাকড়াশী একই লোক। গলার স্বর শুনলেই তা বোঝা যায়। কেউ যাতে সন্দেহ না করে, সেই জন্য দু'বার আলাদা আলাদা নাম বলেছেন তিনি।

কাগজটা ফের ভাঁজ করতে করতে সন্দীপা বলল, 'একসেলেণ্ট। দারুণ কাজ করেছ।' একটু থেমে বলল, 'ঠিক কমেণ্ট করেছ। লোকটা খুবই চতুর।'

উত্তর না দিয়ে সন্দীপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অসীমা। সন্দীপা বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল। নীচে চল, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আসবে।'

অসীমা বলল, 'গাড়ির দরকার নেই। আমি বাস-টাসে চলে যেতে পারব।'

সন্দীপা তার কথা শুনল না; নীচে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার ওপরে উঠে এল। বিছানায় শুয়ে চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে ভাবতে লাগল, এবার কী করা যায়। ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ব্যাপার তার মাথায় এসে গেল।

পরের দিন দুপুরে মুখোমুখি বসে লাঞ্চ খেতে খেতে সন্দীপা লিজাকে বলল, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

লিজা বলল, 'ভালো ম্যাডাম। তবে এখনও বেশ উইক।'

'তোমার এক মাসীমা তোমাদের বাড়ি এসে আছেন না?'

'হ্যাঁ। আরো কয়েক দিন থাকবেন।'

সন্দীপা একটু ভেবে বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে কী করছ? আই মীন বাইরে-টাইরে যাচ্ছ?'

'না।'

'একটা রিকোয়েস্ট করব—'

খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল লিজা।

সন্দীপা বলল, 'আমি কলকাতার বাইরে ক'দিনের জন্য—এই ধরো ফর সেভেন ডেজ—বেড়াতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে? অবশ্য যদি তোমার কোন অসুবিধা না হয়—'

লিজা ভেতরে ভেতরে চমকেই উঠল। তবে বাইরে চমকটা বেরিয়ে আসতে দিল না। কাল সেই ফোনটা আসার পর থেকে সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না কীভাবে সন্দীপার সঙ্গে যাবে, বা তাকে 'ফলো' করবে। অভাবনীয় সুযোগটা এসে যাওয়ায় সে যতটা অবাক, তার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রবল শক্তিতে বিস্ময় এবং উত্তেজনাটা সামলে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার কোন অসুবিধা নেই। আপনার সঙ্গে গেলে বাবা-মা খুশীই হবেন, আমারও ভীষণ ভালো লাগবে।'

'গুড। আজ বৃহস্পতিবার। শনিবার অফিস হয়ে ছুটি পড়ে যাবে। রবিবার আমরা বেরিয়ে পড়ব। সাড়ে দশটায় ট্রেন। 'স্যুটকেস-ট্যুসকেস গুছিয়ে ন'টার ভেতর আমাদের বাড়ি আসতে পারবে? না স্ট্রেট স্টেশনে চলে যাবে?'

'আমি স্টেশনেই চলে যাব।'

'ঠিক আছে। লাঞ্চের পর আমাদের ট্রাভেল এজেণ্টকে ফোনে বলে দাও, রবিবারের দার্জিলিং মেইলে তোমার আমার জন্যে যেন একটা 'কুপে' রিজার্ভ করে।'

'আচ্ছা।'

॥ এগারো ॥

লিজাকে নিয়ে প্রথমে শিলিগুড়ি এল সন্দীপা। তাদের ট্রাভেল এজেণ্ট আগেই এখানকার থ্রি-স্টার 'হোটেল স্নো অ্যাণ্ড সানে' স্যুইট 'বুক' করে রেখেছে।

এই হোটেলটা সন্দীপার খুবই পছন্দ। নর্থ বেঙ্গলে এলেই সে এখানে ওঠে। বছরে তিন-চার বার আসার জন্য প্রোপ্রাইটর, ম্যানেজার থেকে শুরু করে ফ্লোর বয় পর্যন্ত সবাই তাকে দারুণ খাতির করে। তার আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সবার তীক্ষ্ন নজর। এখানে বেস্ট সারভিস পেয়ে থাকে সে।

সন্ধ্যেবেলা শিলিগুড়ি পৌঁছেছিল সন্দীপারা। হোটেলে যেতেই রিসেপশানের দারুণ স্মার্ট তরুণটি বলল, 'কেমন আছেন ম্যাডাম?'

'ফাইন। তোমরা?' বলে হাসল সন্দীপা।

'ভাল আছি।'

'আমার স্যুইট?'

'রেডি।'

'চারতলার সাউথ ফেসিং সেই স্যুইটটা দিয়েছ তো?'

'নিশ্চয়ই। পুজোর সময় ওটা আপনার জন্যেই রেখে দিই। অন্য কাউকে দিই না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি একটা বয়কে ডেকে সন্দীপা এবং লিজার মালপত্র চারতলার স্যুইটে পাঠিয়ে ছিল। তারপর বলল, 'ম্যাডাম, কাল সকালে আপনার

গাড়ির দরকার হবে কি?' এই হোটেলের সবাই জানে সুদীপা যেদিন এখানে আসে তার পরের দিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায়, তারা জানে। তবে কেন যায়, সেটা বলতে পারবে না।

সুদীপা বলল, 'নিশ্চয়ই। কাল ব্রেকফাস্টের পরই চাই কিন্তু।'

'পাবেন। আজই সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে রাখব।'

আরেক বার ধন্যবাদ জানিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সুদীপা। তার পেছনে পেছনে লিজা।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে স্যুটকেস থেকে বিরাট দুটো প্যাকেট বার করল সুদীপা; দেবাশিসের জন্য দামী দামী নতুন জামা-প্যাণ্ট, চকোলেটের বাক্স, ছবির বই, স্ট্যাম্পের বই ইত্যাদি কিনে এনেছে সে।

দুটো বেডরুম আর একটা ড্রইংরুম নিয়ে সুদীপাদের বিশাল স্যুইট। ড্রইংরুম থেকে চোখের কোণ দিয়ে লিজা সুদীপাকে লক্ষ্য করছিল। সে জানে না, সুদীপাও তার দিকে নজর রেখেছে।

প্যাকেট দুটো নিয়ে ড্রইংরুমে এল সুদীপা। বলল, 'চল লিজা—' কালই লিজাকে জানিয়ে রেখেছিল, আজ সকালে বেরুবে। সে যেন সাড়ে সাতটার ভেতর রেডি হয়ে নেয়। কথামতো রাতের পোশাক-টশাক বদলে সাড়ে সাতটার অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে সে।

লিজা উঠে দাঁড়াল। তারপর সুদীপার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে এসে গাড়িতে উঠল।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে মাদার মেরি অরফ্যানেজে ওরা পৌঁছে যায়। ফাদার ফেয়ার-ব্যাঙ্ক গীর্জার পাশে তাঁর ছোট্ট লাল বাড়িটায় ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে লিজাকে নিয়ে সোজা সেখানে চলে আসে সুদীপা। ফাদারকে প্রণাম করতেই দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে গভীর স্নেহে বলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। বোসো—'

দেখাদেখি লিজাও ফাদারকে প্রণাম করল। তাকেও আশীর্বাদ করে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন' 'একে তো চিনতে পারলাম না।'

লিজা বলল, 'আমি এলিজাবেথ; সবাই লিজা বলে। ম্যাডামের অফিসে আমি কাজ করি।'

'ও আমার সহকর্মী; ছোট বোনের মতো।'

'ও আচ্ছা।'

সুদীপা এবার বলল, 'ফাদার দেবাশিসকে একবার—' এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ওকে নিয়ে আসছি।' তিনি আর দাঁড়ালেন না, বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক দেবাশিসকে নিয়ে ফিরে এলেন। দেবাশিসের

বয়স এখন বারো কি তেরো। কোঁকড়া চুল, নমনীয় মুখ, টকটকে ফর্সা রঙ, মায়া-মাখানো চোখ।

সন্দীপাকে দেখে মুখটা আলো হয়ে উঠল দেবাশিসের। খুব খুশী হয়ে বলল, 'তুমি এসেছ আন্টি!'

সন্দীপা তাকে কাছে বসিয়ে বলল, 'তুমি ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই নাও—' বলে সেই প্যাকেট দুটো তার হাতে দিল সন্দীপা।

প্যাকেট খুলে তক্ষুণি জামা প্যাণ্ট, চকোলেটের বাক্স ইত্যাদি বার করল দেবাশিস। 'কি সুন্দর জামা, কি সুন্দর প্যাণ্ট?'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ—' দেবাশিস ঘাড় হেলিয়ে দিল।

দেবাশিসের সঙ্গে গল্প করতে করতে সন্দীপা লিজার ওপর নজর রেখে যাচ্ছিল লিজা পলকহীন দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ দেবাশিস আর ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের সঙ্গে গল্প-টল্প করল সন্দীপা। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক চা কেক-টেক আনিয়ে দিয়েছিলেন। সে স-সব খাওয়াও হল। তারপর ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিলিগুড়িতে ফিরে গেল সন্দীপা।

শিলিগুড়িতে ওরা দিন সাতেক ছিল। রোজই সকালে লিজাকে সঙ্গে করে মাদার মেরি অরফ্যানেজে চলে যেত সন্দীপা। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে বিকেলে হোটেলে ফিরত।

সাতদিন পর ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে সন্দীপা বলল, 'পুজোর ছুটিতে তো নিশ্চয়ই, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু সময় করতে পারলেই আমি শিলিগুড়িতে চলে আসি। যে ক'দিন ওখানে থাকি, রোজ মাদার মেরি অরফ্যানেজে যাই। কেন জানো?'

লিজার মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। খুব সরল গলায় সে বলল, 'কেন?'

'দেবাশিসকে দেখতে।'

লিজা সামান্য কৌতূহলও প্রকাশ করল না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

লিজাকে দেখতে দেখতে সন্দীপার মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছিল যেন। এই মেয়েটা কোন এক চ্যাটার্জি বা মুখার্জি বা দত্ত বা পাকড়াশীর সঙ্গে তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। দেবাশিসের খবরটা পাওয়া মাত্র নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেল শুরু করবে। অথচ এই মুহূর্তে তাকে দেখলে সে কথা বোঝার উপায় নেই। মুখে চোখে পবিত্র স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়ে লিজা বসে আছে।

এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। কলকাতায় গিয়ে কৌশলে লিজাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। লিজা ধরা পড়লে সেই আদত শয়তান ব্ল্যাকমেইলারটাকে ফাঁদে ফেলতে পুলিশের দু'দিনও লাগবে না। জেরা করে করে তার নাম-টাম ঠিক ওরা বার করে ফেলবে।

প্রাণপণে রাগ উত্তেজনাটা সামলে সন্দীপা বলল, 'দেবাশিসকে না দেখে আমি থাকতে পারি না।'

লিজা আধফোটা গলায় শুধু বলল, 'ও।'

কলকাতায় ওরা পৌঁছুল পরের দিন ভোরে। স্টেশনে নেমে সন্দীপা বলল, 'আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ি একটু আসতে পারবে?'

সন্দীপার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লিজা। তারপর বলল, 'পারব।'

'প্লীজ এসো। তোমার সঙ্গে খুব দরকারী একটা কথা আছে।'

'আসব।'

বাড়িতে এসেই পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছিল সন্দীপা। সন্ধ্যেবেলা প্লেন ড্রেসে একজন পুলিশ অফিসার এবং তাঁর দু'জন সহকারী এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ব্যবস্থায় কোথাও কোন ফাঁক নেই। রাত এগারোটা পর্যন্ত সবাই শিরদাঁড়া টান করে বসে রইল। কিন্তু লিজা এল না।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'লিজার বাড়ির ঠিকানা কী?'

সন্দীপা বলল, আমি ঠিক জানি না। শুনেছি পার্ক সার্কাসের ওদিকে কোথাও থাকে। অফিসে অ্যাড্রেস আছে।'

'অ্যাড্রেসটা পাওয়া যেতে পারে?'

'এখন তো অফিস বন্ধ। খুলবে আরো এক উইক পর।'

'ঠিকানাটা যে এক্ষুণি চাই—'

কিছুক্ষণ ভেবে সন্দীপা বলল, 'আমাদের পার্সোনেল অফিসারকে ফোন করে দেখি যদি উনি বলতে পারেন। অবশ্য ছুটিতে কলকাতায় আছেন কিনা—'

টেলিফোনে পার্সোনেল অফিসারকে পাওয়া গেল। লিজার ঠিকানা তিনি বলতে পারলেন। ১০।৭।এফ, মোজেস লেন, পার্ক সার্কাস।

পুলিশ অফিসাররা তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পর সন্দীপা একটা ফোন পেল।

'মিস মিত্র, আমি চট্টরাজ বলছি—'

চট্টরাজ অর্থাৎ সেই পুলিশ অফিসারটি। সন্দীপা গভীর আগ্রহের গলায় বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। খবর পেলেন?'

'না। মোজেস লেন একটা পেয়েছি ঠিকই তবে ঐ রকম কোন বাড়ির নাম্বার নেই; এলিজাবেথ স্যান্ডস' বলেও কাউকে পাওয়া গেল না। আমার মনে হয়, নাম আর অ্যাড্রেস, দুটো ফিকটিসাস—জাল।'

'তবু ভাল করে একটু খুঁজে দেখুন।'

'নিশ্চয়ই।'

একটা সপ্তাহ গোটা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলল পুলিশ কিন্তু লিজা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সাত দিন পর অফিস যেদিন খুলল সেদিনই লিজার রেজিগনেসন লেটার পেল সন্দীপা। নবজীবন হাউসিং কনসার্নে সে আর চাকরি করবে না।

॥ বারো ॥

একমাস বাদে হঠাৎ আরেকটা চিঠি পেল সন্দীপা। নর্থ বেঙ্গল থেকে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক জানিয়েছেন, এক ভদ্রলোক দেবাশিসকে দত্তক নিয়ে চলে গেছেন।

চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সন্দীপা। মনে হল হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গেছে। তারপর ভাঙা গলায় ফোন তুলে অসীমাকে মাদার মেরি অরফ্যানেজে লাইন দিতে বলল।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে লাইন পাওয়া গেল। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কই ধরেছেন। বললেন, 'কী ব্যাপার মাই চাইল্ড?'

সন্দীপা বলল, 'দেবাশিসকে আপনি দত্তক দিয়ে দিলেন?'

'এটা নতুন কিছু নয়। তুমি তো জানোই প্রত্যেক বছর এখান থেকে কত ছেলেকে লোকে দত্তক নিয়ে যায়।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন, এ প্রশ্নটা আমাকে কোরো না।'

'কেন?'

'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সন্দীপা। তার নাম বলতে পারব না।'

একটু চুপ করে থেকে সন্দীপা বলল, 'দেবাশিসকে দত্তক দিলেন অথচ আমাকে জানালেন না!'

ফাদার বললেন, 'উপায় ছিল না মাই চাইল্ড।'

'কেন?'

'যিনি দেবাশিসকে জন্মের পর আমাদের এখানে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বারণ ছিল।'

সন্দীপা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল, 'আমার যে কিছুই রইল না ফাদার।'

ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন, কেঁদো না মাই চাইল্ড। কেঁদো না। মনে শক্তি আনো, ধৈর্য আনো। গড ব্লেস ইউ।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক ফোন নামিয়ে রাখলেন।

॥ তেরো ॥

আরো কয়েক মাস কেটে গেল।

এর মধ্যে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে দেবাশিসের খোঁজে লাগিয়েছিল সন্দীপা কিন্তু হাজার দুয়েক টাকাই গেল। তারা দেবাশিসকে বার করতে পারে নি।

পুলিশ লিজার পেছনে লেগে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তার খোঁজও পাওয়া যায় নি। সুদীপার ভয় ছিল যে কোন মুহূর্তে ব্ল্যাকমেল শুরু হয়ে যেতে পারে। সেটা অবশ্য হয় নি।

এর মধ্যে মৃন্ময় সব সময়ই তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। রোজই সে দু-একবার বিয়ের ব্যাপারে জানতেও চেয়েছে মৃন্ময় কিন্তু সুদীপা এখনও মনঃস্থির করতে পারে নি। যত দিন যাচ্ছে অদ্ভুত এক শূন্যতা এবং বিষাদ তাকে যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

বিষণ্ণতা কাটাবার জন্য ইদানীং দিনরাতই কাজে ডুবে থাকে সুদীপা। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে। সাইটে ঘুরে অফিসে যায়। ছুটির পর আবার নতুন বিল্ডিং তৈরির সাইটে। বাড়ি ফেরে গাদা গাদা ফাইল নিয়ে। অনেক রাত পর্যন্ত কোম্পানীর হিসাব-টিসাব দ্যাখে বা নতুন সব বাড়ির নকশা আঁকে।

এত কাজের ভেতরও 'ইমপোর্ট এক্সপোর্ট'' কোম্পানির সেই বাড়িটা সম্পর্কে তার আগ্রহ সব চাইতে বেশি ও'রা চেয়েছিলেন, এক বছরের মধ্যে বাড়িটা কমপ্লীট হোক। যেভাবে কাজ চলছে তাতে দশ মাসের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। অন্য 'সাইটে' দু-একদিন পর পর যায় সুদীপা কিন্তু এই বাড়িটার 'সাইটে' তার রোজ একবার করে যাওয়া চাই।

অবিকল তাদের বাড়ির মডেলে এই বাড়িটা কে বানাচ্ছেন তা জানার জন্য প্রথম থেকেই সুদীপার অপরিসীম কৌতূহল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কথা বলার খুবই ইচ্ছে তার। কিন্তু ইচ্ছাপূরণটা কিছুতেই হচ্ছে না। 'ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ অবিনাশ সাধুখাঁকে যখনই জিজ্ঞেস করে তখনই উত্তর পাওয়া যায়— তাঁদের মালিক কলকাতায় নেই। ব্যবসার কাজে হয় দিল্লী গেছেন, নতুবা বম্বে কিংবা লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা মিডল ইস্ট। অনেক চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি। অবশ্য ক্লায়েণ্ট হিসেবে তিনি চমৎকার। চুক্তি অনুযায়ী নিয়মিত চেক পাঠিয়ে যাচ্ছেন।

ঠিক দশ মাস দু' দিনের মাথায় 'ইমপোর্ট এক্সপোর্টে''র বাড়িটা শেষ হয়ে গেল। আর তার পরদিনই অবিনাশ সাধুখাঁ লাস্ট ইনস্টলমেণ্টের চেক নিয়ে সুদীপার সঙ্গে দেখা করলেন। চেকটা তাকে দিতে দিতে অবিনাশ বললেন, 'আমাদের ফুল পেমেণ্ট হয়ে গেল।'

ভদ্রলোক আগে কখনও সুদীপার কাছে চেক নিয়ে আসেন নি ; তাদের কালেকসান ডিপার্টমেণ্টে জমা দিয়েছেন। সুদীপা একটু অবাকই হল। পরক্ষণে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি তো এ সব পেমেন্টের ব্যাপার দেখি না। আমাদের কালেকসান ডিপার্টমেণ্ট—'

তার কথা শেষ হবার আগেই অবিনাশ বলে উঠলেন, 'জানি। আগের চেকগুলো ওখানেই দিয়ে গেছি। তবে—'

'তবে কী ?'

'আমাদের মালিকের ইনস্ট্রাকসান শেষ চেকটা যেন আপনার হাতেই দিই। সেই সঙ্গে এটাও দিতে বলেছেন।' অবিনাশবাবু তাঁর ঢাউস ব্যাগ খুলে একটা বিরাট খাম বার করে সন্দীপাকে দিলেন।

সন্দীপা বলল, 'কী এটা ?' তার বিস্ময় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল।

অবিনাশ বললেন, ইনভিটেশন কার্ড।'

সন্দীপা জিজ্ঞেস করল, 'কীসের ?'

বিনীত ভঙ্গিতে অবিনাশ বললেন, 'দয়া করে খুলে দেখুন—'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল সন্দীপার নকশা-করা সুদৃশ্য খামটার ওপর চমৎকার হস্তাক্ষরে তার নাম লেখা আছে। কোনরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছাপানো সুন্দর কার্ড বার করল। ইংরেজিতে তাতে যা লেখা আছে তর্জমা করলে তা এইরকম দাঁড়ায়।

'আগামী পনেরই আগস্ট সকাল দশটায় আমাদের নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই শুভদিনে অনুগ্রহপূর্বক আপনি আসিলে আমরা কৃতার্থ হইব এবং আমাদের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গশোভন হইয়া উঠিবে। ইতি, বিনীত 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপোর্ট এজেন্সি।'

কার্ড থেকে মুখ তুলতেই অবিনাশ বললেন, 'আমাদের মালিক বিশেষ করে গৃহপ্রবেশের দিন আপনাকে যেতে বলেছেন। উনি নিজে এসে বলতে পারলেন না বলে ক্ষমা চেয়েছেন। হঠাৎ বাইরে যেতে হল কিনা, তাই আসতে পারেন নি।'

এর আগেও সন্দীপারা যে সব ক্লায়েন্টদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে তারা সবাই কার্ড নিয়ে এসেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত ভাবে সন্দীপা গিয়ে থাকে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা পার্সোনাল কনট্যাক্টটা তাদের কোম্পানির স্বার্থেই দরকার। তবু অবিনাশের ব্যাপারটা অনেকখানি আলাদা। সন্দীপা জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মালিক কোথায় গেছেন ?'

'আবু ধাবি।'

'কিন্তু আজ হল টুয়েলভথ্ আগস্ট। ফিফটীনথ গৃহপ্রবেশ। এর ভেতর কি উনি আসতে পারবেন ?'

'উনি চোদ্দ তারিখের রাত্তিরে কলকাতা পেঁছে যাবেন।'

'ও আচ্ছা।'

'গেস্টরা আসবেন, আর উনি থাকবেন না—তা কেমন করে। তা ছাড়া এত যত্ন করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটা করে দিয়েছেন। মালিক খুব খুশী। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ওঁরও ভীষণ আগ্রহ। এতদিন কিছুতেই যোগাযোগটা হচ্ছিল না। গৃহপ্রবেশে সুযোগে হবে।'

সন্দীপা কিছু বলল না।

অবিনাশ বললেন, 'আপনি আসছেন—আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলাম ম্যাডাম।'

সুদীপা আস্তে বলল, ‘আচ্ছা—’

পনের আগস্ট কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ‘ইমপোর্ট’ এক্সপোর্টে’’র নতুন বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল সুদীপা।

দশ মাস ধরে এখানে রোজ একবার দু’বার করে এসেছে সে। এ বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি তার নিজের হাতে গড়া। বাড়িটা তাদের বাড়ির মডেলে তৈরি বলে দারুণ প্যাসান দিয়ে কাজ করেছে সে।

আজ গথিক স্ট্রাকচারের এই বিশাল বিল্ডিংটাকে যেন চেনাই যায় না। অজস্র ফুলপাতা, চাঁদমালা আর টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। দিনের বেলা বলে লাইটগুলো জ্বলছে না।

গেটের কাছে নহবত বসানো হয়েছে। স্নিগ্ধ মিঠে সুরে সানাই বাজছে সেখানে।

অবিনাশ সাধুখাঁ কোথায় ছিলেন, কে জানে। হঠাৎ দৌড়ে কাছে এসে হাতজোড় করে বললেন, ‘আসুন ম্যাডাম, আসুন—’ সুদীপাকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।’

সুদীপা কিছু বলল না।

ভেতরে লনে ডেকরেটররা প্যাণ্ডেল বানিয়েছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কাচের সুন্দর সুন্দর ঝাড়লণ্ঠন লাগিয়েছে। গেস্টদের বসবার জন্য চারদিকে অগুনতি সোফা আর সেণ্টার টেবিল। প্যাণ্ডেলের খুঁটিগুলো রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে থোকা থোকা ফুল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর ঝকঝকে নতুন সব ফ্যান।

এত বিপুল আয়োজন কিন্তু সুদীপা ছাড়া আর কোন গেস্টকেই দেখা যাচ্ছে না। প্যাণ্ডেলটা একেবারেই ফাঁকা। তবে বাড়ির কাজের লোকজন এবং ডেকরেটরদের কিছু কিছু লোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সুদীপা প্যাণ্ডেলের দিকে যাচ্ছিল, অবিনাশ ব্যস্তভাবে বললেন, ‘ওদিকে না ম্যাডাম, আমার সঙ্গে আসুন—’

সুদীপাকে সঙ্গে করে অবিনাশ বাড়ির ভেতরে চলে এলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপড়ে উঠতে লাগলেন। সমস্ত সিঁড়ি দামী লাল কার্পেটে মোড়া।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার, আমি একাই আপনাদের গেস্ট নাকি?’

‘আজ্ঞে না ম্যাডাম—’ অবিনাশ বললেন, ‘সকালে মোটে তিন-চারজনকে ইনভাইট করা হয়েছে, অন্যদের বিকেলে।’

সুদীপা মজা করে বলল, ‘আমি তা হলে স্পেশাল গেস্ট—কি বলেন?’

অবিনাশ সামান্য হাসল।

সুদীপা আবার বলল, ‘আপনাদের মালিককে দেখছি না তো?’

‘তিনি তেতলায়। আর দু’জন গেস্টের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার ওপর ইনস্ট্রাকসান আছে আপনি এলেই যেন ওপরে নিয়ে যাই।’

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সুদীপা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অদ্ভুত এক উত্তেজনা আর কৌতূহল অনুভব করতে লাগল।

তেতলায় একটা ঘরের দরজায় দামী নীলাভ পর্দা ঝুলছে। সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন অবিনাশ। ভেতরে কারো উদ্দেশে বললেন, 'স্যার, উনি এসে গেছেন—'

ঘরের ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'ওঁকে আসতে বলুন —'

এবার সুদীপার দিকে ফিরলেন অবিনাশ। বললেন, 'যান ম্যাডাম—'

সুদীপা বলল, 'আপনি যাবেন না?'

'না। আমার অনেক কাজ আছে।' অবিনাশ আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন।

সুদীপা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে যেতে হল। মনে হল, রক্তপ্রবাহে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। সমস্ত অস্তিত্ব যেন প্রবল ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে রণবীর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক, লিজা এবং দেবাশিস।

কত কাল পরে রণবীরকে দেখল সুদীপা! তার সঙ্গে শেষ দেখা কোর্টরুমে। তখন তার চেহারা ভেঙেচুরে গেছে। চোখ দু' আঙুল গর্তে ঢোকানো। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি।

আ: আজ যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার চেহারা কত ব্রাইট! চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখমুখ উজ্জ্বল, পরনে দামী পোশাক। দেখেই বোঝা যায় জীবনে সে সর্বাধিক থেকেই কৃতী এবং সফল।

স্তব্ধ মূর্তির মতো সুদীপা তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মাই চাইল্ড, সেদিন তোমাকে বলতে পারি নি। বলার সময়ও সেটা নয়। আজ বলছি, দেবাশিসকে রণবীরের হাতেই তুলে দিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, এই পৃথিবীতে এর চাইতে বড় আশ্রয় তার আর কোথাও নেই। তুমি রণবীরের সঙ্গে কথা বল মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। গড ব্লেস ইউ।'

ওধার থেকে লিজাও কাছে এগিয়ে এল। হাতজোড় করে বলল, 'ম্যাডাম, মিস্টার মুখার্জিই আমাকে আপনার অফিসে পাঠিয়েছিলেন। যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করবেন। আমার বিশ্বাস আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি। আপনার যাতে ভালো হয়, আপনার সব দুঃখ যাতে ঘোচে, সেই চেষ্টাই করেছি।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বা লিজার কথা কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুদীপা। শুনলেও তার মাথায় ঢুকছে না। পলকহীন রণবীরের দিকে সে তাকিয়েই আছে।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ সুদীপা লক্ষ্য করল, আশেপাশে ফাদার ফেয়ার-

ব্যাঙ্ক লিজা বা দেবাশিস—কেউ নেই। কখন তারা বেরিয়ে গেছে, কে জানে। এ ঘরে এখন শুধু রণবীর আর সে।

এক সময় রণবীর কাছে এসে দাঁড়াল। গাঢ় কাঁপা গলায় ডাকল, 'রঞ্জু—'

সুদীপা উত্তর দেয় না। তাকিয়েই থাকে।

রণবীর আবার বলে, 'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার জন্যে তোমার দুঃখ আর অসম্মানের শেষ ছিল না।'

সুদীপা চুপ।

রণবীর বলতে থাকে, 'তোমার বাবা যে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন -ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। জোর করে তোমাকে পেতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছু পাওয়া কি এত সহজ! তোমার বাবা আমাকে জেলে পাঠিয়ে উপকারই করেছেন।'

সুদীপা এখনও কিছু বলল না।

রণবীর থামে নি, 'জেল থেকে বেরিয়ে তোমার খোঁজ করলাম। তারপর বিজনেসে নামলাম। লাকই বলতে পার, কয়েকটা বড় বড় সুযোগ এসে গেল। সেগুলো কাজে লাগাতেই বিজনেসটা দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এই বাড়িতে হাত দিলাম, দেবাশিসকে অরফ্যানেজ থেকে নিয়ে এলাম। এ সবের পেছনে রয়েছে আমার একটাই আশা, একটাই স্বপ্ন। তুমি কি বুঝতে পেরেছ রঞ্জু?' বলতে বলতে গলা বুজে আসতে লাগল রণবীরের।

সুদীপা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীর যেন টলছে।

রণবীর অবরুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, 'জানি, এ আমার দুরাশা। হয়ত-- হয়ত-'

রণবীরের কথা শেষ হবার আগেই তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে প্রবল উচ্ছ্বাসে অভিমানী বালিকার মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুদীপা। আর অনুভব করতে লাগল, রণবীর প্রগাঢ় মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এত দিন কত মানুষের বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সুদীপা। কিন্তু তার নিজের জন্য কোথাও ঘর ছিল না। এই যেন প্রথম তার গৃহপ্রবেশ ঘটল।

———